হাংরাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী : কলকাতা

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৬

মুদ্রক :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
পার্থী

সত্যজিৎ রায়
প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্য-সংগ্রহ	কবিতা
এই ভাই	"
চিরকুট	"
দিন আসবে	"
নাজিম হিকমৎ-এর কবিতা	"
পাবলো নেরুদা-র কবিতাগুচ্ছ	"
যত দূরেই যাই	"
যেতে যেতে দেখা (বিদেশের ভ্রমণ কাহিনী)	

পরশু গেছে এক বিভীষিকার রাত। তার ঘোর এখনও কাটে নি।

ওয়ার্ডের দরজা কাল সকালে মাত্র একবার মিনিট পাঁচেকের জন্যে খুলেছিল। মর্গে নিয়ে যাবার আগে শেষ বারের মতো আমাদের বন্ধুদের লাশগুলো এনেছিল দেখাতে। তার আগে সারা সকাল আমরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে গুম হয়ে ব'সে ছিলাম।

খাটিয়াগুলো একে একে নামালো। তারপর তুলে নিয়ে গেল। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। কনকের মুখটা শিউলি ফুলের বোঁটার মতো ফুদ। বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ভগ্নাবশেষ ছিল ব'লেই বোধহয় আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু 'ভুলো মাৎ' স্লোগানে সারা জেলখানা আমরা কাঁপিয়ে তুললাম।

তারপর আমরা যে যার সেলে ফিরে গিয়েছিলাম। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল শরীর। কাল সারাদিন হ্যাংলার মতো ঘুমিয়েছি।

পুরো ঘটনা এখনও আমরা জানি না। ওয়ার্ডগুলো একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। তার ওপর আমাদেরটা একেবারে একপাশে। ওয়ার্ডগুলোর পাশ দিয়ে গেছে টানা রাস্তা। তার একটা দিকে ইউ-টি ওয়ার্ডে ঢোকার গেট। আর পশ্চিম গেটটা পেরোলে পামেলা এভিনিউ, যার একটা দিকে জেল আপিস, অন্যদিকে ঘড়িঘর। পরশু দিনের ঘটনার ঝটিকাকেন্দ্র ছিল এই পশ্চিম ফটক।

শুধু শুরুর দিকটাই আমরা দেখেছি। তাও দূর থেকে। আমাদের আট নম্বর সকলের শেষে ব'লে আমরা ছিলাম সবার পেছনে। তাই সামনে কী ঘটছিল তা দূর থেকে আমাদের ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না।

কাল থেকে অনশন শুরু হবে, এটা আগে থেকে ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু অন্য জেলে গুলি চলেছে, এ খবরটা পরশুর আগের দিনই লোক-মুখে আমাদের কানে এসেছিল। এ জেলের কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ ক'রে খবরটা চাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারে নি।

পরশু সকালে মিটিং ক'রে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সন্ধ্যেবেলা আমরা লক-আপ করতে দেব না।

লক-আপ হতে না চাওয়া জেল-কানুনে সাংঘাতিক অপরাধ। আমরা জানতাম, ওরা জোর খাটাবে। ওরাও জানত, আমরা বাধা দেব।

দুপুরের পর থেকেই আমাদের এ তল্লাট থেকে সেপাইরা সব হাওয়া। রান্নাবান্না সমেত বিকেলে ফালতুদেরও বিদায় ক'রে দেওয়া হল। বোঝা যাচ্ছিল, গোলমাল বেশ ভাল রকমভাবেই লাগবে। একজন সেপাই ইন্টারভিউয়ের স্লিপ নিয়ে এসেছিল গেটে। তাকে হাঁকিয়ে দেওয়া হল।

পরশু আমারও ইন্টারভিউ ছিল। দাদুর সঙ্গে দেখা হলে ভারি মুশকিলে পড়ে যেতাম। এ জেলে কোনো বিপদের যে আশঙ্কা নেই, এটা বোঝাবার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে একগাদা মিথ্যে বলতে হত। দাদুও সেটাই চান। যে কোনোরকমে চান নিজের মনকে প্রবোধ দিতে।

ইন্টারভিউয়ের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ইউ-টি ওয়ার্ড লক-আপ হয়ে গেল। লোহার বেড়ার ধারে সারা বিকেল আমার সঙ্গে কথা বলেছে হালিশহরের যে ছেলেটা, ইউ-টি ওয়ার্ডের দোতলায় জানলার জাল ধ'রে সে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। বাইরে থাকতেই ওকে চিনতাম। আমাদের কাগজের আপিসে দু-চারবার এসেছে। খুব ভাল কবিতা লেখে। থানা-হাজতে ছিল। জেলে এসেছে মাত্র সেইদিন সকালে। এসেই তো এই আতান্তর। যখন কথা বলছিলাম তখনই বুঝেছিলাম ও বেশ ঘাবড়েছে। আমি ওর সঙ্গে এমন একটা ঢঙে কং

বলছিলাম যাতে ওর মনে হয় আমার কোনো ভয়ডর নেই। ও জানত না, আমার তখন মন পড়ে রয়েছে জেলগেটে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে খোঁড়া পায়ে দাদু আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। সশস্ত্র পুলিশ জেলখানাটাকে ঘিরে রয়েছে—দাদু নিশ্চয় দেখা পাচ্ছিলেন। দাদুর কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল।

তখন তো সবে সন্ধ্যে। ওয়ার্ড খালি ক'রে সবাই রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। কখনও কথা বলতে বলতে হাঁটছি, কখনও পা ধ'রে গেলে কিচেনের বারান্দায় ব'সে কথা বলছি। কিন্তু তারই মধ্যে একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। থেকে থেকে গেটটার দিকে তাকাচ্ছি। ইউ ওয়ার্ডের দোতলায় হালিশহরের সেই ছেলেটি ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রয়েছে।

ঐ বয়সে আমিও ওর মতো ভীতু ছিলাম। আকাশে কড়কড় ক'রে মেঘ ডাকলে ভয় পেতাম। অন্ধকারে ছিল পোকামাকড়ের ভয়। আস্তে আস্তে বুঝেছি, ভয়ের কথা যত ভাবা যায় ভয় তত পেয়ে বসে। আসলে ঝড়জলে ঘরের বাইরে থাকলেই যে মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে কিংবা অন্ধকারে পা বাড়ালেই সাপে ছোবল দেবে, তার কোনো মানে নেই। ভয়কে আমি অনেকটা গা-সওয়া করেছি। ভয় পেয়ে পেয়ে।

হঠাৎ আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে খপ্ ক'রে একজন আমার হাত ধরল। ছ নম্বরের কনক। ও নাকি অনেকক্ষণ ধ'রে আমাকে খুঁজছিল। আমিও ওকে বার কয়েক খুঁজেছি। বয়সে কনক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। কলেজে পড়ে। ধরা প'ড়ে এ জেলে এসেছে মাস দুয়েক আগে। কনকের মিষ্টি মায়াবী মুখ। কিন্তু রাস্তার আলোগুলো জ্বলে নি ব'লে আমরা কেউই কাউকে ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওর তুলে তুলে চলা হাত দুটো ধ'রে বুঝতে পারলাম, জেলখানায় এতদিন পর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ব'লে ও বেশ মজা পাচ্ছে।

রাস্তায় সেই সন্ধ্যে থেকে আমাদের কুচকাওয়াজ চলেছে। মনে

?, সারা রাত বোধহয় এইভাবেই থাকতে হবে। ওরা আমাদের
াবে না। আমাদের গায়ে হাত তুললে বাইরে আগুন জ্বলে যাবে।
নিশ্চয় সে কথা বুঝতে পারছে।

নিজেরা কথা থামালেই বোঝা যাচ্ছিল, রাস্তা জুড়ে সবাই সমানে
বলছে। পাঁচটা ওয়ার্ড মিলিয়ে ঘাটের কোলে লোক তো আমরা
নই। তিন শো হাত রাস্তায় তিলধারণের জায়গা নেই।

হঠাৎ সামনের দিকে সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে যেতে আট নম্বরের
াকাছি এসে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিড়ের মধ্যে সামনে
নে একটা চালাচালি শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'যাচ্ছি,
বিন্দদা' ব'লে কনক ছুটে সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে গেল।
লাম নির্দেশমতো যে যার ওয়ার্ডের কাছাকাছি গিয়ে খাড়া হচ্ছে।

আমাদের ওয়ার্ড থেকে গেট অনেকটা দূরে। ফটকের ঠিক
র বেশ জোরালো আলো। একে শীতের সন্ধ্যে। একটু কুয়াশার
তার ওপর সামনে দেয়াল তুলে রয়েছে কালো কালো মাথা।

রাস্তার ধার বরাবর ড্রেনের দিকে স'রে গিয়ে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে
মনে দেখার চেষ্টা করলাম। একদল লাঠিয়াল পুলিশ গেটের
পাশে লাইন ক'রে দাঁড়িয়েছে।

গেটের সামনে আমাদের যে কমরেডরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের
থেকে একজন চোঙ মুখে দিয়ে কিছু বলছে। বলছে হিন্দীতে।
মানে, সেপাইরা অবাঙালী। কথা শুনে বুঝতে পারছিলাম না
বলছে।

বক্তৃতা বোধহয় ঘণ্টাখানেক চলছিল। শেষের দিকে একবার
চন্দ্রক্ষণের জন্যে বক্তৃতায় ছেদ পড়েছিল। ফটকের বাইরে থেকে
কউ একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল। লোকটার সাহেবী
পোশাক। একটু থেমে ভদ্রলোক তাঁর হাতের দিকে তাকালেন।
নে হল ঘড়ি দেখলেন।

রাত তখন খুব কম নয়। ইউ-টি ওয়ার্ডের একতলায় মশারি

খাটিয়ে অনেকেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দোতলার জানলায় হা
শহরের সেই ছেলেটি নেই। ভিড়ের সামনে থেকে বারকয়েক স্লো
দিতেই রাস্তায় আমাদের একঘেয়েমির ভাব খানিকটা ছেড়ে গে
তারপর আবার শুরু হল চোঙ মুখে দিয়ে বক্তৃতা।

বক্তৃতা চলতে চলতেই ঝনঝনাৎ ক'রে সামনের গেটটা খ
যাওয়ার একটা আওয়াজ হল। আমাদের সামনের সারিটা দ্রু
পিছিয়ে এল। তারপরই আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল কয়েকটা ল
আর ঠিক সেই মুহূর্তে এদিক থেকে এক পসলা শিলাবৃষ্টি। স
সঙ্গে লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ি-মরি ক'রে পালানোর
কি দৃশ্য! এদিক থেকে তখন জয়োল্লাসে স্লোগানের পর স্লোগা
উঠছে। ফটকের ওপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

হঠাৎ বিনামেঘের বজ্রপাতের মতো কট্ কট্-কট্ ক'রে একা
আওয়াজ। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—গুলি! সামনের ভিড়া
সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ তুলে পেছনের দিকে আছড়ে পড়ল। এবার যে যা
ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ো।

ওয়ার্ডের ঢোকার দরজাগুলো ছোট। একসঙ্গে দুজনের বেশি
আঁটে না। আট নম্বরের দরজার ঠিক পাশ দিয়ে একটা গুলি ঠিক
দেয়াল ঘেঁষে চলে গেল। রাস্তায় কোনোরকম আড়াল নেওয়ার উপায়
নেই। ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারলে রক্ষা নেই। পারলে
আমি লাফিয়ে ভেতরে চলে যাই। কিন্তু বুড়ো জামাল সাহেব আমার
ঠিক সামনে। ওঁর মধ্যে এতটুকু ভাবান্তর নেই। টুক টুক ক'রে
যেমনভাবে বেড়ান সেইভাবে দরজার দিকে আস্তে আস্তে হেঁটে
চলেছেন। রাস্তায় আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তবে
কি জামাল সাহেবকে ঠেলে ফেলে আমি আগে ভেতরে ঢুকে যাব?
সেও অসম্ভব। তাহলে নিজের কাছে কখনও নিজের মুখ দেখাতে
পারব না।

তাঁর ঠিক পেছনে এক পলকে আমার মধ্যে যে কত বড় একটা

লটপালট হয়ে গেল বুড়ো জামাল সাহেব ক্ষুণাক্ষরেও তা জানতে পারেন নি। আমি ছাড়া কেউই কোনোদিন তা জানবে না। হঠাৎ নিজেকে খুব আত্মস্থ মনে হল। মোটা সুরথ পিছিয়ে পড়েছিল। তাকে একটা হেঁচকা টান দিয়ে জামাল সাহেবের পেছনে পেছনে এসে আমি ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

আর কেউ বাইরে আছে কিনা দেখে নিয়ে ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। ভারী ভারী লোহার খাট ফেলে দরজার মুখটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। তারপর খাট টেনে টেনে সিঁড়িটা নিচে থেকে ওপর অবধি জ্যাম ক'রে দিয়ে একতলা দোতলা খালি ক'রে দিয়ে আমরা সবাই চলে গেলাম তিন তলায়। সিঁড়ির মুখে মজুত করা হল বোতল গেলাস আর ইট-পাথর। ভয়ের মতো সাহস জিনিসটাও যে ছোঁয়াচে, ছুটে ছুটে লোহার খাট টানতে টানতে বার বার কথাটা আমার মনে হচ্ছিল। নাকি ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম এবং ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ ভয়ের কিছু ছিল না ব'লেই নিজেকে আমার সাহসী ব'লে মনে হয়েছিল?

নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করা, এটা আমার হালে শুরু হয়েছে!

এবার জেলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। আগে থেকেই মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম যে আমাকে যদি বলতে বলে তাহলে রবি ঠাকুরকে আচ্ছা ক'রে তুড়ুং ঠুকে দেব। রবি ঠাকুর বুর্জোয়া; আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। বলব ব'লে বাছা বাছা কিছু শব্দ আমি শানিয়ে রেখেছিলাম। ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে ব'লেই জানতাম। দেখলাম ধুনোর গন্ধে মাথায় ভূতও চাপে। একেবারে গোড়াতেই যে আমার ডাক পড়বে আমি জানতাম না। দাঁড়িয়ে উঠতেই আমার মগজের সাজানো কথাগুলো সব উল্টে গেল। চায়ের দোকানের ছোকরা ডিশের ওপর চা-ভর্তি কাপড়গুলো যেমন উপুড় ক'রে আনে আর দেবার সময় যে রকম উল্টে দেয়, আমার

বলাটাও হল সেই রকম। তারপর কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল। একদল আমাকে এই মারে তো সেই মারে। সভা ভেঙে যাওয়ার পর রাস্তায় একজন আমার কলার চেপে ধ'রে দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধ'রে বলেছিল, 'বলুন কমরেড, আপনি একজন অত্যাচারী জমিদারের পক্ষে?' তবু সেদিন আমার একটুও ভয় করে নি।

তার কিছু দিনের মধ্যেই রবি ঠাকুর সম্পর্কে বাইরে থেকে আমাদের পার্টি লাইন এসে গেল। প'ড়ে সেদিন আমার কী যে আত্মগ্লানি হল বলার নয়। সারা রাত ঘুমোতে পারি নি। আমার ভয় এ নয় যে, কমরেডরা এবার আমাকে এক হাত নেবে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। আমি মার্ক্সবাদ এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি ব'লে। আমি এখনও পেটিবুর্জোয়া থেকে গিয়েছি ব'লে।

মাথাটা এখন আমার খুব পরিষ্কার। আমি বুঝতে পারছি আমার সমস্ত ভুলের গোড়ায় আমার জন্ম। আর আমার সমস্ত দুর্বলতার মূলে আমার দাদু।

পরশু আমাদের লড়াইটা ছিল শুধু রাতটুকুর জন্যে। একটা রাত্তির যদি কোনোরকমে লক-আপ এড়ানো যায় তাহলে সরকারের ধোঁতা মুখ আমরা ভোঁতা ক'রে দিতে পারব।

অন্য সব ওয়ার্ডে তখন কী হচ্ছিল জানি না। লোহার খাট টানার শব্দ কোনো ওয়ার্ড থেকেই আর পাওয়া যাচ্ছিল না। তার মানে, ব্যারিকেড তৈরি শেষ। রাস্তায় কারা যেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো একবার এদিক একবার ওদিক করছে। আমাদের মা বাপ তুলে বিশ্রী রকমের সব মুখ খারাপ করছে। ওরা কি ভাবছে ওদের গালাগাল শুনে রেগে খালি হাতে বেরিয়ে গিয়ে আমরা ওদের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেব?

একবার ক'রে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের দরজায় ওরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে বাজিয়ে দেখে গেল আমাদের ব্যারিকেডগুলো কতটা মজবুত।

তিনতলার সিঁড়ির মুখে আমাদের চার জনের একটা দল এগিয়ে গেল। পেছন থেকে একদল হাতিয়ার যোগাবে আর সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ছুঁড়বে। একদল হাঁপিয়ে পড়লে বা জখম হলে আরেক দল তাদের জায়গা নেবে। আমরা বাকি একদল থাকলাম সেবাশুশ্রূষার জন্যে। আমাদের থাকার মধ্যে দুটো টর্চ, দু বাণ্ডিল তুলো, ছেঁড়া ধুতি আর টিংচার আইডিনের শিশি।

ওরা ঠিক কোথায় প্রথম ঘা দেবে বোঝা যাচ্ছে না। হয় গোড়ায়, নয় শেষে। হয় চারে, নয় আটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে দমাদ্দম দমাদ্দম ঠাস্-স্-স্ ক'রে দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে এল। তারপর ঝননন্ ঝননন্ ক'রে হুড়দাড়িয়ে লোহার খাট উল্টে ফেলার শব্দ।

সাত নম্বর থেকে বাজখাঁই গলায় নিতাই সরদার চেঁচিয়ে বলল, 'কমরেড, চার নম্বরের দরজা ভেঙে ফেলেছে, হুঁশিয়ার থাকুন।'

চার নম্বরের কমরেডরা সমানে স্লোগান দিচ্ছে। স্লোগান থেমে যাওয়ার পর ঠুঁ-ই ঠাঁ-ই ঠুঁ-ই ঠাঁই ক'রে ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। তারপর আবার স্লোগান। তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। এরপরই পর পর কয়েকটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ। গোড়ায় গুলি ব'লে মনে হয়েছিল। পরে খ্যাড়খেড়ে আওয়াজের ভাবে বোঝা গেল—গুলি নয়, টিয়ার গ্যাস।

সাত নম্বর চেঁচিয়ে বলল, 'ওরা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে, কমরেড। ড্রামের জল মেঝেতে ঢেলে দিন।' সঙ্গে সঙ্গে যে কথা সেই কাজ।

টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার শব্দ কতক্ষণ ধ'রে হয়েছিল মনে নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ওয়ার্ডেও তার ঝাঁঝ আমাদের নাকে মুখে এসে লাগল। আমরা আগে থেকেই যে যার রুমাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

এমন সময় ইউ-টি ওয়ার্ডের ছাদ থেকে হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো এসে পড়তেই বাদশা ব'লে উঠল, 'শুয়ে পড়ুন, কমরেড—শুয়ে

পড়ুন।' ভিজে জবজবে হয়ে আছে বারান্দা। তারই ওপর শু
হয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে তিনতলার বার
জালে লেগে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ল

দু এক রাউণ্ড ছোড়ার পরই ওরা বুঝেছে ইউ-টি ওয়ার্ডের ব
থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ে খুব একটা সুবিধে করা যাবে
জুতোর আওয়াজ শুনে আমরা বুঝলাম ছাদে ওঠার ঘোরা
লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওরা আস্তে আস্তে নামছে।

যেটুকু টিয়ার গ্যাস ওরা ছুঁড়েছে, তার ঠেলাতেই তখন আ
নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আছি। সেই সঙ্গে কান খাড়া ক
রয়েছি এবার ওরা কোথা দিয়ে কোথায় যায় সেটা ওদের পায়ের শ
বোঝবার জন্যে।

লেফ্‌ট-রাইট লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে মচ্‌ মচ্‌ শব্দে এক
দল ক্রমশ গেটের দিকে এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই শব্দ গে
কাছে একই রকমের আরেকটা শব্দের সঙ্গে যোগ হল। তারপ
দুটোই ক্ষীণ হতে হতে একই সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেল।

আমরা যারা কান খাড়া ক'রে ছিলাম, সবাই প্রায় একই স
ব'লে উঠলাম—ওরা চলে গেল। আসলে আমরা সবাই কিন্তু ম
মনে বলতে চাইছিলাম—ওরা হেরে গেল।

পাশের ওয়ার্ড থেকে একটু পরেই একটা আওয়াজ ভেসে এল
হ্যালো—আট নম্বর! এবার মার্শাল ভরোশিলভের গলা। সাত
নম্বরে শৈল দুজন। বড় শৈল আর ছোট শৈল। ছোট শৈল ছোট
শৈলই থেকে গেছে। কিন্তু কালক্রমে বড় শৈল-র নাম দাঁড়িয়ে
গেছে ভরোশিলভ। যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে চর্চা এবং সমস্ত সম্মেলনে ভলান্টিয়ার
বাহিনীর জি-ও-সি হওয়া—জেলে এসে তাঁর নামের এই বিবর্তনে যে
যথেষ্ট সাহায্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

ভরোশিলভ জানতে চাইলেন আট নম্বরের সব কমরেড ফিরেছে
কিনা এবং অন্য ওয়ার্ডের কেউ আছে কিনা। এ পর্যন্ত হিসেবনিকেশ

রার কথাটা কারো মনেই হয় নি। তাছাড়া অন্ধকারের মধ্যে সবাইকে ক দেখা যাচ্ছিল না। দেখা গেল, বাইরের কেউ এ ওয়ার্ডে আসে ব। কিন্তু দুজন যে ফেরে নি, সেটা এতক্ষণে খবর নিতে গিয়ে ধরা ড়ল।

ফেরে নি বংশী আর কাঞ্চন। বংশী আমার ভীষণ বন্ধু। আমরা একই সময় ছাত্র আন্দোলনে ছিলাম। লেখাপড়ায় খেলাধুলোয় বিতর্কে ক্তৃতায় বংশী ছিল চৌকস। ইচ্ছে করলেই নিজের ভবিষ্যৎকে ও গুছিয়ে নিতে পারত। তার বদলে এম-এ পড়া ছেড়ে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চলে গেল। ধরা পড়ে জেলে এসেছে প্রায় দুবছর। এখন অনর্গল বাংলা বলে। ওর কথা শুনে কে বলবে ও পাঞ্জাবীর ছেলে!

তরাইয়ের চা-বাগানে শ্রমিক আন্দোলন করত কাঞ্চন। ভলিতে নেটে খেলে। লাফিয়ে শরীরটাকে সাপের মতো বেঁকিয়ে নেট ঘেঁষে ও যখন বল চাপে, সে বল তোলার কারও সাধ্য হয় না।

আমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। এতক্ষণে মনে পড়ল, বাইরে গুলি চলেছিল। কারো কোনো বিপদ-আপদ হল না তো?

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে খবর এসে গেল। আমরা, এবং সবচেয়ে বেশি আমি—হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বংশী আর কাঞ্চন দুজনেই আছে চার নম্বরে। দুজনেই ভাল আছে। বংশী ছিল একেবারে গেটের সামনে। বংশীর একটা পা প্ল্যাস্টার করা—এতক্ষণে মনে পড়ল। তার মানে, এতক্ষণ আমি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে জেলসুদ্ধ সবাই জানে আমি বংশীর পরম বন্ধু। পরম বন্ধুই বটে।

আসল খবর এল আরও আধঘণ্টা পরে। গুলিতে কয়েকজন মারা গেছে। কয়েকজন জখমও হয়েছে। ক'জন কী বৃত্তান্ত এখনও জানা যায় নি।

ভোর হওয়ার ঠিক আগে আবার নিতাই সরদারের গলা। কে কে মারা গেছে তাদের নামগুলো নিতাই এবার বলবে। বেদনায় আর

দুঃখে থমথম করছে নিতাইয়ের গলা। নিতাই বলবার আগেই একটা নাম আমার ঠোঁটের আগায় এসে গেছে। একথা কাউকে বলা যা না। বললে বিশ্বাস করবে না কেউ। দুটো নামের পর আমাকে চমকে দিয়ে নিতাই ঠিক সেই নামটাই বলল। যে 'যাচ্ছি অরবিন্দদা' বলবা পর আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ছাঁত ক'রে উঠেছিল, ছ নম্বরের সে বাচ্চা ছেলে কনক। তারপর আমার আর কোনো সাড়বোধ ছিল না একটু পরে উঠে গিয়ে কখন কিভাবে ভারী ভারী খাটগুলো সরিয়ে আমরা ব্যারিকেড তুলে ফেলেছি, কিছুই আর এখন মনে নেই।

বংশী আর কাঞ্চন কাল সকালেই আবার নিজের নিজের সেলে ফিরে এসেছে। কথাবার্তা কিছু হয় নি। পরে এক সময় ব'সে স শোনা যাবে।

কাল বিকেলে একবার মাত্র ঘুম ভেঙেছিল। টেবিলের ওপর গ হপ্তায় দাদুর দেওয়া বিস্কুটের টিনটা দেখে আঁতকে উঠেছিলাম সেপাইরা কেউ দেখে ফেলে নি তো। টিনটা তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কে পুরে ফেললাম। পরে ওটা কায়দা ক'রে সরিয়ে ফেলতে হবে। বিস্কুট আছে জানতে পারলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের বদনাম দেবে।

এদিকে সারা জেলখানা জুড়ে এখনও সেই শোকের আবহাওয়া।

শনিবার

হাংরাস। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরড়িহায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দোলনে ও-এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস। 'হাংরাস'? হ্যাঁ, হাংরাস। পাশে ছিলেন সুরজিৎবাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বলেছিলেন, মানে হাঙ্গার-স্ট্রাইক।

'হাংরাস' শব্দটা সেই থেকে আমার মনে গেঁথে আছে।

আজ আমাদের অনশনের চারদিন। না, চার রাত তিন দিন। হিসেবের দিক দিয়ে এবার সব উল্টে পাল্টে গেছে।

সাধারণত গোড়ার বাহাত্তর ঘণ্টা ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগে। এবার সব উল্টো। ক্ষিধে যেন দিন দিন বাড়ছে। উঠে উঠে বার বার ঢক ঢক ক'রে জল খাচ্ছি। সেইসঙ্গে একটু ক'রে নুন। এই ক'রে খানিকক্ষণ ক্ষিধেটাকে চাপা দিই। তারপর আবার যে-কে সেই।

কাল যা লিখেছি আজ তা প'ড়ে খুব দমে গেলাম। কিছুই ফোটে নি। কাগজে যেমন রিপোর্ট বেরোয়—'প্রকাশ হয় যে'—ঠিক সেই রকমের হয়েছে। গা বাঁচিয়ে লেখা।

বংশীকে আমি হিংসে করি। সেদিন লড়াইয়ের সময় ও ছিল চার নম্বরে। সারা সন্ধ্যে ও ছিল গেটের ঠিক সামনে। জেল কমিটির নেতা ও। কাজেই থাকতেই হয়েছিল। আমরা দূর থেকে দেখেছিলাম শুধু লাঠিয়াল পুলিশ। তার পেছনে একটু তফাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্দুকধারী গুর্খাদের একটা দল। আমরা দেখতে পাই নি।

গেটের এপাশ থেকে চোঙ মুখে দিয়ে পুলিশদের ভাই ব'লে ডেকে বংশী আর রামাবতার হিন্দীতে অনেকক্ষণ ধ'রে বক্তৃতা দিয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এসে ওয়ানিং দেবার পরও বক্তৃতা চলছিল। এমন সময় গেটটা খুলে যায়। লাঠিয়াল পুলিশরা কাচের ভাঙা বোতল আর ইঁটের টুকরোয় জখম হয়ে যখন পালাতে থাকে, ঠিক সেই সময় বন্দুকের মুখে আগুন ঠিকরে ওঠে। গুলি-লাগা কমরেডদের কুড়িয়ে নিয়ে তখুনি চারে আর ছয়ে সবাই ঢুকে পড়ে।

তার খানিকক্ষণ পর আর্মড্ পুলিশ আমাদের ওয়ার্ডগুলোর পাশ বরাবর রাস্তায় ঢুকে আসে। ততক্ষণে চার নম্বরের একতলায় ব্যারিকেড শেষ। লোহার খাট ফেলে ফেলে সিঁড়িটা নিচে থেকে ওপর অবধি বুঁজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চার নম্বরের দরজায় সেই সময় প্রথম ঘা পড়ে। তারপর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের দরজায় ঘা মেরে ওরা বুঝতে পারে ব্যারিকেড করা হয়েছে। ফিরে এসে চার নম্বরের দরজা

ভেঙে ফেলে। একতলায় ব্যারিকেড ভেঙে ওরা যখন সে...র
সরিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে তিনতলা থেকে থালা আর
ছোঁড়া শুরু হয়। নিচে থেকে গুলি করবে তার উপায় নেই। কেননা
ওপরে সবাই আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে। দু-চারজন ঘায়েল হতেই ওরা
তখন ওপরে ওঠার আশা ত্যাগ করল।

আওয়াজ শুনে ধরা গেল, ওরা এবার নেমে একতলার উঠোনে
গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরই শুরু হল টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া। তখন
খাবার জলের ড্রাম উল্টে ঘর আর বারান্দা জলে জলময় ক'রে দেওয়া
হল। নিচে থেকে ওরা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে বটে, কিন্তু জালে লেগে
শেলগুলো উল্টে উঠোনে গিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে যেটা বারান্দার
নিচের ফাঁক দিয়ে ভেতরে এসে পড়ছিল বংশীরা আবার সেটাকে ধ'রে
বারান্দা গলিয়ে উঠোনে ছুড়ে দিচ্ছিল আর সেই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে
ওদের মাথায় ফেলছিল গেলাস, বোতল আর আধলা ইট। কিন্তু তাতে
তেমন সুবিধে হচ্ছিল না। ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ক্রমে দম বন্ধ হয়ে
আসছিল। চোখ খুলে তাকানো যাচ্ছিল না। সবচেয়ে ভয়ের কথা, ওরা
যদি এখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে তাহলে আর দাঁড়িয়ে
উঠে বাধা দেওয়া যাবে না।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। ওরা কি
তাহলে বুঝতে পেরেছে? সিঁড়ির ব্যারিকেড সরিয়ে ওরা কি তবে
ওপরে উঠে আসবে? বংশীরা নিজেদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে সিঁড়ির
কাছে এল। একেই তো বংশীর প্লাস্টার-করা পা।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই কান খাড়া ক'রে রয়েছে।
সিঁড়িতেও কোনো শব্দ নেই। একজন দেখে এসে বলল, উঠোন
ফাঁকা। সেপাইরা কেউ নেই।

ওয়ার্ড ছেড়ে ওরা যে চলে গেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে বেশ
খানিকটা সময় লাগল। একতলার ঘরে দুজন কমরেডের মৃতদেহ
ফেলে রেখে এসেছে সে কথা এতক্ষণ পর এই প্রথম তাদের মনে পড়ল।

আমরা আট নম্বর। একেবারে পেছনের সারিতে। আমাদের গায়ে কোনো আঁচড় লাগে নি।

বাহাত্তর ঘণ্টা পরেও শরীরের মধ্যে ঘুণ ঘুণ করছে ক্ষিধে আর মাঝে মাঝে আমাকে ফুস্‌লে নিয়ে যেতে চাইছে রংচঙে কথায় ভুলিয়ে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করছি কনকের মুখ। সে মুখও কেবলি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

যারা মারা গেছে তাদের একজন আমার সাত আট বছরের চেনা। জেলা আপিসে প্রথম আলাপ। তখন তার বয়স কম। কাজ করত কৃষক ফ্রন্টে। চাষী পরিবারের ছেলে। গায়ের রং আবলুস কালো। কথা বলত খুব কম। শুধু হাসত। ঝকঝকে সাদা দাঁত ব'লে হাসলে ওকে ভাল দেখায়, সেটা বোধহয় ও জানত।

বুধবার ছিল ওর আর আমার দুজনেরই ইণ্টারভিউয়ের দিন। ওর বউ থাকত গ্রামে। একে অনেক দূর, তার ওপর অনেক খরচ। তাই মাসে একবার আসত। গত বুধবার ওর বউয়ের কি আসবার কথা ছিল? বোধহয় নয়।

আরেক জন। তার সঙ্গে আমার আলাপ জেলে এসে। কাজ করত তার-আপিসে। তার আগে ছিল মিলিটারিতে। ভাল আবৃত্তি করত। বিশেষ ক'রে, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা। নিজেও লিখত। একবার আমাকে দেখিয়েছিল। ছন্দ ঠিক নেই বলায় ওর মনে লেগেছিল। তারপর থেকে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। মনে পড়ে গিয়ে এখন খারাপ লাগছে। ছন্দভুলের কথাটা ওভাবে না বললেই হত।

এত কিছু মনে করার পরেও ক্ষিধে পাচ্ছে, এটা লজ্জার কথা। নিজেকে বার বার ধমকেও এ মুশকিলের আশান হচ্ছে না।

চেয়ার ছেড়ে এখন বিছানায় উপুড় হয়ে লিখছি। সেদিন রাত্তিরে ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। ঘাড় আর পিঠ টনটন করছে।

লক-আপ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আলো নিবতে বেশি দেরি নেই। শুয়ে পড়ার আগে এক পেট জল গিলে নিতে হবে। তাহলে ঘুম হবে। ঘুমোলে ক্ষিধের ভাবটা আর থাকবে না।

কাল যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম, সে রকম স্বপ্ন দেখা ভাল নয়। দেখেছিলাম ছাড়া পেয়ে মাঝরাত্রে বাড়ির গলিতে ঢুকে দরজায় কড়া নাড়ছি। ঘুম ভেঙে যেতে দেখি এক হুমদো সেপাই শব্দ ক'রে আমার গেটের তালা খুলছে।

সোমবার

ওয়ার্ডের দরজা এখন দিনরাত্তির চাবিবন্ধ থাকে। এ বাড়ির বাইরে কোথায় কী ঘটছে জানতে পারছি না।

আজ ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ক্ষিধেটা আর তত চনচনে নেই। বুনো জানোয়ার যেমন আস্তে আস্তে পোষ মানে। এও অনেকটা তাই।

আসলে মন হল সেই বান্দা, যাকে সারাক্ষণ কাজ দিতে হবে। না হলে ঘাড় মটকাতে চাইবে। নইলে শরীর যে খুব কাহিল লাগছে তা নয়। বরং বেশ ঝরঝরে লাগছে। এবারের অনশনে জোলাপ নেওয়ার সময় হয় নি; ফলে, মনে মনে ভয় ছিল। মাথা ধরা, পেটের মধ্যে খিঁচুনি ধরার ভয়। হওয়ার হলে এ ক'দিনের মধ্যেই হত। অন্য ওয়ার্ডগুলোর খবর জানি না। আমাদের এ ওয়ার্ড বিলকুল ঠিক।

কোনো কাজ নেই ব'লেই মুশকিল। ভীষণ একঘেয়ে লাগে।

এতদিন জেলখানায় কিভাবে যে আমাদের সময় কেটেছে, বাইরের লোকে শুনলে বিশ্বাসই করবে না। একটা বিষয়ে এখন ভাল আছি। ঘড়ি ঘড়ি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচা গেছে। ভোরে উঠলে বেড-টি, আটটায় চা-জলখাবার, দশটায় চা, দুপুরে চর্বচোষ্য, দিবানিদ্রা তাড়াতে

কারো ঘরে কফিচক্র, খেলার আগে চা-জলখাবার, খেলে এসে চা, রাত্রে হয় প্রাত্যহিক ভাতরুটি, নয় সপ্তাহান্তিক এলাহি ভোজ। মুখ চলার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে মনে হয়, কারাবাসের এই দীর্ঘ সময়টাকে আমরা শুধু গিলেছি।

ছেলেবেলায় বেশি খেয়ে ফেললে দাদু আমাদের পেটে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতেন, 'বাতাপি ভস্ম! বাতাপি ভস্ম!' বাতাপির গল্প দাদুর মুখেই শুনেছি। বামুনদের ওপর খুব চটা ছিল বাতাপির দাদা। বাতাপি ভেড়ার বেশ ধ'রে থাকত। বাতাপির দাদা বামুন পাকড়ে তাকে সেই ভেড়া কেটে খাইয়ে দিত। তারপর যেই সে বাতাপির নাম ধ'রে ডাকত, অমনি বামুনের পেট ফাটিয়ে দিয়ে বাতাপি বেরিয়ে আসত। সেই বাতাপিকে শেষ পর্যন্ত হজম ক'রে ফেললেন অগস্ত্য মুনি। এই জেলখানায় আমরা সব বিট্‌লে বামুন, না কি প্রত্যেকেই একেকজন অগস্ত্য?

মরেছে। আবার সেই খাওয়ার কথায় ফেঁসে গিয়েছি।

বলাইদা আমাদের পই-পই ক'রে বলেছেন, হাঙ্গার-স্ট্রাইকের সময় কেউ যেন ভুলেও কোনোরকম খাবারদাবারের কথা না বলে। খাবারের কথা মনে হলে তক্ষুনি অন্য কথা ভাবতে হবে। মনে রাখবেন কমরেড, অনশন হল লড়াই। আপনারা প্রত্যেকে হলেন তার সৈনিক।

আজকালকার ছেলেছোকরারা বড়দের মান্য করতে জানে না। আমাদের অবশ্য ও-বক্তৃতা অনেকবার শুনতে হয়েছে। অনশন তো এ জেলে এই প্রথম হচ্ছে না। হালে বাইরে যারা বোমা ছুঁড়ে, রাস্তায় ব্যারিকেড লড়াই ক'রে জেলে এসেছে—বলাইদার বক্তৃতা শুনে পেছনে ব'সে তারা টিপ্পনী কাটে। বলাইদাকে বলে 'অনোসেনাপতি'। অনশনের সৈনিককে বলে 'অনোসৈনিক'।

এ জেলে আমরা যারা আছি, আমরা বেশির ভাগই ধরা পড়েছি গোড়ার যুগে। পার্টির নতুন লাইন চালু হওয়ার ঠিক আগের অবস্থায়। এ বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ভেতর আর

বাইরের মধ্যে ঠিক মিল হচ্ছে না। একদল ভাবছে, ভেতরটা বড্ড বেশি নরম। আরেক দল ভাবছে, বাইরেটা একটু বেশি মাথা-গরম।

ছোট-কম্বল হল ওয়ার্ডের সভা। বড়-কম্বল হয় সব ওয়ার্ড মিলিয়ে। বড়-কম্বলের দিন এবার বেশ মজা হয়েছিল। জেলে জেলেই বলাইদার জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে। বোমার মামলায় ফাঁসি হওয়ারই কথা ছিল। বেঁচে গিয়েছিলেন কপালের জোরে। জেল-কোড তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ। জেল-কর্তৃপক্ষকে প্যাঁচে ফেলতে তাঁর জুড়ি নেই। ইদানীং বলাইদার সময় ভাল যাচ্ছিল না। আপোসপন্থী ব'লে ছেলেছোকরার দল তাঁর বদনাম করছিল। বলাইদা তাঁর বক্তৃতায় 'খোলা ময়দান আর বন্ধ জেলখানা, এ দুটো এক নয়—লড়াইয়ের অস্ত্র তো বটেই, লড়াইয়ের ধরনও আলাদা' এ বাক্যবাণ কাদের লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়লেন, কারও বুঝতে কষ্ট হল না।

বলাইদাকে আমি শুধু পছন্দ করি না। মতের দিক থেকেও তাঁর সঙ্গে আমার মেলে। তবু তাঁর ঠেস-দেওয়া এই কথাগুলো আমার ভাল লাগে নি। নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, দিনকে দিন একটা গয়ংগচ্ছ ভাবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি।

মাস দেড়েক আগে আমরা জনকয়েক মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম চোখ দেখাতে। সঙ্গে ছিল সশস্ত্র পাহারা। হাসপাতালে কী ভিড়। অত ভিড়ের মধ্যে একবার হারিয়েও গেলাম। ইচ্ছে করলেই এস্কর্টদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু পালানোর ব্যাপারে জেলের নেতাদের বারণ ছিল। আসলে মনকে চোখ ঠেরেছিলাম ঐ ব'লে। কেউ কেউ তো পালিয়েওছিল। পালালে অন্তত বাইরের নেতারা আপত্তি করতেন ব'লে মনে হয় না। মনে আছে, চোখ দেখানোর পর পুলিশের লোকেরা জেলের পয়সায় দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা-টোস্টও খাইয়েছিল।

সাবধান! ঘুরে ফিরে আবার সেই খাওয়ার কথায় চলে যাচ্ছি কিন্তু।

বারান্দায় চেয়ার টেনে খানিকক্ষণ ব'সে এলাম। ওখান থেকে এক চিলতে আকাশ দেখা যায়। এখানকার এই সেইগুলোর এই এক মুশকিল। শুধু ইঁট আর দেয়াল ছাড়া কিছু দেখা যায় না। মাঝে মাঝে খুব হাঁফ ধরে।

আসলে ওসব বারণ-টারণ ঠিক নয়। আমাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে আমার দাছু। শাসনের দড়ি দিয়ে বাঁধলেও কথা ছিল, দাছু আমাকে বেঁধেছে ভালবাসার মায়াডোরে।

নইলে আমার তো আজ জেলে থাকার কথা নয়। পার্টি বলেছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে। দাছু রাজী হয় নি। দাছু বলেছিল, আমি তো তোকে পার্টির কাজ করতে বারণ করছি না। ধরা প'ড়ে জেলে গেলেও আমার আপত্তি নেই। ইন্টারভিউ তো পাবো।

কিন্তু এইবার? দাছু বুঝুক, বাইরে আর ভেতরে কোনো তফাত নেই। যেদিন আমরা লক্‌-আপে যেতে অস্বীকার করলাম ঠিক সেই দিনই ছিল আমার ইন্টারভিউ। লুচি আর পায়েসের কৌটো হাতে নিয়ে আমাকে না দেখে কী মন নিয়ে দাছু ফিরে গিয়েছিল বেশ বুঝতে পারি। পরের দিন থেকে হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু হবে দাছু জানত। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিল পরের দিন। কারা যেন রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছিল যে, আমি মারা গিয়েছি। গুজবটা কি দাছুর কানে পৌঁছেছিল?

দাছু, দাছু, দাছু। আচ্ছা, দাছুকে সামনে খাড়া ক'রে আমার নিজের ছুর্বলতা কি আমি আড়াল করছি না?

মঙ্গলবার

কাল লক-আপের পর একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। সবে ঘুম আসছে এমন সময় অনেক দূরে গাড়ির হর্নের আওয়াজ। গেল বার দশদিনের অনশনের মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন শুনতাম।

হুস্ ক'রে গাড়িটা জেল-গেটে এসে থামল। জেল ভিজিটারের গাড়ি।

অন্যান্য বার দু তিন দিনের মধ্যেই গাড়িটা এসে যায়। এবার এল ছ'দিন পার করে দিয়ে। বোধহয় বাজিয়ে দেখে নিতে চাইছে আমাদের জোর কতটা।

অনশন যে একটা লড়াই কমবয়সীদের এটা বোঝা উচিত। রাস্তায় বন্দুকের সামনে দাঁড়ানো আর না খেয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগুনো, দুটো দু ধরনের বীরত্ব। এই দেড় বছরে তো কম দেখলাম না।

প্রত্যেক বারই অনশন হলে কিছু না কিছু লোক খসে যায়। গোড়ায় তাই বাছাই করতে হয়। যাদের শরীর খারাপ, যাদের খুব বয়স হয়েছে—তারা এমনিতে বাদ যায়। কিছু লোক অনশনের মুখোমুখি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ব্যাপার বুঝে নিয়ে তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হয়। কিছু আছে যারা মুখ ফুটে বলেই ফেলে। তাদের রেহাই দেবার জন্যে মুখরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আবার অনশন চলতে চলতে ভাঙবার লোকও থাকে। লক-আপের পর কারো ঘরে স্ট্রেচার এলেই বুঝতে হবে হাসপাতালে যাচ্ছে নির্ঘাত হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙতে। আশপাশের জেল থেকে কমরেডরা তাদের দিকে থুথু ছিটোয়, মা-বাপ তুলে গাল দেয়। কমরেডদের গলা শুনে শেষ পর্যন্ত মনে জোর এনে স্ট্রেচার ফিরিয়ে দিয়েছে এমনও অনেকে আছে।

অনশন ভেঙে দিয়ে পরে আবার মুখ চুন ক'রে ওয়ার্ডে ফিরে এসেছে, পরের বার বীরবিক্রমে শেষ পর্যন্ত অনশন করেছে, এ রকম হয়েছে চাষীমজুর কমরেডদের মধ্যেই বেশি। নইলে অনশন ভাঙলে একেবারে জেলছুট হয়ে যাওয়ার সংখ্যাই বেশি।

জেল ভিজিটার এসেছে তো কম সময় হল না। ভাবলাম এতক্ষণে একজন ওয়ার্ডারের এসে যাওয়া উচিত ছিল। এলে দোতলার

কোণের ছুটো ঘরে লক-আপ খোলার আওয়াজ হত। এলে সিঁড়িতে ওঠা আর নামার আওয়াজ হত। হয় নি।

তার মানে, গাড়িটা জেল ভিজিটারের নয়।

তার মানে, আলাপ-আলোচনা ছ'দিনেও শুরু হল না।

কনকের মুখটা মনে করবার চেষ্টা করছি আজ সকাল থেকে। মনটা খুব খারাপ লাগছে। কনকের মুখ কিছুতেই স্পষ্ট মনে করতে পারছি না।

বিকেলে উঠোনে বেড়াবার পর একসঙ্গে ছুটো ক'রে ধাপ টপকে ওপরে উঠেছিলাম। ওভাবে ওঠা ঠিক হয় নি। বলাইদা ঠিকই বলেছিলেন, হাঙ্গার-স্ট্রাইকের সময় খুব ধীরেসুস্থে ওঠা-হাঁটা করা দরকার।

নইলে বুক ধড়ফড় করে।

অথচ এখন দরকার যতদূর সম্ভব শক্তিক্ষয় না করা।

বুধবার

সকালে আজকাল উঠোনের রোদে ব'সে আমরা খুব ক'রে তেল মাখছি। আগে কখনই আমার তেল মাখার অভ্যেস ছিল না। গায়ে তো নয়ই, এমন কি মাথায়ও নয়। এই প্রথম বুঝছি তেল মাখার আরাম।

কিচেন নেই, স্টোর নেই—তাই ফালতুর সংখ্যা এখন আমাদের কম। তাই যারা পারে তারা অনেকেই এখন হয় নিজে নিজে নয় একজন আরেকজনকে তেল মাখায়। আমাকে নিজে নিজে, পায়ে তেল ডলতে দেখে একপাশ থেকে শিবপুরের বাদ্‌শা ফোড়ন কাটল, নিজের পায়ে ভাল ক'রে তেল দিন, দাদা—লক্ষণ ভাল নয়।

বাদ্‌শা ভারি মজা ক'রে কথা বলে। গোড়ায় গোড়ায় খুব লাজুক ছিল। ওর চলায় বলায় আড় ভেঙেছে জেল কমিটিতে যাওয়ার পর।

এখন বেশ জাঁক ক'রে বলে, আমি লোহা-কাটা মজুর—আপনাদের অত ঘোরপ্যাঁচ বুঝি নে।

সকালে রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। রোদের জন্যে চোখে হাত দিয়ে থাকতে হচ্ছিল। খুব লোভ হচ্ছিল শুয়ে শুয়ে আকাশটাকে দেখবার। ছেলেবেলায় ঘাসে শুয়ে আকাশটাকে নিয়ে মনে মনে আমি খেলতাম। অনেকটা সিনেমা দেখার মতো। চলন্ত ভেড়ার পাল। রাখাল। কত সব মজাদার মুখ। উদ্ভট জানোয়ার। কিন্তু ন' নম্বরের মাথায় ছোট্ট একটা নীল ফালির মতো আকাশ আর একটা চারাগাছ ছাড়া আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর কিছু নজরে আসছিল না। মুঠোটাকে গোল ক'রে দৃষ্টিটাকে চারাগাছে ফেলতেই বিরাট একটা গাছ হয়ে গেল।

মনে পড়ে গেল, কালীতলায় সেই জঙ্গলের কথা। বছরে একটা দিন আমরা গাঁসুদ্ধ সবাই সেখানে যেতাম বনভোজনে। সেই একটা দিন কোনো জাত মানামানি থাকত না। সবাই আমরা এক পঙ্‌ক্তিতে ব'সে খেতাম। বিল থেকে তুলে আনা হত পদ্মপাতা। পদ্মপাতার গন্ধটা নাকে এখনও লেগে আছে। গরম ভাত আর পাঁঠার মাংস।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে পড়লাম। স্নান ক'রে উঠে ঘণ্টাখানেক ক্যাপিটাল পড়ব। হাঙ্গার-স্ট্রাইক হয়ে এই একটা ভাল হয়েছে। এখন দিনের বেলায় ঘরে ব'সে ক্যাপিটাল পড়লে কারো দেখে ফেলার ভয় নেই। যারা নেতা নয়, তারা আবার ক্যাপিটালের বুঝবেটা কী ?

পার্টির কাগজে কাজ করতাম তো। একবার খুব রাগ হয়েছিল। সেণ্ট্রাল কমিটির একটা বিবৃতি এসেছে। তার বাংলা করতে বসেছি। একজন ওপরওয়ালা এসে হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন—উঁহু, ওর বাংলাটা পি-সির কাউকে দিয়ে করিয়ে আনো। অবশ্য সি-সির কেউ করলেই ভাল হত। লাইনের ব্যাপার তো। কথার একটু হেরফের হয়ে গেলে, বুঝতেই তো পারো, খুব মুশকিল হয়ে যাবে।

ক্যাপিটাল পড়তে গিয়ে অনেক জায়গাতেই ঠেকে যেতে হচ্ছে। তবু অনেক বন্ধ দরজা একে একে যেন খুলে যাচ্ছে।

বলাইদা বলেছিলেন, অনশনের সময় হালকা বই পড়া উচিত। তাস চলবে। দাবা নয়।

তিনদিন ধ'রে আমি তো ক্রমাগত সিরিয়াস জিনিসই পড়ছি। মাথা অসম্ভব পরিষ্কার লাগছে। বলাইদা মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছিলেন।

চোখের দৃষ্টি বেড়েছে বলব না। কিন্তু কানে অনেক বেশি শুনছি। দূরের খুঁটিনাটি আওয়াজগুলো পর্যন্ত কানে আসছে।

আরেকটা কথা। এখন ভাঙা হবে না। আমি, বাদ্শা, গৌরহরি আর শঙ্কর—আমরা আজ সকালে ব'সে ব'সে একটা ষড়যন্ত্র এঁটেছি। আজ সন্ধ্যে থেকে নিজেদের একটা গুপ্ত বৈঠক হবে। বংশীকে দলে নেব ভেবেছিলাম। পরে ভেবে দেখা গেল, ও আবার সাহেবলোক। রুচিতে আমাদের ঠিক মিলবে না।

বলাইদাকে ভয় নেই। সাত নম্বরে আটক আছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন জামাল সাহেবের কানে কথাটা না ওঠে।

আমাদের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে দুজন মজুর, একজন কৃষক। কালীপদ ট্রামকর্মী আর গৌরহরি মাঝারি চাষী। কাজেই ধরা পড়লেও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব আর শ্রমিক কৃষকের মৈত্রী ইত্যাদি স্তম্ভগুলো আমাকে রক্ষা করবে।

বাদ্শার সঙ্গে আমার আরও একটা প্ল্যান হয়েছে। রোজ দুপুরে ওর সঙ্গে বসব। ও ব'লে যাবে ওর জীবনের কাহিনী। আমি নোট নেব। পরে যদি কখনও উপন্যাস-টুপন্যাস লিখি, কাজে লাগাব।

তাছাড়া এতে দুপুরের ঘুম তাড়িয়ে রাত্তিরের ঘুমটা গাঢ় করারও বেশ একটা উপায় হবে।

আমার দাদা, মানে ঠাকুর্দা, এব্রাহিম মণ্ডল। রিপুর কাজ করত। দাদাকে আমরা দেখি নি। দাদার গল্প বা-জানের কাছ থেকে শুনেছি। বা-জান বলত, 'আমার বাবা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঁথা সেলাই ক'রে বেড়াত। ভাল কাজ জানত না। বোকাসোকা ভালমানুষ মতন। একটু গোলা ধরনের। তার সুযোগ নিয়ে লোকে ঠকিয়েছেও খুব। বাবার ছিল গোলপাতার ঘর। বর্ষার সময় জল পড়ত। ঠেলাগোঁজা ক'রে কোনোরকমে চলছিল। একবার ঝড় এসে মাথার চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন আমাদের কী কষ্ট। তখন শীতের সময়। রাত্তিরে আমরা জেগে ব'সে ঠকঠক ক'রে কাঁপতাম। বাবা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ব'সে থাকত। যাতে বাবার বুকের গরমে আমি একটু আরাম পাই। আরাম হত না ছাই। বাবা বুঝত না টস্‌টস্‌ ক'রে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াত আর আমার গা ভিজে গিয়ে আরও বেশি গা সিরসির করত। আমার মা গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দিত। কখনও যেত রেললাইনে কয়লা কুড়োতে। বাছতে গিয়ে ভেতরের গরম কয়লায় প্রায়ই মার হাতে ছ্যাঁকা লেগে যেত। ফোস্কা পড়ত। পাড়ার লোকে তাই নিয়ে বাবাকে টিটকিরি দিত। এব্রাহিমের বউ এই যে বাইরে বাইরে ধিঙ্গি হয়ে বেড়ায় এটা ভাল নয়। মুসলমান পাড়ার এতে বদ্‌নাম হয়। বলত কে? না, পাড়ার মোড়ল। আমাদের ঘর-ভিটে ছাড়াও পূর্বপুরুষদের দু টুকরো জমি ছিল। তা দশ বারো কাঠা হবে। বাবা জানত না। ঐ মোড়ল ব্যাটাই এতদিন তা মেরে খাচ্ছিল। কিভাবে যেন বাবা সেটা জানতে পারে। তারপর পাশমোড়লকে ধ'রে পাড়ায় মামলাসালিশি ক'রে ছাপ্পান্ন টাকা খরচ ক'রে সেই জমি আমি উদ্ধার করি।' এটা নিয়ে বা-জানের ছিল খুব গর্ব।

বা-জানা বলত, 'ছেলেবেলায় আমরা যে কী কষ্টে মানুষ হয়েছি তোরা বুঝবি নে। রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মনে মনে জেকের করতাম—হায় আল্লা, বড় হয়ে বাপের দুখ্যু যেন ঘোচাতে পারি। এই যে আমি মুখ্যু রয়ে গেলাম, সে কি আর এমনি এমনি? আমার যখন আট-ন' বছর বয়স, তখন আমি এক রশিকলে কাজ নিই। রোজ যেতে আসতে ষোল-আঠারো মাইল। এই পুরো রাস্তাটা আমাকে হাঁটতে হত। কত ক'রে রোজ ছিল, জানিস? দিনে চার ছ' পয়সা। তখন আমার কাছে ঐ ঢের। কাজ করছি। বাবার হাতে পয়সা তুলে দিচ্ছি। এই ছিল আমার গর্ব।'

আমার কথা বৃহস্পতিবার

কালীপদ যে এ রকম পেটপাতলা জানতাম না। জামাল সাহেবকে একথা সে-কথার মধ্যে ব'লে এসেছে, কাল সন্ধ্যেবেলা আমরা কয়েকজন ব'সে আলোচনা করেছি যে পার্টির উচিত ড্যালহাউসিতে সস্তা দামে খাবারের দোকান খোলা। দোকানে কী কী খাবার থাকবে তার ফিরিস্তি। অর্থাৎ, আমাদের পুরো আলোচনাটাই জামাল সাহেবের কাছে খুঁটিয়ে রিপোর্ট করেছে। তারপর আবার নিজে আগ বাড়িয়ে এও বলেছে—জেল কমিটির উচিত বাইরে পার্টির কাছে এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব পাঠানো। তার উত্তরে জামাল সাহেব হ্যাঁ-না কিছু বলেন নি। উনি হাসিমুখে সব শুনেছেন। কালীপদর ধারণা জামাল সাহেবের খুব একটা আপত্তি নেই। শুনে বাদ্‌শা দাঁত কিড়মিড় ক'রে ব'লে উঠল, এবার কালী তোকে খাবো।

কিছুক্ষণ পরেই দোতলায় আমার আর বাদ্‌শার ডাক পড়ল। জামাল সাহেব বললেন, ক্ষিধেটা হল আগুন—দেখবেন এই আগুন নিয়ে খেলা সবার ধাতে কিন্তু নাও সইতে পারে।

ফিরে এসে আমাদের গুপ্তসভা থেকে কালীপদর সদস্যপদ তৎক্ষণাৎ

খারিজ ক'রে দেওয়া হল। সন্ধ্যেবেলা জায়গা বদ্‌লে আমরা গৌরহরির ঘরে গিয়ে বসলাম। খানিক পরে সেলের দরজায় কালীপদ মুখ চুন ক'রে এসে দাঁড়াল। আমাদেরও একটু মায়া হল। কিন্তু ওকে দিয়ে কিরে কাটিয়ে নেওয়া হল যে, আমাদের আলোচনার কথা বাইরের কাউকে আর সে বলবে না। আমাদের গুপ্ত সমিতির নাম দেওয়া হল 'কারখানা'। গৌরহরি 'খামার' নামটা চালাতে চেয়েছিল। ওতে 'মার' কথাটা থাকায় আমরা আপত্তি করলাম।

আজ দুপুরে নোটখাতা নিয়ে বাদ্‌শার সঙ্গে বসেছিলাম। এমন সময় বংশী এসে বাদ্‌শাকে ডেকে নিয়ে গেল। কী একটা বিষয়ে ওদের জরুরী আলোচনা আছে।

ওদিক থেকে আপোসের কোনো প্রস্তাব এসেছে নাকি? আসা তো উচিত। আটদিন তো হয়ে গেল। উঁহু, সাত দিনই। তা কেন বিষ্যুদে বিষ্যুদে আট। হ্যাঁ, আট দিন তো।

সেবার দশ দিনে হাঙ্গার-স্ট্রাইক মিটল। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই জেল ভিজিটারের হাঁটাহাঁটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেবার বাইরে ছিল খুব গরম অবস্থা। বাইরের লোকেরা আমাদের কথা কি ভুলে যাচ্ছে?

আমার বন্ধুরা? কই, তারা তো কেউ একটা চিঠি-চাপাটি দিয়েও কোনোদিন আমার খোঁজ নেয় না। পুলিশ পেছনে লাগবার ভয়? পুলিশ কি কচি খোকা? তারা জানে না কোন্ কোন্ বন্ধুর বাড়িতে ব'সে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতাম? ধরবার হ'লে এমনিতেই তাদের ধরত না?

পরক্ষণেই আমার হুঁশ হয়। বন্ধুদের প্রতি আমি অবিচার করছি। তাদের সকলেরই নিজের নিজের জীবন আছে। নিজের নিজের সমস্যা আছে। এই দেড় বছরে আমিই কি চিঠি লিখে কখনও তাদের খবরাখবর করেছি? তাহলে?

আসলে এই অভিমানটাও বন্দিদশা থেকে আসে। বাইরে

হাসপাতালে থাকলেও ছেলেমানুষের মতো এই রকমের একটা বায়না আমাদের পেয়ে বসে। আমি শহীদ। আমি গেলাম। আমাকে দেখ। এই রকমের একটা ভাব। এক কথায়, আমাকে নিয়ে আদিখ্যেতা করো।

আজ আমাদের 'কারখানা' পুরোদমে চলেছিল। কালীপদ কাল থেকে সকাল বিকেল দু শিফ্‌টে কারখানা চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ ছুট আউট ক'রে দিয়েছি।

বাদ্‌শার কথা — শুক্রবার

আমার বুবু, অর্থাৎ আমার ঠাকুমা, অনেকদিন বেঁচেছিল। বুবু মারা যায় যখন তার বয়স নব্বইয়ের ওপর। আমার দাদা, অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দা, দুঃখকষ্টের মধ্যেই মারা যায়। বা-জান তখনও দাঁড়াতে পারে নি। কোনোরকমে ঘষটে ঘষটে সংসার চলছিল। সেই নিয়ে বা-জানের বরাবরের আপশোষ ছিল। আমাদের সংসারে তবু বুবু, আমার ঠাকুমা, কিছুটা সুদিনের মুখ দেখে যেতে পেরেছিল।

আমার জ্ঞান হল যখন, তখন দেখেছি, তিরিশ বছর লোহাকারখানায় কাজ ক'রেও বা-জানের রোজ ষোল-আঠারো আনা। পুরো পাঁচ সিকেও নয়। বা-জান বলত তোদের মানুষ করেছি কত কষ্টে। সেই আট-ন' বছর বয়স থেকে কলে কাজ করছি। এখান থেকে কখনও গিয়েছি ঘুসুড়ি, কখনও খিদিরপুর। গোটা রাস্তা হেঁটে। খালি পায়ে। গরমের দিনে ফোস্কা প'ড়ে পা ফুলে যেত।'

পরের দিকে বা-জানের একটা সাইকেল হয়েছিল। আগে সেই সাইকেলটার কথা ব'লে নিই। কেনার সময়কার কথা জানি না। আমরা যেমনটা দেখেছি বলছি।

তার প্যাডেল, তার রড, তার সিটের নিচেকার জয়েন—সব আগাপাছতলা ঝালাই করা। ডানদিকের হ্যাণ্ডেলে বেল্ ছিল। কিন্তু

বাজাতে গেলে বাজত না। কেবল খোয়া-ভোলা রাস্তায় ঝাঁকানি খেলে তা থেকে আপন মনে ঠনন্‌ং ঠনন্‌ং ক'রে বোল উঠত। আর টায়ার। তার তিন-চার জায়গায় বড় বড় তালি। তালিগুলো সংখ্যায় যে হারে বাড়ছিল, তাতে কিছুদিন পরে তালির নিচে আদত টায়ারটা আর দেখাই যেত না। মোড় ঘুরতে হত খুব সাবধানে, কেননা টায়ারের দাঁতগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে বুড়োদের মাড়ির মতো প্লেন হয়ে গিয়েছিল। ব্রেক ছিল না। পরে মাডগার্ডটাও খসে যাওয়ায় সওয়ারীর ডান পা-টাই ব্রেকের কাজ করত। তিন-চার মাইল রাস্তার মধ্যে অমন সাইকেল দুটো ছিল না। ফলে, সে সাইকেল যেই চড়ে যাক, রাস্তায় লোকে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলত 'বাবরিঅলার পা-গাড়ি'। যাদের বয়স একটু কম তারা 'বাবরিঅলা' বলত না। বলত 'ফকির সাহেব'।

এককালে বা-জানের বাবরি চুল ছিল। বাহারে বাবরি। কালো কালো একরাশ কোঁকড়া চুল ঘাড়ের দিকে ফেরানো। লম্বা দোহারা চেহারায় ঝাঁকড়া চুলে বা-জানকে সুন্দর মানাত। পরে আমাদের চোখের সামনে উঠে উঠে সেই চুল একেবারে পাতলা হয়ে গেল। মাথার ঠিক মাঝখানটায় টাক পড়ল। গোড়ায় গোড়ায় চুল দিয়ে টাকটা ঢেকে দেওয়া যাচ্ছিল। পরে টাকও যেমন বেড়ে গেল, চুলেও তেমনি টান পড়ল।

গোড়ায় গোড়ায় বা-জান চুলে কলপ দিত। পরে বড্ড বেশি জানাজানি হয়ে যাওয়ায় চুলে কলপ দেওয়া ছেড়ে দিল। গোঁফ নেই, জুলপি নেই—থুতনির নিচে নৌকার মতো একটু দাড়ি। সাদা হয়ে যাওয়ার পর কালো মুখের মধ্যে দাড়িটা দেখাত ঠিক ঈদের চাঁদের মতো।

একটা বুকখোলা হাত-কাটা সুতির কোট, ছেঁড়া তেলচিটে গেঞ্জি সেলাই-করা আটহাতি ধুতি—বা-জানের এই ছিল বরাবরের ড্রেস। বা-জান কোটটাকে একটু বেশি খাতিরযত্ন করত। বাড়ি থেকে

কারখানা আর কারখানা থেকে বাড়ি—শুধু আসাযাওয়ার এই পথটুকু কোটটা বা-জানের গায়ে উঠত। কারখানায় পৌছেই গা থেকে কোটটা খুলে ফেলত। বাড়ি এসে কোটটা খুলে হেৎনের দেয়ালে পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখত। নতুন অবস্থায় অবশ্য পুরো হাতার কোটই থাকত। তারপর যেমন যেমন ছিঁড়ত তেমন তেমন কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হত ব'লে হাতাটা ছোট হয়ে আসত। শেষের দিকে কোটে হাতা ব'লে আর কিছু থাকত না। পিঠে কলারের কাছটাতে তখন তালি পড়ত। পেছন ফিরলে তবে সেটা দেখা যেত। গেঞ্জিটা যখন একেবারে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত, গায়ে ঝোলাবারও আর কোনো উপায় থাকত না, একমাত্র তখনই গায়ে নতুন গেঞ্জি উঠত। বা-জানকে আমরা ক'বার নতুন গেঞ্জি পরতে দেখেছি, প্রায় আঙুলে গুণে ব'লে দিতে পারি। আর বা-জানের ধুতি সেলাই করতে করতেই তো দেখলাম মা-র নজরটা চলে গেল।

বা-জানের কোটের পকেট। সেটাও ছিল আমাদের কাছে খুব মজার ব্যাপার। ডান পকেটে একটা বড় পানের ডিবে। বাঁ পকেটে বিড়ির ডিবে, দেশলাই আর ছেঁড়া একটা ন্যাকড়া। ঠোঁটের দুপাশ থেকে পানের কষ মুছে মুছে ন্যাকড়াটা সব সময় রক্তবর্ণ হয়ে থাকত। ডিবেগুলো একটাও কেনা নয়। কারখানায় বা-জানের নিজের হাতে বানানো।

তা সে শ্বশুরবাড়িই যাক, আর বিয়েসাদিতেই যাক্, কী শীত কী গ্রীষ্ম—বা-জানের ছিল ঐ এক ড্রেস। সবেধন নীলমণি, কী পোশাকী আর কী আটপৌরে।

মা-র কাছে শুনেছি—বড় বুবু, মানে আমার দিদি, হওয়ার আগে বা-জান রোজ রাত্তিরে বেহেড মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরত। এমন দিনও গেছে যখন একেবারে বেহুঁশ হয়ে আলগা কাপড়ে বাড়ি ফিরেছে। রাস্তার দুপাশে ভিড় ক'রে পাড়ার লোক ছি-ছি করেছে, গায়ে থুথু ছিটিয়েছে। লজ্জায় মা তখন পাড়ায় লোকের কাছে মুখ

দেখাতে পারত না। আর গলায় কলসী বেঁধে তখন রোজই পানাপুকুরে ডুবে মরার কথা ভাবত।

বড় বুবু হওয়ার পর বা জানের মতিগতি হঠাৎ একদম বদ্‌লে গেল। বা-জান পীরের কাছে গিয়ে মুরীদ হল। পীর তাকে কল্‌মা শেখাল, কী ক'রে দোয়াতাবিজ দিতে হয় শেখাল, কারো যদি বাতাস লাগে তাকে কিভাবে কী দাওয়াই দিতে হয় শেখাল।

সেই থেকে বা-জানের মন ঘুরে গেল। মদ-তাড়ি এক কথায় সেই যে ছেড়ে দিল আর কখনও ছোঁয় নি। মন চলে গেল রোগ-ব্যামো সারাবার দিকে। বাড়ির সামনে চালা তুলে তৈরি হল দরগা। মানিকপীরের দরগা।

লোকে বলে, বাপ্‌রে—তাহের মিঞা কী ছিল আর কী হল।

তারপর থেকে বা-জানকে কেউ আর 'বাবরিঅলা' বলত না। বলত 'ফকির সাহেব'।

ফকিরি নেওয়ার পর আস্তে আস্তে বা-জান লোককে জলপড়া-টলপড়া দিতে লাগল। অ[illegible]কে এসে বা-জানের কাছে হাতও দেখাতে লাগল।

ফকির তো হয়েছে। এদিকে সংসারের পেট তো কম ক'টি নয়। ভরাতে হবে তো। কাজেই জল হোক ঝড় হোক কারখানায় রোজ তাকে ঠিক টাইম মতো হাজরে দিতে হত।

অথচ কারখানায় সারাদিন বা-জানের মন ছোঁক ছোঁক করত। কখন বিকেল হয়।

ছুটির পর সোজা বাড়ি। এসেই সাইকেলটা দলিজের গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে রেখে বা-জান হাঁক পাড়ত, 'কই, চা হল? ঝপ্‌ ক'রে দাও, আমায় এক্ষুনি রুগী দেখতে যেতে হবে।' কোনোরকমে একটুখানি চা রুটি নাকেমুখে গুঁজে নিয়েই অমনি সাইকেলটা টেনে দে ছুট! এক মিনিটও দেরি করত না।

মদ গিয়ে এক অদ্ভুত নেশা বা-জানকে পেয়ে বসেছিল। রুগী

দেখার নেশা। কোবরেজি, হেকিমি, টোটকা—এইসব ওষুধ-টষুধও বা-জান কিছু শিখে নিয়েছিল। কেমন ক'রে শিখেছিল সেটাই আশ্চর্য। বাড়ির সিন্দুকে কাপড় দিয়ে জড়ানো থাকত নগেন সেনের 'ভৈষজ্যরত্ন', 'নিদান-বিধান,' বটতলার ছাপা 'টোটকা চিকিৎসা,' 'লতাপাতার গুণ'—এই রকমের খানকতক বই। বাড়িতে আমরা কেউই কোনোদিন বা-জানকে সে সব বইয়ের পাতা ওল্টাতে দেখি নি। তাছাড়া পড়বার মতো পেটে বিদ্যেও তো বা-জানের বেশি ছিল না।

বা জানের দেওয়া ওষুধে ফল হতেও আমরা বাড়ির লোকে বড় একটা দেখি নি। অথচ সে কথা বলুক দেখি কেউ! তার জবাব সব সময় বা-জানের ঠোঁটের আগায়—'আজকাল কি আর দোয়াতাবিজে আগের সে বিশ্বেস আছে যে, লোকের রোগ সারবে?' তারপর আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'এককালে এই ফকির সাহেবের ওষুধের কাছে বড় বড় ডাক্তার বদ্যিও ফেল মারত।'

বা-জানের চিকিৎসার কোনো ধরাবাঁধা রীতিরেওয়াজ ছিল না। ঝোপ বুঝে কোপ। বলত, সব বিয়ের এক মন্তর নয়। তাই কোথাও তাগাতাবিজ, কোথাও কোবরেজি বা টোটকা বা হেকিমি। যেখানে যেমন। লাগে তাক, না লাগে তুক।

কিন্তু রোগ যেমনই হোক, সারুক আর না সারুক—ফকির সাহেবকে ডাকতে কেউ ভুলত না। কেননা মানুষটা যে ভাল। রোগ যতক্ষণ না ছাড়ছে, ফকির সাহেব সেই রুগীকে ছাড়বে না। নিজের মুরোদে না কুলোলে ডাক্তারবদ্যি নিজেই সে ডেকে আনবে। এনে বলবে, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনিই দেখুন—হাতুড়েদের ওপর এখন তো আর এদের বিশ্বেস নেই।' বা-জান নিজের দৌড় জানত ব'লেই লোকে বা-জানকে ডাকতে ভরসা পেত। আর বা-জান একবার যে-বাড়িতে ঢুকত, সে-বাড়িতে হয়ে যেত তার মৌরুসিপাট্টা। সন্ধ্যেবেলা গল্পগাছা করার একটা জায়গা। গড়ে উঠত আত্মীয়তা-বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক।

মাঝে মাঝে বেশ রাত হত বা-জানের ফিরতে। মা কিছু বললে বা-জান খেঁকিয়ে উঠত—বলি, শুধু হপ্তার টাকায় কি আর গুষ্টির পিণ্ডি জুটত? রুগী দেখে না বেড়ালে সংসার চলত?

কথাটার মধ্যে একটুও সত্যি থাকত না তা নয়। রুগী দেখে মাঝে মধ্যে একটু আধটু হয়ত রোজগার হত। কিন্তু সেটা এমন নয় যে তাতে সংসারের খুব একটা সাশ্রয় হয়। তবে বা-জানকে বাড়িতে সবাই খুব ভয় ক'রে চলত। কারো ঘাড়ে এমন মাথা ছিল না যে বা-জানের কথার ওপর কথা বলে।

মা-ই যা মাঝে মধ্যে সাহস ক'রে দু-চার কথা বলত। মা সবচেয়ে অপছন্দ করত বা-জানের এই দেরি ক'রে বাড়ি ফেরার ব্যাপারটা। বা-জান নিজেই বলত যে বৌডুবি আর তিনু স্যাকরার গলি—এ দুটো জায়গায় নাকি বা-জানের খুব পসার। মা জানত, ও দুটোর একটাও ভাল জায়গা নয়। হুরী-পরীদের বাস। পাড়ার বউরা যা তা বলে। মাকে ভয় দেখায়। বললে শুনবে না, বা-জানের তবু সেখানে যাওয়া চাই।

মা মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলত, 'আচ্ছা, তুমি যে এত রুগী দেখ, একটা ডাক্তারের ভিজিট দু টাকা। যদি তুমি রোজ পাঁচটা রুগীও দেখ—ফেলে ছেড়ে দিনে আটদশ টাকা। বলি, টাকাগুলো যায় কোন্ চুলোয়?'

বাবা, তার উত্তর দিত ঠাণ্ডা মাথায়। বলত, 'আমার পীরের হুকুম। দোয়াতাবিজ দিয়ে যে অসুখ ভাল হবে তার পয়সা নেওয়া মানা। লোকে যখন পয়সা দিতে আসে তখন বলি—পীরের যখন ওরস্ হবে তখন তোমার যা খুশি দিও।'

ফকির আলেম লোকদের ওপর বেশ্যাদের নাকি অগাধ ভক্তি। ঠাকুরদেবতারা একটু মুখ তুলে চাইলে ব্যবসা নাকি ভাল চলে। গোড়ায় গোড়ায় খারাপ পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে আসত মানিক-পীরের দরগায়। এসে শিন্নি দিয়ে যেত। একবার তাই নিয়ে

আমাদের পাড়ায় খুব হুলুস্থুল ব্যাপার হল। তেরিমেরি ক'রে একদল এসে বা-জানকে শাসাল—দরগায় বেশ্যা আসা চলবে না। পাড়ার মানইজ্জত থাকছে না। লোকের চড়া মেজাজ দেখে বা-জান ঘাবড়ে গেল। সেই থেকে মানিকপীরের দরগায় বেশ্যাদের আসা বরাবরের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

মহরমের দিন আমাদের বাড়িতেই ফাতেহা হত। ইমাম সাহেবের ফাতেহা। ঐদিন খুব ধুমধাম ক'রে কল্‌মা পড়া হত। আর খিচুড়ি ভোজ হত।

মা-র কাছে ছিল বা-জানের যত লম্বাই-চওড়াই। ফুটানি ক'রে বা-জান বলত, 'এই তো মেটেবুরুজের হাঁড়িঅলা আর রামরাজাতলার সাঁপুই, দু বাড়ির দুই ছেলেকে এক ফুঁকে সারিয়ে তুললাম। বাঁচবার ওদের কোনো আশাই ছিল না। তো ওরা হাজার দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি হাতজোড় ক'রে বললাম, পীরের মানা আছে। একদিক থেকে নিই আর অন্যদিক থেকে সিন্দুক খালি ক'রে বেরিয়ে যাক। আমি ওর মধ্যে নেই। হ্যাঁ, আমি নিই—যেখানে আমি খাটি। যেখানে নিজে খেটে ওষুধ তৈরি করি।'

মাও কিছু বলত না, আমরাও শুধু শুনে যেতাম। ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই বুঝতাম—বা-জান যতটা বলে, আসলে বা-জানের পসার ঠিক ততটা নয়। রুগী জুটত মাঝেমধ্যে। আসলে রুগী দেখার নাম ক'রে বা-জান এ-পাড়া ও-পাড়া টহল দিয়ে বেড়াত। বেশির ভাগ যেত বেতাইতলার মোড়ে, নয় চাটুয্যের হাটে। কখনও কখনও রামরাজাতলায়। এ-চায়ের দোকান সে-চায়ের দোকান। যাত্রা-থিয়েটারের এ-ক্লাব সে-ক্লাব। এ সবই ছিল বা-জানের নিত্যনৈমিত্তিক আড্ডা দেওয়ার জায়গা। কিংবা মাঝে মাঝে কারখানার বন্ধুদের বাড়ির বৈঠকখানায়।

ফিরতে খুব একটা রাত হত না। যদিও বা হত সেও অবরে সবরে। রাতে বা-জান যখনই ফিরুক, ফিরত মন হালকা ক'রে।

আমরা শুয়ে পড়লে মাঝে মাঝে বা-জান আমাদের মাথার কাছে এসে বসত। বা-জান তার ছেলেবেলার গল্প করত। বলত, 'তখন লোকের এত বাস ছিল না। জঙ্গলে শেয়াল ডাকত। আমাদের ছিল গোলপাতার ঘর। আমার যখন আট বছর বয়স তখন কলে কাজ করতে ঢুকেছি। নে সব ঘুমিয়ে পড়।' তারপর আমার পিঠে একটা চড় এসে পড়ত, 'এই হারামজাদা। চোখ বোঁজ।' এখনও মনে পড়ে, বাবার হাতের সেই চড়টা খাব ব'লে রাত্তিরে শোয়ার পরেও আমি অনেকক্ষণ ধ'রে চোখদুটো খুলে রেখে চেষ্টা করতাম জেগে থাকতে।

আমার কথা

আমি আর বাদ্‌শা আজ একটু দেরি ক'রে ফেলায় আমাদের 'কারখানা' একটু দেরিতে চালু হয়েছিল।

শঙ্কর যে এত সুন্দর বলতে পারে আগে জানতাম না। আজ কিন্তু ও একবারও তোতলায় নি। পদ্মার চরে মাঝিরা নাকি এক অদ্ভুত কায়দায় রান্না করে। শঙ্কর বলল। টাটকা ইলিশ মাছ নেবে। আঁশ ছুলে নেবে। তার'পর কাটবে। উঁহু, ছুরিবঁটি নয়। ধারালো বাঁশপাতা দিয়ে। তারপর লঙ্কাবাটা নুন-হলুদ দিয়ে কলাপাতায় মুড়ে একটু গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর রাখবে। ওপরে বালিচাপা দেবে। রান্না হবে রোদেতাতা বালিতে। তেল তো ঐ ইলিশের গায়েই আছে। ভাতটাও ঐ বালির আঁচেই রাঁধা হবে। ঐ ইলিশ দিয়ে ঐ ভাতের নাকি তুলনা নেই। সত্যিমিথ্যে ভগবান জানেন!

এরপর ঘুমটা মনে হয় ভালই হবে।

আমার কথা শনিবার

আজ আবদুলের ছাড়া পাওয়ার দিন। আগে কিছু বলে নি। সকালে তেল মাখাতে মাখাতে আজকেই প্রথম খবরটা দিল। আবদুল

আমাদের কালতু হয়ে আছে অনেকদিন। আমি ওকে এসে থেকে দেখছি। ও তাই ব'লে এ জেলে নতুন নয়। বি ক্লাস অর্থাৎ ওর লাইনে ও পাকা লোক ব'লেই এ জেলে আছে। যাকে বলে দাগী আসামী।

আবদুল একদিন ওর পকেটমার হওয়ার গল্প বলেছিল। গল্পটা সত্যি কিনা সে বিষয়ে আমি হলফ ক'রে কিছু বলতে পারব না। কেননা যখন ও বলছিল ওর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যে ওকে অবিশ্বাস করবার আমি কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। তবে এটাও ঠিক, সাধারণত জেলের কয়েদীরা মিথ্যে কথা বলায় ওস্তাদ। বলে অম্লান বদনে। মিথ্যে বলবার জন্যেই যে বলে তা নয়। গোড়ায় কোনো কারণে কিছু একটা কল্পনা ক'রে নেয়। পরে সেটাই ওদের কাছে সত্যি ব'লে মনে হয়।

কয়েদীদের বলব কি, নিজের বেলাতেও তো সে জিনিস অহরহ দেখি। কোনো ঘটনা একটু দূরে গিয়ে যখন স্মৃতি হয়ে যায়, তখন আর সেটা ফটো থাকে না—অনেকটাই কল্পনায় আঁকা ছবি। সেটা আর তখন যদ্দৃষ্টং থাকে না। যখন সজ্ঞানে কিছু ঢাকবার জন্যে কিংবা জাহির করবার জন্যে আমরা নয়কে হয় কিংবা হয়কে নয় করি, তখনই আসে মিথ্যের ব্যাপার।

আবদুলের গল্পটা যদি মিথ্যেও হয়, আমি এটা বলব যে, আবদুল বলেছিল খুব বিশ্বাসযোগ্য ক'রে। আমাদের লেখক ঔপন্যাসিকেরা তো সেই কাজটাই করেন। তার জন্যে তাঁরা কতই তো সাধুবাদ পান।

আমাকে তো প্রথমেই সে চমকে দিয়েছিল এই ব'লে যে, আসলে তার জন্ম হিন্দুর ঘরে। তার পরের কথাটাতে অবশ্য অতটা অবাক হই নি, যখন বলেছিল ও বাঙালী—ওর বাড়ি ছিল বোধহয় ত্রিপুরা জেলার কোনো গাঁয়ে। ওর বাংলা শুনে কিন্তু বোঝা শক্ত হয় যে, ও কখনও বাঙালী ছিল।

তবু আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। ওর অদ্ভুত বাংলায় ও যা বলেছিল, আমি ছোট্ট ক'রে নিজের ভাষায় বলছি :

আমরা ছিলাম দুবোন, এক ভাই। আমি বড়। আমাদের খুব ছোট রেখে বাবা মারা যায়। আমরা তিনজনেই ছিলাম পিঠোপিঠি। আমার তখনও ভাল জ্ঞান হয় নি। তাই বাবার কথা মনেই পড়ে না। মা-র কথা এখনও আমার মনে পড়ে। কিন্তু ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। আমার কাকাজ্যাঠারা মা-কে ঠকিয়ে জমিজায়গাগুলো হাত ক'রে নেয়। মা এর ওর বাড়িতে কাজ করত। ঢেঁকিতে ধান ভানত। আর কাঁদত। মাকে কাঁদতে দেখলে আমার খুব মন খারাপ হত। না, খোদা নয়, আমি তো তখন হিন্দুর ছেলে, মনে মনে ভগমানকে ডাকতাম। বলতাম, আমাকে তাড়াতাড়ি বড় ক'রে দাও, ভগমান—গায়ে জোর দাও, কাকাজ্যাঠাদের আমি মারব।

শুনেছিলাম লোকে শহরে যায়। সেখান থেকে টাকা রোজগার ক'রে বস্তা বস্তা টাকা বাড়িতে পাঠায়।

মাকে বলি নি। একাই একদিন গ্রাম থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিলাম। হাঁটতে-হাঁটতে হাঁটতে-হাঁটতে কিভাবে কতদিনে একটা জাহাজঘাটের মতো জায়গায় যে পৌঁচেছিলাম মনে নেই। এইটুকু মনে আছে যে, রাত্তিরে ইলেকট্রিক আলোয় জায়গাটা ফুটফুটে হয়ে ছিল। তারপর এক ফাঁকে টুক ক'রে একটা জাহাজে উঠে পড়েছিলাম। কী একটা যেন বড় নদী। কী বড় বড় ঢেউ। আমার খুব ভয় করছিল, কিন্তু আমি কাঁদি নি।

তারপর কোথাও জাহাজ থেকে নেমে রেলগাড়িতে উঠেছিলাম। এসে নেমেছিলাম শেয়ালদায়। সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এর ওর বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কোনোরকমে তো এলাম। রাস্তায় পা দিয়েই ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। চারপাশে সব দোকানপাট, লোকের ভিড়, গাড়িঘোড়া। কোথায় যাব কিচ্ছু জানি না। বলতে গেলে, তখন তো আমি খুবই ছোট।

কত বড় ? এই এক্ক বড় হব। বয়স তো জানি না। তা ধ'রে নিন ছয় কি সাত। এখন কত বয়স ? তা তো জানি না। পুলিশের খাতায় লেখে সাতাশ। আপনার কী মনে হয় ? সাতাশ ? গাঁয়ের নাম জানি না। এইটুকু মনে আছে সুপুরীগাছ ছিল। বাবার নাম ? এখন তো জানি শেখ ইদ্রিস মোল্লা। পুলিশের খাতায় লেখা হয়।

তারপর যা বলছিলাম। আমি তো বড় রাস্তাটা ধ'রে সোজা হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন মৌলালির মোড়ে পৌঁচেছি, তখন কোথাও কিছু নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেললাম। ঠিক সেই সময় দাড়িঅলা লুঙ্গিপরা একজন লোক—

ঘড়ি দেখে চক্ষুস্থির। এত বেলা ? আবতুলকে কাল শেষ করব। বাদশা একবার এসে ডেকে গিয়েছে। যাই কাগজকলম নিয়ে ওর ঘরে।

বাদশার কথা

নিজের কথা বলতে ব'লে আপনি, কমরেড, আমাকে ভ্যাল। বিপদে ফেলে দিয়েছেন। কী করি বলুন তো ?

কাল রাত্তিরে ঘুম এল খুব দেরিতে। জেল গেটে কাল গাড়ির হর্ন দেওয়ার একটা শব্দ শুনেছিলেন ? অবিশ্যি অনেক রাত্তিরে। প্রথমে ভেবেছিলাম জেল ভিজিটারের গাড়ি। পরে দেখলাম এদিকে কোনো খুটখাট আওয়াজ হল না। কে জানে, কাল তো নতুন বইয়ের রিলিজ ছিল, জেলের বাবুরা হয়ত বই নিয়ে নাইট শো দেখে জেলের গাড়িতে ফিরেছিলেন। জানেন নাকি আজকাল বাইরে ভাল কী হিন্দী বই হচ্ছে ? ও তাও তো বটে, আপনারা তো হিন্দী বই দেখেন না।

কাল তারপর কী হল জানেন ? চোখ তো বুজলাম। ঠিক ঘুম নয়। একটা আচ্ছন্নের মতো ভাব। স্বপ্নে দেখলাম যেন শালিমারে

আমাদের সেই কারখানার ভেতর দিয়ে হাঁটছি। চারদিকে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্, ঘ্যাড়র ঘ্যাড়র ক'রে মেশিন চলার শব্দ। কাল রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে বোধহয় খুব নিচু দিয়ে প্লেন উড়েছিল। আমাদের কারখানায় সব সময় ঐ রকমের শব্দ। আপনি বোধহয় কখনও যান নি আমাদের কারখানায়? চলুন আপনাকে একদিন নিয়ে যাব। মানে, জেল থেকে বেরোবার পর।

আমাদের কারখানায় হয় জাহাজ মেরামতের কাজ। আমাদের কোম্পানির অবশ্য আরও অনেক কারবার আছে। রং তৈরি করে, আলকাতরা তৈরি করে। আবার নিজেদের জাহাজও আছে। কোম্পানির হরেক রকমের কাজ।

আমরা করি জাহাজ মেরামতের কাজ। শুধু নিজেদের নয়। সিলভার লাইন, ক্লক লাইন, সিটি লাইন, ব্যাঙ্ক লাইন, জাভা লাইন —এই রকম সব জাঁদরেল জাঁদরেল লাইনের বড় বড় জাহাজ মেরামতের কাজও আমরা পাই। কত কত সব দেশ থেকে কত কিসিমের সব মানুষ আসে। ডকে গেলে দেখতে পাই।

ডকে যখন জাহাজ আসে, প্রথমে যায় সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে জরিপ করতে। সঙ্গে থাকে ঘাট ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজের তলা থেকে শুরু ক'রে ইঞ্জিন, বয়লার ডেক, মাস্তুল, ট্যাঙ্ক, ডীপ ট্যাঙ্ক সব কিছু তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। যে যে পার্টস মেরামত করা দরকার, তার ওপর দাগ দেয়, জাহাজের নক্শাতেও সেইমতো চিহ্নিত করে। তারপর কেউ টেণ্ডার চায়, কেউ বা তাদের কাজ দেয় আগে থেকে যাদের ঠিকে দেওয়া থাকে।

আমাদের কারখানায় দু তরফে কাজ—আউটডোর আর ইনডোর। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে আউটডোরের ফোরম্যান তার দলবল নিয়ে যাবে জাহাজে। দাগানো জায়গায় পার্টসগুলো যদি সারিয়ে নিলে চলে তাহলে খুলবে, যদি ঝরঝরে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কেটে বাদ দেবে। ইনডোরে সেই জিনিস, হয় সারিয়ে নয় নতুন তৈরি ক'রে,

আবার যাবে আউটডোরে। আউটডোরের মিস্ত্রি কারিগররা করবে ফিটিঙের কাজ।

এ কাজের অনেক ভজোকটো। প্রথম থেকে শেষ অবধি অনেক হাতে নানা স্তরে কাজ হবে। প্রথমেই তো নক্‌শা। তারপর নক্‌শাঘর থেকে আসবে কারখানায়। যদি ঢালাই করতে হয়, মানে চীনা লোহার জিনিস যদি তৈয়ের করতে হয়, তাহলে সেই নক্‌শা যাবে ফরমা ঘরে, মানে প্যাটার্ন শপে। নক্‌শা দেখে তারা মাপমতো তৈরি করবে কাঠের মডেল। তারপর সেই কাঠের মডেলটা যাবে ঢালাই ঘরে।

ঢালাই ঘরের মিস্ত্রিরা এবার সেই ফরমা নিয়ে মাটিতে গর্ত খুলে সেই ফরমা পুঁততে থাকবে। তার জন্যে লাগে কাদা, গোবর, বালি। সকাল থেকে ঢালাই ঘরে সারাদিন এইভাবে কাজ চলতে থাকবে।

আপনি কখনও কোনো ঢালাই ঘরে গেছেন? ঢালাইওলারা যেভাবে কাদা, মাটি, গোবর নিয়ে ছানে, তাতে আপনার মনে হবে ওরা যেন দল বেঁধে পুতুল গড়ছে। সারা দিন গর্ত খুলে খুলে ফরমা বসানোর কাজটাকে বলা হয় ছাঁচ মারা। তিনটে চারটে অবধি এই ছাঁচ মারার কাজ চলে।

তিনটের সময় ফার্নেসে আগুন দিয়ে তাতে ফেলা হয় চীনা লোহার বাট। চারটে নাগাদ ফার্নেসে লোহা একদম গলে যায়। তখন ফার্নেস থেকে মাল নিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়।

আমাদের কারখানায় এখনও কী কায়দায় মাল বওয়া আর ঢালা হয় শুনুন।

ফার্নেসের সামনে আছে এক-দেড় মানুষ সমান বিরাট গর্ত। কাজ না হলে গর্তের মুখে বড় তক্তা ফেলা থাকে। ফার্নেস থেকে মাল ঢালবার সময় তক্তাটা সরিয়ে দেওয়া হয়।

দেড়-দু ইঞ্চি পুরু খুব মোটা লোহার একটা বালতি তার দুদিকে দুটো লম্বা লোহার রড। এই বালতিটাকে বলা হয় 'ডাবু'। একজন কারিগর আর তার বয়—দুদিক থেকে দুজন রড দুটো ধ'রে ডাবুটা

ফার্নেসের মুখের কাছে ধরে। ডাবু ভরে গেলে তখন সেই গলা লোহা তারা ছাঁচের মধ্যে ঢালে। এইভাবে চলতে থাকে একেকবার ডাবুতে মাল ভরা আর একেকটা ছাঁচে মাল ঢালা। সব ছাঁচে মাল ঢালা হয়ে গেলে, ব্যস—সেদিনকার মতো কাজ শেষ।

ফার্নেস থেকে মাল নেওয়া আর ছাঁচে মাল ঢালা—দুটো কাজই করতে হয় সাক্ষাৎ যমের মুখে দাঁড়িয়ে। একটু পা হড়কালে কিংবা একটু হাত ফস্‌কালে নিশ্চিত মৃত্যু। একেকটা ফার্নেসে রোজ এক থেকে দেড় টন মাল গলানো হয়। বুঝে দেখুন তাহলে কী ব্যাপার।

ডাবুতে মাল ভরার পদ্ধতিও থেকে গেছে সেই মান্ধাতার আমলের। ফার্নেসের মুখ বরাবর দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন কারিগর। একজনের হাতে শাবল, আরেক জনের হাতে বাঁশ। ফার্নেসের মুখ তখন বন্ধ। একতাল কাদা শুকিয়ে গিয়ে ফার্নেসের মুখ আটকে রেখেছে। শাবল মেরে ফার্নেসের মুখের সেই শুকনো মাটি যেই না ভেঙে দেওয়া, অমনি গলা লোহা সেই খোলা মুখ দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে এসে ডাবুর মধ্যে পড়তে থাকবে। ডাবু ভ'রে যাওয়ার মতো হলে তখন আসবে ফার্নেসের মুখ বুঁজিয়ে দেওয়ার পালা। বাঁশওয়ালা তখন তাড়াতাড়ি বাঁশের আগায় এক তাল কাদা দিয়ে ফার্নেসের মুখের মধ্যে পুরে দেবে। যাতে ফার্নেসের মুখ জ্যাম হয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মাল পড়া বন্ধ হয়।

কোনো ডাবুতে এক হন্দর, কোনোটাতে এক টন অবধি মাল ধরে। এক টন ওজনের মালভর্তি ডাবু ক্রেনে ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রেনে ক'রে ধ'রে মাল ঢালা—তাতেও হুজ্জতি অনেক। একটু বেসামাল হলে হয় অতখানি মাল পড়ে পয়মাল হবে, নয় লোকের জান চলে যাবে।

আমাদের কারখানাতেই একবার এক টনের ডাবু থেকে মাল ঢালাইয়ের সময় মালভর্তি ডাবুতে একজন লোক পড়ে যায়। ডাবুতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার শুধু হিসিয়ে উঠল নীল আলোর একটা শিস্‌। ব্যস্‌। তারপর তার আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না।

আপনি যদি আমাদের কারখানায় যান তো দেখবেন ঢালাই-ওলাদের সারা গায়ে পোড়ার দাগ। সব সময় কারো না কারো শরীরের কোথাও না কোথাও দগদগ করছে ঘা।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আজ মাল ঢালা হয়ে গেল তো, তারপর কাল চিপারম্যানেরা এসে ছাঁচ থেকে মাল তুলে বালি পরিষ্কার ক'রে আবার অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেবে। যদি বিঁধ করতে হয় তো যাবে ড্রিল মেশিনে, প্লেন করতে হলে যাবে প্লেন মেশিনে কিংবা লেদ্‌ঘরে।

কাল স্বপ্নে দেখলাম, বিশ্বাস করবেন না, আমার হাতে আমার সেই ওয়েল্ডিং মেশিন। আমার বলতে কোম্পানির। ব্যাঙ্ক লাইনের একটা জাহাজ। ড্রাই ডকে কাজ হচ্ছে। আমাকে হাবিস ক'রে ওপরে তুলেছে। একটা তক্তার ওপর ব'সে দাগ বরাবর কাটিং করছি। আমার চোখে আই-গার্ড। হঠাৎ ভারাটা ছিঁড়ে আমি উল্টে পড়লাম। ওয়েল্ডিংয়ের যন্ত্রটা তখনও আমার হাতে। হঠাৎ সেই যন্ত্রটা একটা প্যারাস্যুটের ছাতা হয়ে খুলে গেল। আর আমি সেই প্যারাস্যুটটা ধ'রে উড়তে উড়তে চলেছি। নিচে দেখছি আমাদের কারখানা। যতই নামবার চেষ্টা করছি পারছি না। হারানদা, সেলিম, ক্যানারাম —ওরা সব আমাকে হাত নেড়ে নেড়ে নামতে বলছে। আমি পারছি না। হঠাৎ দেখি কি, ক্রেনে ক'রে এক টনের মালভর্তি একটা ডাবু আমার দিকে ছুটে আসছে। আর ক্রেনের কেবিনে ব'সে হাসছে আমাদের জেলসুপার আর ব্যারিস্টার সায়েব। ওদের মারবার জন্যে আমার টিফিনের কৌটোটা যেই না ছুঁড়েছি অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল।

উঠে ঢক ঢক ক'রে একপেট জল খেয়ে নিলাম। আজ কমরেড, মনটা একেবারেই ভাল লাগছে না। ওয়েল্ডিং যন্ত্রটার জন্যে এখনও আমার মন কেমন করে।

আধকপালে হয়ে আছে। আগে আবহুলের গল্পটা শেষ ক'রে নিই।

মৌলালির মোড়ে দাঁড়িয়ে ও যখন ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, দাড়িওয়ালা লুঙ্গিপরা সেই লোকটা এসে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল—খোকা, তোমার ক্ষিধে পেয়েছে? চলো, খাবে চলো। ব'লে ওকে দোকানে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল! তারপর হুজনে গেল লোকটার ডেরায়। মহম্মদ আলী পার্কের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা নাখোদা মসজিদের গায়ে এসে মিশেছে, সেই রাস্তা থেকে বার হওয়া একটা ছোট্ট গলিতে। তারপরই হল তার আবহুল নাম। সেই লোকটাই আবহুলকে মানুষ করল। পকেট মারতে শেখাল। তাকে আবহুল ভয় করত, ভালও বাসত।

আবহুল আমাকে দেখাত কিভাবে পকেট মারতে হয়। ম্যাজিকের হাত সাফাইয়ের মতো। পুরোটাই হল চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপার। নজরটাকে সরিয়ে দেওয়া। এ কাজে লোক চিনতে হয়। কার আছে কার নেই, চোখমুখের ভাবেই বোঝা যায়। মানুষকে অন্যমনস্ক করার হাজার গণ্ডা উপায় আছে। ধরুন, একজনের গলার নলী বরাবর বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়ে আপনি দিব্যি বাসের রড ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার ডান হাতটা সেই ফাঁকে লোকটার বুকপকেট ফাঁক করছে। এখন তো আরও সুবিধে। ট্রামে বাসে যা ভিড়। পয়সা বার করতে গিয়ে বিশিষ্ট ভদ্দরলোকদের হাতও পরের পকেটে ঢুকে যায়। আর সুবিধে হয় কোনো লেডিজ যখন ওঠে। প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই তখন বেসামাল হয়ে পড়েন। আমাদেরও সেই মওকা।

আমি জিগ্যেস করি, 'আচ্ছা আবহুল, তোমার মাকে মনে পড়ে?' আমি আশা করি, আবহুলের চোখ একটু ছলছল ক'রে উঠবে।

আবদুল ভাববারও একটু সময় নেয় না। ড্যাশ নয়, কমা নয়—সোজাসুজি দাঁড়ি টানার মতো ক'রে বলে, 'না'।

যাবার দিন আবদুল একটা মজার কথা ব'লে গেল। বলল, 'ভুখ হরতালের ওপর আপনি যে গানটা বেঁধেছিলেন সেটা আমি সাত নম্বরের মাস্টার মশাইকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। আমি বাইরে গিয়েই ওটা ছাপিয়ে ফেলব। লোকজনদের দেব। আরেকটা কথা, দাদাবাবু, আপনাকে বলছি। আপনি যখন বাইরে যাবেন, কাজকর্ম করতে গেলে তো টাকার দরকার হবে—আপনি শুধু আমাকে একটা খবর দেবেন। কিন্তু কী ক'রে খবর দেবেন? পুরনো ডেরাটা এবার আসবার ঠিক আগে আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এবার আমি নিজের আলাদা দল করব। ও লোকটা ভারি বেইমান। আমার একটা মেয়েছেলে ছিল সেটাকে ফুস্‌লে নিয়েছে। এ লাইনে বিচ্ছিরি সব ব্যাপার আছে। সেসব আপনাদের শোনবার মতো নয়।' ঘাড়টা নিচু ক'রে আবদুল পায়ের নখ খুঁটে নিল।

তারপরই মুখটা হাসি-হাসি ক'রে বলল, 'বাইরে গেলে আবদুলকে আপনি চিনতেই পারবেন না। বাসে যাচ্ছেন। আপনার ঠিক পাশেই একজন দাঁড়িয়ে। কোটপ্যাণ্ট টাই প'রে এক ভদ্রলোক। এক হাতে 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজ। চোখে চশমা। আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি। কিন্তু আমি এমন সাজপোশাক প'রে বেড়াব যে, আপনি আমাকে দেখলেও চিনতে পারবেন না। আপনি একটা কাজ করবেন, দাদাবাবু। আমার এরিয়া হল শেয়ালদা। আমার লোকজনেরা সব সময় ইস্টিশানের মধ্যে কিংবা আশপাশেই থাকে। একজনকে ডেকে শুধু ব'লে দেবেন আপনি আবদুল মাস্টারকে চান। ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আপনার আবদুল হুজুরে হাজির। দাদাবাবু, বাইরে গিয়ে আমাকে যেন ভুলে যাবেন না।'

জেলের আবদুলদের নিয়ে এই এক মুশকিল। আগের জেলে

ছিল একজন জেলারের বাসায় কিংবা সে ছিল ওয়াগন-চোর। সে বলেছিল আবদুল তা গ্রামোফোম নয়। ঐ জেলে তার নাম আবদুল। খাস কলকাতায় ধরা পড়লে আবদুল, আবার বজবজ মেটেবুরুজে ধরা পড়লে তার নাম হয়ে যায় ফুলচাঁদ। সেই আবদুলের বয়স ছিল এই আবদুলের চেয়ে কম। সেই আবদুলও ছিল আমার খুব ন্যাওটা। একবার সে হঠাৎ ডুব মারল। খবর দিই আসে না। খবর দিই আসে না। অথচ আমি তখন রোজ ব'সে ওকে রাজনীতির জ্ঞান দিচ্ছিলাম। সমাজতন্ত্র কী জিনিস। শ্রেণী সংগ্রাম মানে কী। ও বেশ মন দিয়ে শুনত। বলত এবার ফিরে গিয়ে ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দিয়ে পার্টিতে নাম লেখাবে। ওর শুধু একটা শর্ত। রেল কোম্পানিতে সিগন্যাল ঘরে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে হবে। আমার তখন খুব ছাত্র দরকার। বোঝাতে পারছি কিনা সেটা দিয়ে আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে আমি বুঝছি কিনা। ওর জন্যে কাজের চেষ্টা করব ব'লে আশাও দিয়েছিলাম। তবে ঠিক যে সিগন্যাল ঘরেই তার কাজ হবে, তেমন কোনো ভরসা দিতে পারি নি। একদিন হাসপাতালে একজন কমরেডকে দেখে ফেরবার সময় দেখি আমগাছের তলায় জুয়োখেলার দলের একজনের সঙ্গে আবদুল দাঁড়িয়ে। আবদুলই কথা বলছিল। আমি একটু এগিয়ে গেলাম। ইঁদুর-পচা একটা বিশ্রী গন্ধ। যত এগোই গন্ধটা ততই নাকে এসে লাগছে। হঠাৎ আমাকে দেখে মনে হল ও যেন ভূত দেখেছে। কথা থামিয়ে দিল। গন্ধটা একটু কমল। আমি আবদুলকে কাছে আসতে বললাম। ও এল না। একটা হাত মুখের সামনে ধ'রে অন্য হাতটা নেড়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল—ও ব্যস্ত, এখন নয়। আমি ওকে ইশারা ক'রে কাছে আসতে বললাম। ও এবার আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল—পরে দেখা করব। আর সেই সময় ভক্ ক'রে আমার নাকে এসে লাগল ইঁদুর-পচা একটা বিশ্রী অসহ্য গন্ধ।

এক মুহূর্তে আমার কাছে সবঁ জল হয়ে গেল। আবদুল ওর

লাইনে আরও উঠবার চেষ্টা কসময় নেয় না। ড্যাশ নয়ছে। গল্পটা কাঁচা অবস্থাতেই থাকে। পরে গলার ঝুলে, 'না'। লে যখন তৈরি হয়ে যাবে তখন আর বাইরে থেকে ধরাই যাবে না। গলায় থলি থাকলে তার দাম আছে। টাকা পয়সা সোনাদানা রাখা যায়। হাজার গা-তল্লাসি করুক ধরতে পারবে না। এমন কি কেউ ঠেকায় পড়লে তাকে গুদামঘরের মতো চড়া দামে থলিটাকে ভাড়াও দেওয়া যায়।

মাঝের থেকে এই হল যে, গলায় থলি তৈরি করতে গিয়ে আবদুল আমাকে চটিয়ে ওর সাধের চাকরিটা খোয়াল। এখন মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এত কাজ থাকতে সিগন্যাল ঘরের চাকরির জন্যে ও কেন অত ঝুঁকেছিল?

আর এই আবদুল—আচ্ছা, সত্যিই কি এর নাম আবদুল? না এটা ওর জেলের নাম? ওর ছেলেবেলার গল্পটাও কি তাহলে পুরোটাই বানানো?

এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, খাঁটি সত্যি ব'লে জীবনে কিছু নেই। প্রকৃতির কথা বলছি না। আমি বলছি মানুষের জীবনের কথা। দড়িকে সাপ ব'লে আমি ভুল করছি। ভুল ক'রে আমি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যতক্ষণ সত্যি, ততক্ষণ সাপটাই বা সত্যি হবে না কেন? শুধু নিজের কাছে নয়, পরের কাছেও? যে ওটাকে দড়ি হিসেবেই দেখছে, সে কেন এটাও ভাববে না যে, দড়িটাকে সাপ ব'লেও ধ'রে নেওয়া যায়? সত্যি আর মিথ্যের সম্পর্কটা বোধহয় শুধু ঠোকাঠুকিরই নয়, দুটোর মধ্যে একটা ঠেকাঠেকি হওয়ার সম্পর্কও থেকে যায়।

আজ একটা কাণ্ডই হল।

সকালে তেল মালিশের পর কাঁপড় কেচে স্নান ক'রে ওপরে যখন

উঠে এলাম, জেলারের বাসায় কিংবা রাস্তার দিকে [illegible] কোনো একটা রেডিও কিংবা গ্রামোফোনে সেই গানটা বাজছিল—রোদনভরা এ বসন্ত, সখি, কখনও আসে নি আগে।

বিচ্ছিরি মন খারাপ করা গান। এ গান বাজানোর পেছনে নিশ্চয় কোনো ষড়যন্ত্র আছে। যাতে আমাদের মন আনচান করে। যাতে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। বাঁচবার জন্যে হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙি।

গান না শুনতে গেলে দুটো কানে আঙুল দিয়ে ব'সে থাকতে হয়। এখন তো দিনের বেলা। বারান্দায় কমরেডরা রয়েছে। কানে আঙুল দিয়ে ব'সে থাকতে দেখলে আমাকে পাগল ভাববে। জানলা তো নেই যে, জানলা বন্ধ করব! এটা তো সেল। দরজায় শুধু গরাদ। আর ছাদের কাছে একটা হাঁ-করা ঘুলঘুলি।

মনে আছে, একবার ভুল করার পর যখন নির্ভুলভাবে বুঝে গেলাম যে, রবিঠাকুর বুর্জোয়া—তাঁর লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শ্রেণীসংগ্রাম করতে হবে, তখন ন' নম্বরের বিষ্টুবাবুকে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'আচ্ছা, তার মানে রবিঠাকুরের গানগুলোও তো গাওয়া চলবে না?' ভদ্রলোক মার্ক্সবাদের তত্ত্ব ভাল বোঝেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। জেল কমিটির সদস্য। কিন্তু খেঁকী কমিউনিস্ট নন।

আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন? না গাইলে খুব কষ্ট হবে?'

আমার ঠিক উল্টো। বরং গাইলেই বেশি কষ্ট হয়। শুনলে আরও। বিশেষ ক'রে, যদি সেইসব গান হয় যা ছেলেবেলায় শুনেছি। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে। কেন যে কান্না পায়, কিসের যে এত স্মৃতি তাও ঠিক বুঝি না। শুধু মন খারাপ হয়। কিচ্ছু করতে ইচ্ছে করে না। একা একা কোথাও গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে।

সব চেয়ে বড় কথা, জেলখানায় থাকতে ইচ্ছে করে না।

কমরেডদের বলা যাবে না সে কথা। জেলের চেয়ে জেলের বাইরেটা যে হাজার গুণ ভাল, এ কথা বলা যাবে না।

ব্যাপারটা শুধু ঐ গান শুনে মন খারাপ হওয়ার মধ্যেই ঠেকে থাকে নি। তার চেয়েও ঢের বিশ্রী একটা চিন্তার মধ্যে যেন পা পিছলে পড়ে গেলাম—এইভাবে জেলে পচে মরার কী মানে হয়? আমি যদি হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই, তাহলেই যে লড়াই ভেস্তে যাবে তা তো নয়। বলাইদা আছে, বাদশা আছে—ওরা ঠিক শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে পার্টিকে বলব আমি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যেতে চাই। যদি বলে ব্যারিকেড ক'রে লড়াই করো, তাও করব। আমি শুধু চাই এই দম-আটকানো জেলখানা থেকে বেরোতে, না খেয়ে তিলে তিলে মরবার হাত থেকে বাঁচতে।

কী? হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভেঙে বাইরে গেলে পার্টি বুঝি আমাকে তাড়িয়ে দেবে? দিক না তাড়িয়ে। কমরেডরা বিশ্বাসঘাতক বলবে? বলুক না। আমি কোনো গ্রামে চলে যাব, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। গ্রামে গিয়ে মাস্টারি নেব। চাষীদের মধ্যে কাজ করব। সমিতি গড়ে তুলব। তখন পার্টি বুঝবে, আমাকে ছাড়লেও আমি পার্টিকে ছাড়ি নি।

আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল শুধু একজন। আমার দাদু। অথচ আমি জানি, দাদু এখন দিবারাত্তির ভগবানকে ডাকছে। বলছে—ঠাকুর, তুমি আমার অরুকে গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছ, এবার ভালোয় ভালোয় হাঙ্গার-স্ট্রাইকটাও যেন ও পার হতে পারে।

পার হতে পারে? তার মানে, মাঝরাস্তায় যেন ডুবে না যায়? ডুবে যাওয়া মানে হাঙ্গার-স্ট্রাইক ছেড়ে দেওয়া?

কিন্তু আমি যদি গিয়ে বলি—না দাদু, আমি ডুবি নি। হাঙ্গার-স্ট্রাইক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। দাদু হাসবে। বলবে, রাখ রাখ। তোদের হাঙ্গার-স্ট্রাইক তাহলে আজকেই মিটল? তোদের সবাইকেই ছেড়ে দিল? জামাল সাহেব, বংশী—সবাইকেই?

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দাদুর মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল

কেন? মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে বললেন—এসে ভাল করেছিস। এই শরীরে এখন আর বাইরে বেরোস নে। তাছাড়া—

তাছাড়া! তাছাড়া কী? আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, দাছ কি তাতে খুশি নন? লোকলজ্জার কথা ভাবছেন? নিজেকে কেন আমি বাঁচালাম? দাছুর জন্যেই তো—

হঠাৎ আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এ সব পাপচিন্তা কেন আমার মনে এল? এখন তো রাত্তিরও নয়। বাইরে কটকটে রোদ।

ক্যাপিটালের পাতা সামনে খোলা। তন্দ্রায় চোখটা একটু বুঁজে গিয়েছিল। দিনেছুপুরে এই ছঃস্বপ্ন দেখলাম কেন? আমার খুব ভয় হল। কমরেডরা কেউ দেখে ফেলে নি তো?

ভীষণ রাগ হল নিজের ওপর। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্যে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারলাম। কাঁচের গেলাসটা ঝনঝন ক'রে উঠল।

পাশের ঘর থেকে গৌরহরি সানা সেলের দরজার কাছে ছুটে এল। 'কী হল, কমরেড?'

'একটা মশা।'

'আমি ভাবলাম বোধহয় মাথাটাথা ঘুরে গেল।'

না। আমার ভাবনাটা কেউ দেখতে পায় নি। এটা একটা ভাল, কারো ভাবনা কেউ দেখতে পায় না।

বাদ্‌শার ঘরে গেলাম। বাদ্‌শা শুয়ে শুয়ে পুরনো ব্লেড দিয়ে নখ কাটছিল। আমাকে দেখে উঠে বসল। বলল, 'শুনেছেন? আমাদের দোতলায় কাটোয়ার যে নেত্যকালী, তার কথা শুনেছেন? কাল রাত্তিরে সেপাই ডেকে—বাদ্‌শা একটু থেমে চোখটা মটকে বলল,—কাটোয়া।'

তারপর যেন কিছুই হয় নি এইরকম ভাব ক'রে বলল, 'কিন্তু শালা যাবে কোথায়? ক্ষেতমজুর না? আবার এই আট নম্বরেই

ফিরতে হবে। এবার এলে কঁ্যাত কঁ্যাত ক'রে লাথি মারব। বলব—দে, নাকে খং দে। কিন্তু সে আপনি যাই বলুন, এই না খেয়ে থাকা—এ আবার কী? আপনারা পারেন। আপনাদের পেটের খোল ছোট। কষ্ট আমাদের। মাঝে মাঝে মনে হয় ধ্যুৎ! কী দরকার এসব করার। তার চেয়ে সব ভেঙে ভেস্তে দিয়ে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাই। ফিরে গেলে আমাকে তাহলে আস্ত রাখবে ভেবেছেন?

পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবে না? শালাদের মাথায় তুলতেও যতক্ষণ পায়ে ফেলতেও ততক্ষণ। চলুক। দেখা যাক কোথায় এর শেষ। আমি বলি, পড়েছি পার্টির হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। এখন তো পেটে কিল মেরে ব'সে থাকি, খাবার হলে সবাই একসঙ্গে খাব। না কী বলেন?'

বাদ্‌শার সঙ্গে আমার এইখানেই তফাত। ও নিজেকে ভয় করে না। তাই ভয়ের কথা নির্ভয়ে বলে।

আমি তো তারপর ঘরে ফিরে মনটাকে ক্যাপিটালে বসাবার চেষ্টা করছি ··

কলওয়ালা কিনছে খাটুনিওয়ালার খাটবার ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করছে লোকটাকে কাজে লাগিয়ে। হবু-শ্রমিক হাতে-কলমে কাজ ক'রে শ্রমিক হচ্ছে। তার খাটুনিটা এমন একটা জিনিসের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে লোকের কাছে যে জিনিসটার একটা ব্যবহার-মূল্য আছে। কার কথামতো বা কার মতলবমতো হচ্ছে, সে সবে উৎপাদনের এই মোটামুটি চেহারাটা বদলাচ্ছে না।

মানুষ আর প্রকৃতি, এই দুই শরিকে মিলে হয় খাটুনির ব্যাপারটা। মানুষ প্রকৃতিরই একজন হয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়; তার হাত পা মাথা—এ সমস্তই প্রকৃতিদত্ত—সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির জিনিসগুলোকে এমন ক'রে সে বাগিয়ে নেয় যাতে তার নিজের অভাব মেটে। বহিঃপ্রকৃতিতে হাত লাগিয়ে, তাকে বদ্‌লে সেইসঙ্গে মানুষ

নিজের স্বভাবেও বদল আনে। নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষ তাকে মুঠোয় আনে।

মাকড়সাও জাল বোনে, মৌমাছিও বাসা বানায়। কিন্তু মানুষ যেটা করে সেটা আগে থেকেই তার মাথায় থাকে। তার হাতে প'ড়ে উপাদানগুলো শুধু যে একটা গড়ন পায় তাই নয়, তার নিজের মতলব হাসিল হয়। তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যেভাবে যা করবার সে তাই করে। তার জন্যে তাকে মনেপ্রাণে হতে হয়। আর এই মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারটা ক্ষণস্থায়ী হলে চলে না। কাজের সময় হাত পা তো তাকে চালাতেই হবে ; কিন্তু শুধু তাতে হয় না। যতক্ষণ কাজ হবে ততক্ষণ তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছেটাকে সমানভাবে ঠায় জুড়ে রাখতে হবে। তার মানে, রীতিমতো তন্ময়তা চাই। কাজের প্রকৃতি কিংবা কাজের ধরন মনকে যত কম টানবে খোশমেজাজে হাত পা চালাতে বা বুদ্ধি খাটাতে তত কম ইচ্ছে হবে—ততই জোর ক'রে কাজে মন বসাতে হবে।

এই যে এতক্ষণ পড়লাম, কই মাথা-টিপটিপ বুক-ঢিবঢিব কিছুই তো নেই। তখন ঘুষিটা না মারলেই হত। হাতটা টনটন করছে। একপক্ষে ওটা ভালই হয়েছে। এ ভদ্দরলোকের একটু শিক্ষা হওয়াই ভাল। ভদ্দরলোক! ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন। 'ধ'রে ভদ্দর' ব'লে একটা কথা আছে না? এ হল তাই।

না, ঠিক তাই নয়। আসলে এও এক লড়াই। নিজের সঙ্গে। হারবার জন্যে লড়াই নয় ; জেতবার জন্যে লড়াই।

মার্ক্সের ওটাই ঠিক কথা। কাজটা কেমন, তারই ওপর মন লাগার ব্যাপারটা নির্ভর করে। বেশি জোরজার করতে গেলেই মন ভাঙে।

সেইসঙ্গে আমার আরও একটা মনের ভার হালকা হয়ে আসছে। আমি অবশ্য গল্পকবিতা লিখি না। কারণ, চেষ্টা ক'রে দেখেছি একমাত্র রিপোর্টাজ ছাড়া আর কিছুই আমার ঠিক উৎরোয় না।

রিপোর্টাজ ব্যাপারটায় মধ্যে লোকের কৌতূহল মেটানোর মালমশলাই বেশি থাকে। যারা গ্রাম দেখে নি, তাদের কাছে করো চাষীর গল্প। যারা গাঁ ছেড়ে বেরোয় নি, তাদের কাছে বলো শহরবাজারের গল্প। সব উবু হয়ে ব'সে কান পেতে শুনবে। ও কায়দা আমার জানা আছে। পোস্টার হল পোস্টার। রিপোর্টাজ হল রিপোর্টাজ।

কিন্তু গল্পকবিতা ছবিগান তো তা নয়। ঢের ভেতরের জিনিস। দেখলাম আর লিখলাম। পড়ল আর লুফে নিল। এভাবে হয় না। শিল্প সাহিত্য হরির লুট নয়।

ছ'নম্বরে আছেন বরুণবাবু। যত না বয়স হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি ভারিক্কি ভাব নিয়ে চলেন। গায়ে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে তালতলার চটি আর কোঁচাটা তুলে কোমরে গোঁজা। নিজেকে সেকেলে সাজিয়ে মনে মনে, আমার সন্দেহ হয়, উনি মজা পান।

বরুণবাবু অবশ্য পার্টি-মেম্বার নন। কিন্তু ভেতরে বাইরে বরাবর সব লড়াইতেই পার্টির সঙ্গে আছেন। উনি আবার প্রায়ই ছেলে-ছোকরাদের চটিয়ে দেবার জন্যে খোঁচা দিয়ে বলেন—তোমাদের সঙ্গে লড়ার ব্যাপারে আছি, পড়ার ব্যাপারে নেই। ওঁর কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। সোজা ব'লে দেন—সমাজের ব্যাপারে মার্ক্সবাদ ঠিক আছে, সাহিত্যে অচল। সাহিত্য হল সাহিত্য, তার আবার উদ্দেশ্য কী?

বরুণবাবুর মতের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আবার যারা তাঁর সামনে আঙুল নেড়ে বলে, সাহিত্য মানেই উদ্দেশ্য প্রচার—তাদের সঙ্গেও ঠিক সায় দিতে পারি না। অ্যাও নয় অও নয়, তাহলে কী?

এতদিন পর আজকে এই প্রথম মনে হচ্ছে, একটু একটু আলো দেখছি।

যাকে সৃষ্টি বলি সেও তো একটা কাজ। যা নেই তাকে হওয়ানো। এই তো? কিন্তু কেন? না, আমরা কাজ ক'রে অভাব মেটাই। অভাব মেটানোটা উদ্দেশ্য। পেটের ক্ষিধে মেটে কাজে, মনের ক্ষিধে মেটে সৃষ্টিতে।

হাঙ্গার-স্ট্রাইকটা মিটুক, তারপর একদিন বরুণবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। উদ্দেশ্য বলতেই উনি যে একটা ঘাড়ে জোয়াল দেওয়ার ভাব মনে আনেন, সেটা ঠিক নয়। কিন্তু একটা কিছু তো গড়ে উঠবে? বরুণবাবুর প্রেরণা কথাটায় আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুদ্দেশ প্রেরণা তো হয় না!

বরুণবাবু হারলেই যে আমাদের জিৎ হয়, তাও আমি মনে করি না। উদ্দেশ্যটা হল সংকল্প। সম্ভাবনা। তাকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত আয়োজন চাই। শুধু বীজ নয়, তার জমি চাই। ছাড়া-ছাড়া ভাব হলে চলবে না। আগাগোড়া টেনে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে জাহির করতে চাইলে উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে। এ শুধু কলকাঠি নাড়ার ব্যাপার নয়। সৃষ্টির মধ্যে চাই প্রাণ। চাই আনন্দ।

হঠাৎ সিঁড়িতে একটা দুম দুম আওয়াজ। সেই সঙ্গে বালতির ঠনঠন। জুতোর আওয়াজে মনে হচ্ছে একদল সেপাই। তার মানে, ফোর্স ফিডিং করাতে আসছে নাকি?

দেখা যাক।

পায়ের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে তিন তলাতেই আগে আসছে। জুতো মচ মচ করতে করতে বারান্দা দিয়ে ডানদিকের শেষ প্রান্তে চলে গেল। আমার সেলে পৌঁছুতে এখনও ঢের দেরি। হালচাল দেখে মনে হচ্ছে এবারের মামলা সহজে মিটছে না।

ইস্, বেচারা নেত্যকালী! কাটোয়া না হয়ে হওয়া উচিত ছিল 'কাল না'।

আমার কথা মঙ্গলবার

অন্য দিন হলে কী হত জানি না, কিন্তু কাল নিজের ওপর রেগে ছিলাম ব'লেই বোধহয় রোগা শরীরেও ষণ্ডাগুণ্ডা সেপাইগুলোকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছিলাম। ওরা যখন এল আমি তখন সেলের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বারান্দার লোহার জালে আঙুল গলিয়ে দিয়ে

আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিলাম। সাদা অ্যাপ্রন প'রে ডাক্তারবাবু ছিলেন সকলের আগে। আমাকে ঘরে যেতে অনুরোধ করলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। ন'নম্বর ওয়ার্ডের মাথায় সেই চারাগাছটা প্রাণপণে কার্নিশ আঁকড়ে ধ'রে রয়েছে।

লোহার জাল থেকে আমাকে ছিঁড়ে নেওয়া ওদের পক্ষে সহজ হয় নি। আমি তো ঠিক ওদের সঙ্গে লড়ি নি, লড়েছিলাম নিজের সঙ্গে। একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়ে। মনের জোরে পেরেছিলাম। হেরে গেলাম গায়ের জোরে।

বিছানায় ঠেসে ধ'রে নাকের ভেতর দিয়ে যখন নল চালিয়ে দিল তখন আর করবার কিছু থাকল না।

শুনেছি নাক দিয়ে ওরা যেটা খাওয়ায়, তাতে দুধের সঙ্গে নাকি ডিম থাকে। আর তাতে নাকি ব্র্যাণ্ডিও থাকে। চোখ বন্ধ করে ছিলাম। একটা ফিডিং কাপে ক'রে ফানেলে দুধ ঢালবার শব্দ। তখনও মন একেবারে ফাঁকা। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ক্লান্ত। হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার ঘটছে ব'লে মনে হল। একটা নির্জন খাঁ খাঁ করা জায়গা হঠাৎ যেন জনকণ্ঠে প্রাণের সাড়া পেয়ে সরগরম হয়ে উঠছে। আর জিভ বঞ্চিত হলেও সারা শরীর তারিয়ে তারিয়ে তাই আস্বাদন করছে।

তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এক ঘুমে সন্ধ্যে।

যে ক্ষিধেটা চলে গিয়েছিল একটু একটু ক'রে যেন আবার সেটা ফিরে আসছে। শরীরের মধ্যে যেটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম, এক কাপ দুধ দিয়ে ওরা খুঁচিয়ে আবার সেটাকে জাগিয়ে দিয়েছে।

সবাই আজ যে যার সেলে। শরীরের ওপর দিয়ে বেশ ধকল গেছে। তার ওপর আমার হাতের সেই ঘুষি মারার ব্যথাটা এখনও যায় নি।

অন্যান্য ওয়ার্ডে কী হচ্ছে এখনও আমরা ভাল জানি না। তবে এটা পাকাপাকিভাবে জানা গেছে যে, দু তিন জন ছাড়া সারা জেলে অনশন বিশেষ কেউ ভাঙে নি।

দুপুরের পর থেকে আজ একটু বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। এটা বোধ হয়, শরীরের বাইরের তাপের সঙ্গে শরীরের ভেতরের তাপে একটু গরমিল হয়েছে ব'লে।

সন্ধ্যেবেলা ব'সে ব'সে একটা কথা ভাবছিলাম। শহীদদের কত তাড়াতাড়ি যে আমরা ভুলে যাই।

তখন আমাদের ছিল আরেকটা হাঙ্গার-স্ট্রাইক। জেলের বন্দীদের সমর্থনে রাস্তায় মিছিল বার করেছিল মেয়েরা। গুলি চলেছিল। আমরা কিছুই জানতাম না। পরে যখন কাগজে দেখলাম, অনেকক্ষণ গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরোয় নি।

আমি তাদের সবাইকেই চিনতাম। মুখগুলো মনে করবার চেষ্টা করছি। নীল হয়ে যাওয়া পুরনো ফটোর মতো স্মৃতিগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে।

সন্ধ্যের পর কাল কিছুক্ষণের জন্যে 'কারখানা' খোলা হয়েছিল। কিন্তু কাঁচা মালের ঘাটতি পড়ায় কোনো কাজ হয় নি।

বাদশার কথা

আমার ছেলেবেলার কথাটা বলি।

পাড়ায় আমরা ছিলাম সবচেয়ে গরিব। আমাদের ধ'রে পাড়ায় মজুর বলতে মাত্র দুঘর। পাড়ায় আর যারা ছিল তাদের ধোপার কারবার। তাদের ছিল কাঁচা পয়সা।

পাড়ায় কার কেমন অবস্থা সেটা বোঝা যেত পাড়ায় ফেরিওয়ালা এলে। দিনভর দফে দফে আসত লজেন্সস, হাওয়ার মেঠাই, বুড়ির চুল, ঝালচানা, সিদ্ধির বরফ, চীনেবাদাম, কাইদানা বিস্কুট। কেউ কেউ হাঁক দিত। কেউ কেউ ঘুন্টি ঠুনঠুনিয়ে যেত। ফেরিওয়ালারাও সেয়ানা; আমাদের দু বাড়ির দিকে বড় একটা ঘেঁষত না। কিন্তু হলে হবে কি, খেলাধুলো ছিল তো সব একসঙ্গে। বাড়িতে ছুটে আসতাম। মা-র আঁচল ধ'রে 'দে-মা

দে-মা' করতাম। মা তার জন্যে কতদিন আমাদের বকেছে, মারতে পর্যন্ত গেছে।

মায়ের গলা শুনে লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে এসে যেত বুবু, মানে আমার ঠাকুমা।

তারপর লাগ-লাগ ক'রে লেগে যেত বুবুর সঙ্গে মা-র।

মোড়লের কাছ থেকে যে দশ কাঠা জমি উদ্ধার করা হয়েছিল, তাতে হত ডুমুরে কলা। আর কিছু নারকোল গাছও ছিল। বুবুর হেফাজতে ছিল সেই বাগান। তাছাড়া পাড়ার বাগান জঙ্গল ঢুঁড়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে, গোবর এনে ঘুঁটে দিয়ে, আণ্ডা মুরগি বেচে বুবু কিছু কিছু পয়সা পেত। মা সেটা জানত।

বুবুর অনেক রকম বদ্‌অভ্যেস ছিল। পানদোক্তা তো খেতই, তার ওপর ছিল আপিঙের নেশা। আর রোজ রাত্তিরে শোবার আগে সারা গায়ে মাখত কপ্পুর তেল। পৃথিবী হেজে যাক মজে যাক, রোজ এক পয়সার সর্ষের তেল আর কপ্পুর, দেড় পয়সার পানদোক্তা আর হপ্তায় এক আনার আপিং—এ না হলে বুবুর চলবে না। তখন ছিল শস্তাগণ্ডার বাজার। কাজেই রোজ আড়াই তিন পয়সার মামলা। এ নিয়েও বাবার সঙ্গে বুবুর রোজই ঝগড়া লাগত। শেষকালে একটা নিষ্পত্তি হল। বাজার খরচা থেকে বুবু রোজ তিন পয়সা পাবে। তাতে আবার মা-র খুব আপত্তি।

রোজের বরাদ্দ তিন পয়সা। তাতে বুড়ির কুলোত না। কাজেই বাগান জঙ্গল টুকিয়ে টাকিয়ে বেড়াতে হত। তার ওপর বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফেলে-দেওয়া পানের বোঁটা আর শির কুড়িয়ে এনে হামানদিস্তায় ছেঁচে বড় ডিবেয় ভর্তি ক'রে রাখত। মা আবার রোজ এসব কথা বাবার কাছে লাগাত। বাবা সবচেয়ে অপছন্দ করত বুবুর এই কুড়িয়ে বেড়ানোর অভ্যেস। বুবুকে যা তা বলত। বুবুও ছাড়ত না। বাড়িতে এই নিয়ে রোজ অশান্তি ঝগড়া লেগেই থাকত।

মা-র চিৎকার আর বকুনি শুনে বুবু যেই এসে দাঁড়াত, মা তখন

আমাদেব ছেড়ে দিয়ে বুড়িকে নিয়ে পড়ত। বুবুকে বলত, 'কই, একদিনও তো আদর ক'রে নাতি-নাতিনগুলোকে কিছু কিনে দিতে দেখি না। কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা জমাচ্চ আর নিজের গবেব ঢালচ।'

তারপর বুড়িকে দেখতে হয়। বুড়ি তখন লাফাতে থাকে। কিরে কেটে মাকে বলে, 'বল্! বল, তোর ছেলের মাথায় হাত দিয়ে। লুকুনো পয়সা নেই তোর কাছে? বল্! বল্, তোর ছেলের মাথায় হাত দিয়ে।' ব্যস্, এব পরই মা পড়ে যেত বেকায়দায়। গজ গজ করতে করতে ঘরের ভেতর চলে যেত। খানিক পরে বেরিয়ে এসে মাটিতে ঠকাস্ ক'রে পয়সা ফেলে দিয়ে বলত, 'যাও, এবার তোমাদের বুবুর মতন শুধু গিলে কুটে বেড়াও।'

আমরা ওসব ঠেস-দেওয়া কথা কানে তুলতাম না। খুশিতে নাচতে নাচতে ছুটে যেতাম রাস্তায়। সোজা ফেরিওয়ালাদের কাছে। তবে এ রকম ঘটত কচিৎ কদাচিৎ। হপ্তায় এক আধ দিন। নইলে বেশির ভাগ দিনই মা চেলা কাঠ নিয়ে আমাদের তেড়ে আসত। তবু মা-র জমানো পয়সাগুলো এইভাবেই আমরা শেষ ক'রে দিতাম।

শুধু কি আমরা? বা-জানও ঠিক তাই করত। যখনই বুঝত মা-র হাতে এবার দুগার পয়সা জমেছে, অমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লে আদর সোহাগ দেখিয়ে সে পয়সা হাত ক'রে নিত। এটা বেশি করত যে সময়ে বা-জানের মদতাড়ির নেশা ছিল। সে গল্প আমরা শুনেছি মা র কাছে।

ছেলেবেলায় আমার দাদার, মানে আমার বড় ভাইয়ের, খুব পড়ার ঝোঁক ছিল। আমি আর দাদা পড়তাম ভোলা মাস্টারের ইস্কুলে। পড়ব কি, ভোলা মাস্টারের ফাইফরমাস খাটতে খাটতেই আমাদের দম নিকলে যেত। আসলে তাঁর ছোট একটা দোকান ছিল, তার রোজগারেই কোনোরকমে সংসার চলত। পড়ানো থেকে যেটা হত, সেটা তাঁর হাত-খরচ। ব'সে পড়ব কি, 'এটা নিয়ে ওখানে যা', 'সেটা নিয়ে ঝপ্ ক'রে চলে আসবি', 'গরুটাকে মাঠে

বেঁধে দিয়ে আয়', 'ছেলেটাকে একটু ধর তো'—সব সময় একটা না একটা লেগেই থাকত।

দাদা তবু ইউ-পি পাস করল। তারপর ভর্তি হল হাই-ইস্কুলে। ভর্তির টাকা যোগাড় হল মা-র একটা মাকড়ি বন্ধক দিয়ে। এক বছর টেনে মেনে চলল। পরের বছর হল মুশকিল। ইস্কুলে ছ'সাত মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেল। কী করা যায়? বা-জান কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। মা-র তো গয়নাগাঁটি বলতে আর কিছু নেই। মা তার শেষ মাকড়িটা বন্ধক দেওয়ার জন্যে বা-জানের হাতে তুলে দিল।

মাকড়িটা বন্ধক দিয়ে আসতে না আসতে বা-জান পড়ে গেল অসুখে।

অনাথ ডাক্তার বা-জানকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন পোর্ট কমিশনের ডাক্তার। ভিজিট তো নিতেনই না। বিনা পয়সায় ওষুধপত্তরও দিতেন। কিন্তু শুধু তো চিকিৎসা নয়। সংসারে এতগুলো পেট। চালাতে হবে তো!

তার ফলে, দাদার ইস্কুলের মাইনেটা আর দেওয়া গেল না। দাদাকে ইস্কুল ছাড়াবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বা-জানই বা কী করবে। সংসারের তখন অচল অবস্থা। বাড়িতে পেতলের একটা ঘড়া ছিল। সেটাও বাঁধা দিতে হল। দাদার বয়স তখন বছর এগারো। ইস্কুলে যাবে কি, দাদাকে তখন রোজ গড়ে পাঁচ-ছ' মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে বাবার কারখানার বন্ধুদের কাছ থেকে—কখনও এর কাছ থেকে এক টাকা, কখনও ওর কাছ থেকে আট আনা—এইভাবে জুটিয়ে এনে সংসার চালানোর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

আমার ছিল এক খালু, মানে মেসো। তার অবস্থা ভাল ছিল। মেসো চাকরি করত মেমসায়েবদের টুপি বানাবার কারখানায়। বা-জান ঘটকালি ক'রে খালার, মানে আমার মাসীর, এই বিয়েটা দেয়। খালুর বাপ সিঙ্গাপুরে থাকত। তার ছিল লণ্ডীর ব্যবসা। তার ছিল

দুই বিয়ে। শেষের বিয়েটা করে পেনাঙে। তারপর কলকাতায় চলে আসে। শেষের বিয়েটার জন্যে এখানকার সমাজে ওর খুব দুর্নাম হয়। লোকে ওর সঙ্গে ওঠাবসা বন্ধ ক'রে দেয়। আমার খালু সেই পেনাঙের বউয়ের ছেলে। বা-জান এগিয়ে এসে ঘটকালি না করলে সাধারণ মুসলমান সমাজে খালুর বিয়ে হওয়া দুষ্কর ছিল। অথচ খালু কিন্তু বা-জানকে বরাবরই ছোট নজরে দেখত। ওদের যেটা ছিল, সেটা হল টাকার গরম। টাকা আছে ব'লে ধরাকে সরাজ্ঞান করত।

বাবা যখন অসুখ হয়ে বিছানায় প'ড়ে, আমাদের সংসার যখন কিছুতেই আর চলছে না, মা তখন বা-জানকে না জানিয়ে আমার খালাকে, মানে আমার মাসীকে, দাদাকে কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্যে বলে। আমার খালা তখন খালুকে ধরে। খালু তখন টুপির কারখানায় দাদাকে ঢুকিয়ে দেয়। বা-জান সব শুনে টুনে চুপ হয়ে থাকল। দাদা আর ইস্কুলে যাবে না, বা-জানের এটা ভাল লাগছিল না। দাদার কাজ খালু ক'রে দিয়েছে, বা-জানের কাছে এটাও ছিল একটা ছোট হয়ে যাওয়ার ব্যাপার।

দাদার কারখানা ছিল কলকাতার চাঁদনীতে। রাস্তা খুব কম নয়। দাদা হেঁটে যায়, হেঁটে আসে। হাঁটার কষ্টের কথা কোনোদিন বলে না। দাদা আমাদের বলে, ট্রামগাড়ি কি রকম ঢং ঢং করতে করতে যায় তার গল্প। ধর্মতলায় লোক গিজগিজ করার গল্প। মেমসায়েব আজ এই বলল, মেমসায়েব কাল সেই বলল - এইসব গল্প। খুব চটপটে চালাক ব'লে একদিন মেমসায়েব নাকি দাদার পিঠ চাপড়ে দিয়েছে। শুনে আমরা হাঁ হয়ে যাই। দাদার পিঠটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখি। আর মনে মনে হিংসে করি। মেমসায়েব জিনিসটা কী তখনও জানি না। শুনেছি সায়েবরা রাজার জাত। তার মানে, রানীটানী গোছের কেউ হবে। দাদা আমাদের কাছে খুব ভেঙে কিছু বলত না। মেমসায়েবের পিঠ চাপড়ানিতে দাদারও তখন পায়া খুব ভারী।

এক মাস কাজ করার পর দাদা খুব ডগমগ হয়ে মাইনে নিয়ে ফিরল। বাড়িতে সেই মাইনে-পাওয়া নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। এই প্রথম বা-জানের মুখে একটু হাসি ফুটতে দেখলাম। দাদার মাইনে ঠিক হয়েছিল মাসে সাড়ে তিন টাকা। বা-জান বলল, ঐ টাকায় আগে ধার-দেনাগুলো কিছু কিছু শোধ করা হোক। মা আর বুবু বেঁকে বসল। না, ঐ টাকায় মওলুদ শরীফ দেওয়া হোক। মা আর বা-জানে এই নিয়ে খুব একচোট হয়ে গেল। শেষকালে বা-জান রাজী হল। যার কাছে বা-জান মুরীদ হয়েছিল, সেই পীর এল কলকাতার বার্নিশপাড়া থেকে। খুব ধুমধাম ক'রে মওলুদ হল।

দাদা রোজ কাজে যায়। যেত সেই সকাল সাড়ে আটটা ন'টায় আর ফিরত রাত আটটা ন'টায়। ট্রামভাড়া ব'লে যা পেত, নিজে পায়ে হেঁটে তাই থেকে দু আনা চার আনা ক'রে সংসারের জন্যে বাঁচাত। নিজে তা থেকে শুধু দু তিন পয়সার টিফিন কিনে খেত। দাদার ছিল সংসারের ওপর খুব টান। মাকে খুব ভালবাসত। ভাইবোনদের দেখত। দাদা সব পয়সা এনে মার হাতে দিত। মা সেই পয়সা আড়কাঠায় বাঁধা কাঁথার পাটে পাটে মুড়িয়ে রাখত। মার নিজেরও তাতে থাকত আণ্ডা বিক্রির পয়সা। বা-জান সেইসব হাঁটকাত। মা দেখতে পেলেই বা-জানের দিকে তেড়ে আসত। মার খুব শখ ছিল এইসব পয়সা জমিয়ে বড় বুবুর জন্যে কোমরে পরার একগাছি নিমদানা গড়িয়ে দেওয়ার। পয়সা জমত আর খরচ হয়ে যেত। কখনই দু-টাকা আড়াই টাকার ওপরে আর উঠত না।

একদিন দেখি রাত্তিরে ফিরে মার কাছে ব'সে দাদা খুব কাঁদছে। মা আমাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে দিল। পরে দাদাই আমাকে সব বলল। খালু নাকি দাদাকে কিছুতেই কাজ শিখতে দিতে চায় না—পাছে শিখে নেয়। সেইজন্যে কেবল বাইরে বাইরে ফাইফরমাস খাটায়। খালু দাদাকে টিটকিরি দেয়, মা-মাসী তুলে গাল দেয়।

দাদা ভয়ে মেমসায়েবকে বলতে পারে না। রেগে গিয়ে খালু তখন খালাকেই হয়ত মারবে।

দাদা বলে, 'খবরদার। এসব কথা বা-জান যেন জানতে না পারে।'

আমার কথা বুধবার

কাল সকাল এগারোটার পর থেকে কান খাড়া ক'রে ছিলাম। ভাবছিলাম সেপাইরা খাওয়াতে এলে শেষ পর্যন্ত বাধা দেব। নাকে নল ঢুকিয়ে দেবার পরেও। তাতে যাই হোক।

নলের ভেতর দিয়ে পেটের মধ্যে দুধ যাওয়ার সেই আরাম। বার বার মনে পড়ছিল আর নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল। আমার ঐ ভাল লাগাটা উচিত হয় নি। তার মানে, ভেতরে ভেতরে আমি চাইছিলাম। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আজ ফোর্স ফিডিং করাতে না দিয়ে।

বার বার ঘড়ি দেখছিলাম। ঘড়িটা আমার নয়। আমার বন্ধু মনীশ দিয়েছিল। তার শ্বশুরের এক সেকেলে পুরনো ঘড়ি।

মনীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। রাজনীতির জীবনেও আমরা বরাবর এক দলে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু পড়েছি একসঙ্গে। ছোট থেকেই ও খুব পাকা। ইংরিজি আর ফরাসী নাটকনভেল প'ড়ে প'ড়ে এমন সব গল্প লিখতে শিখেছিল যে, বাঙালী পেটে তা বরদাস্ত হয় নি। কিন্তু গলা ভাত আর গ্যাঁদাল পাতার ঝোল রাঁধতে রাজী হল না ব'লে লেখার লাইনে ওকে আর রাখা গেল না।

তারওপর আরও ডুবে গেল বিয়ে ক'রে। যাকে বিয়ে করেছে সে আমার চেনা। ভারি মিষ্টি মেয়ে। মনীশ আবার আমাকে খুব ভালবাসত। একদিন ময়দানে নিয়ে গিয়ে আমাকে সেই মেয়েটির কথা বলল। ব'লেই খুব একটা ভারিক্কি ভাব নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'অবশ্য তোর যদি ওর ওপর—'

তার মানে, মেয়েটির প্রতি আমার দুর্বলতা থাকলে আমার জন্যে

মনীশ আত্মত্যাগ করতে রাজী। ও ধরেই নিয়েছিল, মেয়েটিকে ও যখন এত ভালবেসে ফেলেছে, তখন আমিও নিশ্চয় ভালবেসেছি। আমাদের দুজনের মধ্যে অন্য সব ব্যাপারে যখন মনের এত মিল, তখন এ ব্যাপারেই বা না হবে কেন? আমি গম্ভীর মুখ ক'রে বললাম, 'অবশ্য ওর যদি আমার ওপর—' সঙ্গে সঙ্গে মনীশ বলেছিল, 'আমি ওকে বললে—' ওর পিঠে এমন জোরে চড় কষিয়েছিলাম যে ওকে থেমে যেতে হয়েছিল। আসলে মনীশ জানত, আমি সত্যিই যদি মনে মনে একজন প্রার্থী হয়ে থাকি তাহলে ওর পক্ষে বিনা দ্বন্দ্বে সরে যাওয়া সম্ভব হবে না। ও আমাকে ভালবাসে ব'লেই আমার সঙ্গে ওর লড়াই না হোক, এটাই সে চায়। আমার হাতের চড়টা খেয়ে মনীশ সেদিন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

বিয়ে করার জন্যে ওকে একটা ছোটখাটো চাকরি নিতে হয়েছিল। বাবা ছিলেন পসারহীন উকিল। ভদ্রলোকের মাথায় ছিট ছিল। জাল জোচ্চুরি মিথ্যে প্রবঞ্চনার ব্যাপার থাকলে সে কেস উনি করবেন না। তাঁর সহযোগীরা বলত—তবে আপনি মরুন গে যান। ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই মারা গেলেন। আর সেই সঙ্গে বিশাল সংসার ঘাড়ে প'ড়ে মারা পড়ল এককালে এম-এ ক্লাসের ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, পাঠককুলে সাড়া জাগানো ভূতপূর্ব, উদীয়মান কথা সাহিত্যিক মনীশ মজুমদার। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু পার্টি ছাড়ে নি।

পার্টিই একদিন হঠাৎ ওকে ছেঁটে দিল। একা ওকে নয়, ওদের গোটা সেলটাকে। ও তখন পার্টিতে গুপ্ত ধরনের কাজ করছিল। বাইরে সবাই জানত মনীশ বসে পড়েছে। গোপন কাজে সেটাই রেওয়াজ।

হঠাৎ একদিন জেলের মধ্যে পার্টির একটা সার্কুলার দেখে চমকে উঠলাম। সার্কুলারটা এমনভাবে লেখা যাতে সোজাসুজি না বললেও প'ড়ে বোঝা যায় যে, মনীশ আর তার দলবল দালাল হয়ে গেছে।

আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু তেতো ওষুধের মতো গিলতে হয়েছিল।

এখনও মাঝে মাঝে খচখচ করে বটে, কিন্তু জেনে ব'সে ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তাছাড়া দু বছর তো হতে চলল। মানুষের কত কী বদল হয়। বিশেষ ক'রে অভাবের সংসারে। হয়ত মনীশ নিজে ওর মধ্যে ছিল না, দশচক্রে ভগবান ভূত হয়েছে।

পরক্ষণে এই ভেবে বুক হিম হয়ে আসে—তাহলে কি কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না? কাউকে নয়? নিজেকেও নয়।

ঘড়িতে দেখি দুটো বাজে। ঘড়িটা দিয়েছিল মনীশ। ওর শ্বশুরের ঘড়ি।

ঘড়িটা দেখে আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। কাল এতক্ষণে ফোর্স ফিডিং শেষ। তার মানে, আজ তাহলে ওরা এল না। হঠাৎ পেটের মধ্যে গরম দুধ যাওয়ার সেই পরম আরামের কথা মনে পড়ল।

সারা সকাল ওরা আসবে ভেবে মনে মনে প্রবল প্রতিরোধের যে দেয়াল তুলেছিলাম, মনীশের শ্বশুরের ঘড়ির কাঁটার একটি খোঁচায় সেটা হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল।

বাদশার কথা

আচ্ছা, পেঁচোর কথা এর আগে বলেছি কি? বোধহয় বলি নি। অথচ কেউ না হয়েও পেঁচো কিন্তু এক রকম আমাদের বাড়িরই লোক হয়ে গিয়েছিল। ওর আসল নাম পাঁচু। বাবা ছিল বৈরাগী। আমরা যখন পেঁচোকে দেখেছি, তখন ওর বাবা ছিল না। ওর বুড়ি মা ছিল গয়লানী। রামরাজাতলার দিকে ওরা থাকত। সংসারে ছিল ওরা দুটি মাত্র প্রাণী।

একবার খুব ছেলেবেলায় রক্ত আমাশা হয়ে পেঁচো প্রায় মারা যাচ্ছিল। খবর পেয়ে বা-জান গিয়ে পড়ে। বা-জান তক্ষুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসে। যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে শেষ পর্যন্ত ছেলেটা বেঁচে যায়। বুড়ি তখন বা-জানকে বলে, আজ থেকে পেঁচোকে তোমার হাতে তুলে দিলাম।

সেই পেঁচো তারপর বড় হয়ে খুব ভাল নাচিয়ে আর গাইয়ে হল। ক্লাবে ক্লাবে পেঁচোকে নিয়ে টানাটানি। সবাই পেঁচোকে চায়। নাচ শেখাতে হলেও সেই পেঁচো, গান শেখাতে হলেও সেই পেঁচো।

বলতে গেলে বা-জানই পেঁচোকে মানুষ করে। কারখানায় নিয়ে গিয়ে পেঁচোকে বা-জান নিজে হাতে ধ'রে কাজ শেখায়। বা-জানের মেশিনে বয়ের কাজে বা-জানই ওকে ঢুকিয়ে নেয়। পেঁচো বা জানকে বলত 'দাদামশায়'। ও আমাদের সংসারেই একজন হয়ে গিয়েছিল। সকাল বিকেল ও কারখানায় যেত আসত বা-জানের সাইকেলের পেছনে ব'সে। বিকেলে বা-জানের সঙ্গেই ও পাড়া বেড়াতে বার হত। পেঁচো ভাল নাচিয়ে গাইয়ে হওয়ায় বা-জানেরও খাতির বেড়ে গেল। বা-জানের অনুমতি পেলে তবেই কোনো ক্লাবে গিয়ে সে নাচগানের তালিম দেবে। নইলে নয়। তাই সবাই বা-জানকে ধরত। আর সেই সূত্রে বা-জান এ-ক্লাবে সে-ক্লাবে গিয়ে জাঁকিয়ে বসত।

আমাদের পাড়ার লোকজনেরা তখন হিন্দুদের বলত 'বাঙালী'। তারা বাঙালীদের সঙ্গে মুসলমান ব'লে নিজেদের তফাত করত। তার মানে, আমাদের পাড়ায় তখনকার ভাষায় পেঁচো ছিল বাঙালী আর আমরা ছিলাম মুসলমান। বা-জান কি সাধে আমাদের পাড়ার ওপর অত চটা ছিল? পাড়ার লোকে বাঙালীদের সঙ্গে বা-জানের এই ওঠা-বসা, ভাব সাব মোটেই ভাল চোখে দেখত না। আসলে তারা মনে মনে বা-জানকে হিংসে করত। বা-জান রেগে মেগে আমাদের কাছে বলত, 'সারাক্ষণ ময়লা ঘেঁটে মন ওদের আর কত ভাল হবে? আরে, শুধু পয়সা থাকলেই কি মানুষ মানুষ হয়? ওরা হল কুয়োর ব্যাঙ।'

বা-জান যাই বলুক, এই পাড়াটার ওপর আমার কেমন যেন একটু টান আছে। শত হলেও, এর মাটি কাদা আলো আঁধার খানা-ডোবা মশামাছি—এই সবের মধ্যেই তো মানুষ হয়েছি। যেখানেই যাই, যেখানেই থাকি—আমাদের সেই পাড়াটার কথা মনে হয়

পাড়ার মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেও আমার মনে হয় না আমি অজলে অস্থলে পড়েছি। তো আপনি যেখানে ছোট থেকে বড় হয়েছেন আপনারও নিশ্চয় তাই মনে হয়। হয় না?

এবার পাড়াটার কথা বলি। আমার বলাটা বোধহয় খুব আবোল-তাবোল হয়ে যাচ্ছে। তাই না? আপনি পরে সব ঠিকঠাক ক'রে নেবেন। এসব কথা কাউকে বলব, সে শুনবে—আগে তো কখনও ভাবি নি। না কী বলেন?

আচ্ছা। বলছি এবার।

আমাদের পাড়ায়—তা ধ'রে নিতে পারেন—পঁচিশ তিরিশ ঘর লোকের বাস। এই হচ্ছে মোড়লপাড়া। মাঝখান দিয়ে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা। এইখান দিয়ে আঁতুল রোড। রাস্তা থেকে —এইভাবে—এইভাবে—গলি চলে গেছে। গলির দুপাশে বাড়ি।

মোড়লদের অবস্থা ভাল। জায়গা জমি আছে। বাগান আছে। চাষবাস। মুদির দোকান। ওরই মধ্যে দু এক ঘর পাবেন, যারা আগে মোড়ল ছিল। এখন তাদের অবস্থা পড়ন্ত। এই সাবেকের মোড়লদের মধ্যে একজনদের আছে ভাঙা ইটের একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। বাইরের দিকে চুনবালি খসে ভেতরের ইট বেরিয়ে গেছে। মেঝের সিমেন্টের চটা ওঠা। দেড় মানুষ উঁচু ছোট কাঠের জানলা। তাতে আবরুর খুব ব্যবস্থা। ঐ প্যাটার্নেরই আরও একটা পুরনো বাড়ি আছে। তবে একতলা। সেটাও ঐ সাবেক কালের মোড়লদের। তাদের অবস্থা এখন হয়ে এসেছে। কিন্তু এককালে তাদের খুব দবদবা ছিল।

আরও দুখানা পাকা বাড়ি আছে। হাল আমলের। হয়েছে এই বছর পাঁচিশ তিরিশ আগে। পয়লা লড়াইয়ের পরে। এ দুটো হল অলি বক্সদের বাড়ি। শালিমারে যখন বি-এন-আরের রেল লাইন হল, তখন ওরা রেল কোম্পানির কাছে জমি জায়গা বিক্রি ক'রে দিয়ে এখানে উঠে আসে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একতলা বাড়ি।

অলি বক্সদের আছে ধোপাখানা। সাহেব সুবোদের কাপড় কাচে। নিজেদের ধোপা বলে না। বলে 'পিনম্যান'।

এই নিয়ে একটা গল্প আছে। বা-জান বলত।

আদালতে মোকদ্দমা হচ্ছে। হাকিম অলি বক্সকে জিগ্যেস করেছে, 'কী কাজ করো তুমি?'

'হুজুর, পিনম্যানের কাজ '

'ও, গঙ্গার ধারের মাটিতে পিন মারার কাজ?'

'না হুজুর, সাহেবদের কাপড়চোপড় সাফা করি।'

'ও, ধোপা! তাই বলো।'

বা-জানের যত সব বানানো গল্প।

আমাদের পাড়ার আর যা সব বাড়ি, তার কোনোটা টালিখোলার, কোনোটা গোলপাতার, কোনোটা টিনের। আমাদের বাড়িটা টিনের। তাই ব'লে গোলপাতার ঘর যাদের, ভাববেন না তাদের অবস্থা খারাপ। আসলে কী জানেন? তারা খেয়েই ফতুর। লোকে বলে, শালা হুকুড়ে।

চার ঘর বাদ দিলে সবাই পিনম্যানের কাজ করে। তিন ঘর করে লোহা কারখানায় কাজ। বাকিরা দোকানপাট। চাষবাস এইসব।

আমাদের দক্ষিণ দিকে ওমর শেখ লেন। সেটা আবার অন্য পাড়া। আট ন' ঘর কারিগর। তাছাড়া দর্জি। রশিকল, লোহা কারখানার মজুর মিস্ত্রি। সব মিলিয়ে তা পঁচিশ ঘর হবে। তারমধ্যে আছে ওস্তাগর—যারা দর্জিদের খাটায়।

আঁদুল রোডের উত্তর দিকের পাড়াকে বলে হাজী পাড়া। মোয়াজ্জেম আলির বাপ হজ ক'রে এসেছিল। সেই থেকে ও-পাড়ার নাম হয়েছে হাজী পাড়া। মোয়াজ্জেম আলির বাপ ছিল ডাক্তার। এককালে ওদের ভাল অবস্থা ছিল। ওরা ছিল পাড়ার মাতব্বর। মোয়াজ্জেম আলিও ডাক্তারি করে। তবে ওরা কেউই পাস-করা

ডাক্তার নয়। মোয়াজ্জেম আলি ছিল বাপের চেয়েও এক কাঠি সরেস। এমন কি প্রেসক্রিপশন লিখতেও জানত না। তবে চিকিৎসা বিদ্যেটা বাপের কাছ থেকে দেখে দেখে ভালই রপ্ত করেছিল। হাতুড়ে হলেও ইংরিজি বাংলা ওষুধ সব সময় তার মুখস্থ।

আমার গল্প মানে এই তিন পাড়ার গল্প।

বৃহস্পতিবার

কাল সন্ধ্যেবেলা আমাদের 'কারখানা' খুব জমেছিল।

গৌরহরির পাশের সেলে থাকেন মুরারিবাবু। ভদ্রলোক বেজায় গম্ভীর। কোনোদিন ওঁকে কোনো রাজনীতির আলোচনায় টানা যায় না। জলকলে কাজ করতেন। ইউনিয়ন ছাড়া আর কোনো কথা ওঁর মাথায় ঢোকে না। দেখে মনে হয়, খুব সংসারী লোক। ওঁর একটাই নেশা। সেটা হল সেতার বাজানো। তাও যদি ভাল বাজাতেন!

আমাদের বৈঠকে ওঁকে দেখে আমি বেশ দমে গিয়েছিলাম। এখুনি না ব'লে ওঠেন—কমরেড, আমি জেল কমিটিকে রিপোর্ট করব।

মুরারিবাবুর মুখ দেখে এই প্রথম আমার মনে হল, আমাদের কারখানা' বসিয়ে ভাল হয়েছে। যারা মনে করে, খাওয়ার কথা মনে করাটাই পাপ, তারা মন থেকে সেই পাপ বার ক'রে দিয়ে বোঝা অনেকটা হালকা করতে পারছে।

এই 'কারখানা' খোলার জন্যে যদি কাউকে সাবাস দিতে হয় তাহলে সে ঐ বাদ্‌শা। আমরা তো একমাত্র ওকে সামনে রেখেই নিজেদের আড়াল ক'রে রেখেছি।

মুরারিবাবুর খুব একটা মিশুক স্বভাব নয়। নিজের মধ্যে কেমন যেন গুটিয়ে থাকেন। নতুন বিয়ে করেছিলেন। তার কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যান।

কিছুদিন আগে ওঁর একটি ছেলে হয়েছিল। আমরা সবাই মিষ্টি

খেয়েছিলাম। ছেলেটি এক মাসের হয়ে মারা যায়। যেদিন খবর এসেছিল সেই রাত্তিরে লক-আপের পর অনেকক্ষণ ধ'রে ওঁর ঘরে সেতারের টুং টাং আওয়াজ শুনেছিলাম। বাজানো যাকে বলে, তা নয়। ধুনুরিদের তুলো ধোনার মতো একঘেয়ে, কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা শ্রুতিমধুর কাতরতা।

একেক জন মানুষের একেক রকম স্বভাব। কেউ নিজের কষ্টটা নিজের মধ্যে রাখে, কেউ তা বার ক'রে নিজের চারধারে ছিটিয়ে দেয়।

কে কেমন লোক তা বোঝা যায় জেলখানায় এলে।

প্রথম ঘা খেয়েছিলাম পুরনো দিনের জেলখাটা একজন ডাকসাইটে বিপ্লবীকে দেখে। এবারে আমরা আগেই ধরা পড়েছিলাম। উনি এলেন তার বেশ কিছুদিন পরে।

আমরা থাকতাম অ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডে। বড় ঘর। সারবন্দী লোহার খাট। এক কোণে চট-ঢাকা-দেওয়া পেচ্ছাপের জায়গা। রাত্তিরে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোত। গোড়ায় গোড়ায় একটু কষ্ট হত। পরে গা-সওয়া হয়ে গেল। নিজেদের কিচেন ছিল না। স্নানের ব্যবস্থা ছিল সেই আগেকার 'তোল্ বাটি ঢাল্ মাথায়' গোছের। পরে অবশ্য নিজেদের আলাদা কিচেন, জলের আলাদা চৌবাচ্চা আর নর্দমার বদলে পায়খানা হল। একমাত্র সিগারেটের ব্যাপারে ছাড়া আমাদের মধ্যে খুব একটা একলষেঁড়েমি ছিল না।

এই সময় এলেন শিবশম্ভু হালদার। তাঁর আসাটাকে বলতে হয় 'আবির্ভাব'। কেননা তাঁর আসবার রাস্তায়, দুপাশে সেপাই কয়েদী সবাই দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁকে সেলাম করেছে। এ জেলে এই সেদিনও তিনি থেকে গেছেন। তখন ছিলেন অগ্নিযুগের দীর্ঘমেয়াদী বন্দী। কয়েদীরা তাঁকে বলে দেবতুল্য লোক। জেলে থাকতেই সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী হন। ছাড়া পাওয়ার পর বাইরে তাঁকে মুগ্ধ নেত্রে দেখেছি।

কিন্তু জেলখানায় তাঁকে দেখে হরিভক্তি উড়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা

দেখি একজনকে সরিয়ে দিয়ে একটা ভাল জায়গা তিনি দখল ক'রে নিয়েছেন। নিজেকে আলাদা করার জন্যে খাটের চারপাশে খাটিয়েছেন ঘেরাটোপ। আসতে না আসতেই তিনি নিজের জন্যে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। তাঁর আলাদা ফালতু। আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। তাঁর জন্যে পোষা মুরগির ছানাগুলো ইয়ার্ড জুড়ে সারাদিন আমাদের ঈর্ষ্যা উদ্রেক ক'রে লোভ দেখিয়ে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াত।

[illegible] আগে পর্যন্ত, যাঁরা আমাদের নেতা আর আমরা যারা পার্টির সা[illegible] [illegible]ক—বন্দিদশায় আমরা একভাবেই থাকতাম। সুযোগ [illegible]ধের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য ছিল না। হালদার মশাইকে দেখে [illegible]দের তো আক্কেলগুড়ুম। ভেতরে ভেতরে আমরা রাগে ফোঁস ফোঁস করি। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন উনি ফালতুদের দিয়ে নিজের পা টেপান। ভাবখানা এই যে, জেলখানাটা যেন তাঁর জমিদারি। সেপাই ফালতুদের এটা সেটা দিয়ে হাতে রাখেন।

সন্ত্রাসবাদ আর সাম্যবাদ—দুটো দু ধরনের আদর্শ। ব্যক্তিত্বের এই তফাত কি শুধু আদর্শ থেকে আসে? তাহলে খাওয়া নিয়ে, পাওয়া নিয়ে, ওপরে ওঠা নিয়ে কমরেডে কমরেডে এত মন কষাকষি হয় কেন? কথার সঙ্গে কাজের কেন এত গরমিল হয়?

লোকের কাছে যেটাকে আমি মেলে ধ'রি সেটা আমার বাইরের মানুষ। যতক্ষণ লোকচক্ষে থাকে ততক্ষণ সে টিট থাকে। সবার যাতে ভাল হয় সে দেখে। যেই না পেছন ফেরা, অমনি আমার ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে আসে। সে তখন যা কিছু ভাল নিজের জন্যে তাংড়াতে থাকে। পরের ছেলেকে রাস্তায় নামতে বলি, কিন্তু নিজের ছেলেকে বাড়িতে আগলে রাখি।

স্বভাবের এই দোটান নিয়ে কেউ কথা তুললে বলব—সে দোষ আমার নয়। যে অবস্থায় আমি মানুষ, সেই অবস্থার দোষ; অর্থাৎ এই সমাজব্যবস্থার।

তার মানে, নিজেকে বদলাব না। তার বদলে দুনিয়াকে বদ্‌লে দেব। দুনিয়া বদ্‌লালে আপ্‌সে আমিও বদ্‌লাব। তা হয় না। সত্যিকার কমিউনিস্ট হতে গেলে, কথায় আর কাজে এক হতে হবে। দিমিত্রফের সেই কথাটা মনে পড়ল, 'কমিউনিস্ট হতে হলে চাই স্পর্ধা, চাই গোঁ, চাই নিজের বিশ্বাসের জোর।'

দিদিমা একবার আমাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিল। দিদিমা মানে যাকে আমি আম্মা বলতাম।

তখন খাওয়ার অভাবে দেশে খুব কষ্ট চলছে। বাড়িতে দুটিমাত্র ছোট ছোট ঘর। ছোট মামা পাস ক'রে গোপনে রাজনীতি করছে আর চাকরির চেষ্টা করছে। সন্ধ্যের পর কারা যেন ছোটমামার কাছে আসে। বাইরে দাঁড়িয়ে গুজগুজ ফুসফুস হয়। এখন মনে হয়, তখন বোধহয় ছোটমামা মনে মনে বিয়েরও একটা মতলব আঁটছিল। দুটো ঘর। কিন্তু লোক একগাদা। দাদুর এক বিধবা বোন, তার কাচ্চাবাচ্চা। প্রবাসী এক মাসীর কলেজে-পড়া ছেলে। বুড়ো বয়সে চাকরি খোয়ানো দাদুর ছেলেবেলার এক খেলার সাথী। কাজেই বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

আম্মা রোজ যেত কালীঘাটে। ছেলেবেলায় আমি সঙ্গে যেতাম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা ব্যথা ক'রে ছেড়ে দিত। তখন দেখেছি আম্মার সঙ্গে ও-পাড়ার যত গরিব-দুঃখীদের ভাব। কার ছেলের জামা নেই, তাকে আমাদের পুরনো জামা। কারা ঠোঙা বানিয়ে সংসার চালায়, তাদের আমাদের বাড়ির পুরনো কাগজ দেওয়া। আম্মা এইসব করত।

তারপর বড় হয়ে যখন ঠাকুরদেবতায় বিশ্বাস হারালাম, দয়া দাক্ষিণ্যের বদলে বিপ্লবকে অভাব মোচনের উপায় ব'লে জানলাম— তখন আর আম্মার সঙ্গে ছোটমামা বা আমার মনের মিল রইল না।

একদিন, সন্ধ্যেবেলা আমি আর ছোটমামা বাড়ি ফিরতেই দেখি আম্মা দরজায় দাঁড়িয়ে। আম্মা একটু ষড়যন্ত্রের মতো গলা ক'রে

বলল, 'ছাখ্, একটা ব্যাপার হয়েছে—মুন্সীগঞ্জের একটা ফ্যামিলি কালীঘাটের রাস্তায় এসে উঠেছিল, তাদের আমি বাড়িতে এনেছি।' আম্মা কি পাগল হয়ে গেছে? আমরা বলি নি। আমাদের চোখ বলছিল। আর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে আম্মার চোখের আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। তারপর আম্মা যেন নিজেকে বুঝ দিতে দিতে বলতে লাগল, 'আমি ব'লে দিয়েছি বাইরের বারান্দাটায় থাকবে। নিজেদের রান্না নিজেরা ক'রে নেবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে নিজেদের একটা ব্যবস্থা ক'রে বস্তিতে ঘর ভাড়া নেবে। আমি ওদের সব ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছি। আসলে কী জানিস, ওদের একটা ভারি ফুটফুটে বাচ্চা রয়েছে। ওকে দেখেই আমার মায়া প'ড়ে গেল. ফুটপাথে এই ঠাণ্ডায়—'

আমি আর ছোটমামা প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠেছিলাম, 'কিন্তু বারান্দাটা তো বাইরে নয়—'। আমাদের গলায় একটু ঝাঁঝ ছিল।

আম্মা এর পরই ক্ষোভে দুঃখে প্রায় ফেটে পড়েছিল, 'ছাখ্, ওদের আনার পর থেকেই বাড়ির সবাই আমাকে কথা শোনাচ্ছে। আমি এতক্ষণ ভেবেছিলাম তোরা স্বদেশি করিস, অন্তত তোরা এসে আমার পাশে দাঁড়াবি। এখন দেখছি তোরাও—'

আম্মার কথা মনে পড়লে আজও মাথা হেঁট হয়ে যায়। দাদুও সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আম্মাকে যা তা বলেছিল। আম্মা গুম হয়ে গিয়ে শুধু বলেছিল, 'এ বাড়িতে সব সমান। মনেমুখে কেউ এক নয়।'

বাদশার কথা

এ-পাড়া ও-পাড়া সে-পাড়া—এই তিন পাড়ার পত্তন হয় কম ক'রে দেড় শো বছর আগে। আমরা বলি, লালমুখোদের ল্যাজ ধ'রে। কেন জানেন তো?

কোম্পানির বাগান হল। বিশপ* কলেজ হল। বড় বড় কোঠাবাড়িতে এসে সায়েবরা থাকতে লাগল। কিন্তু থাকতে গেলে

সায়েবদের লাগবে বয় বাবুর্চি দর্জি ধোপা আর গরমকালে পাংখা টানার লোক। সায়েবের টানে এসে গেল মিঞাসায়েব। না কী বলেন?

আমার বাবার এক নানা ছিল সায়েবদের খানসামা। নাম ছিল ইদ্রিস। সায়েবরা ছুটিছাটায় যখন সুন্দরবন টুন্দরবনে শিকার করতে কিংবা বেড়াতে যেত, তখন ইদ্রিস খানসামা যেত সঙ্গে। লোকটা ছিল সায়েবদের একের নম্বরের পা-চাটা। কিন্তু পাড়ায় সে বাঁশবনে শেয়াল রাজা হয়ে ঘুরে বেড়াত। পয়সার জোরে হল পাড়ার মোড়ল। আমাদের জমিটা হাতিয়ে নিয়ে ঐ খানসামাবাড়ির লোকেরাই মেরে খাচ্ছিল। লড়ে ঐ জমি উদ্ধার করে বা-জান।

খানসামাবাড়ির গল্প শুনতে হত বা-জানের মুখে। বা-জান বোধ হয় ইচ্ছে ক'রে যত সব গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলত।

একজন ছিল মজিদ খানসামা। বিশপ কলেজের এক সায়েবের কুঠিতে কাজ করত। সব সময় সে রঙের ওপর থাকত। একদিন বাড়িতে ব'সে বোধহয় একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। এমন সময় বড় ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে যেই না এগারোটার ঘণ্টা বাজা, অমনি সে ধড়মড় ক'রে উঠে—সামনেই ছিল চাপকান আর পাগড়ি—তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় এঁটে কুঠির দিকে একছুট। সায়েব মেম টেবিলে বসেছে খেতে। মজিদ খানসামা খানা নিয়ে টেবিলে রাখতে গিয়ে দেখে সায়েব মেম মুখ নিচু ক'রে আছে, কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না। সেই সময় মজিদ খানসামার হঠাৎ নিজের দিকে নজর পড়তেই তো ওর আক্কেল গুড়ুম। হাতের প্লেটগুলো টেবিলে ঠকাস্ ক'রে নামিয়ে দিয়েই সোজা একছুটে বাড়ি। মজিদ খানসামা নাকি তাড়াতাড়িতে পায়জামা পরতে ভুলে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে সায়েবদের দল হালকা হতে হতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা চলেই গেল। কিন্তু এখন বিচারসালিশি, বিয়েসাদি, আমোদ-ফূর্তি—পাড়ায় যাই হোক না কেন বুড়োদামড়া লোকগুলোকে নিশ্বাস ফেলে বলতে শুনবেন—আহা, কী দিনই ছ্যালো।

আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় লোকে সে সময় ভাল ছিল! কিন্তু দাদা? মানে, আমার ঠাকুর্দা? আমার বা-জান? আমার ছেলেবেলাই বা কী সুখে কেটেছে!

শুক্রবার

ওরা জোর ক'রে খাওয়াতে এল না আজ নিয়ে এই তিনদিন। পাশের ওয়ার্ডেও আজ বালতি ঠনঠনানোর আওয়াজ পাওয়া যায় নি।

কাল রাত্তিরে লক্-আপের পর জেল ভিজিটারের গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিলাম। প্রথমে রাস্তার দিক থেকে এসে তারপর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ এবং তারপর দোতলার কোণের ঘরের তালা খোলা—সমস্তই স্পষ্ট শোনা গেছে।

সকালে তেল মাখতে গিয়ে নিচে বংশীর সঙ্গে দেখা হল। কোনো খবর থাকলে বংশী বলত। বংশী বাংলা বই পড়ছে। 'অপর্যাপ্ত' কথার কী মানে আমাকে জিগ্যেস করল। বললাম 'প্রচুর'। বংশী বলল, তা কী ক'রে হয়? পর্যাপ্ত মানেও তো 'প্রচুর'। 'না' আবার কী করে 'হ্যাঁ' হয়?

বংশীর সঙ্গে দেখা হলে রাজনীতি নিয়ে আমরা বড় একটা কথা বলি না। দুজনে দেখা হলে আমরা এখনও যেন নিজেদের বয়সটা হারিয়ে ফেলে আবার ছাত্র হয়ে যাই। 'চায়ের ধোঁয়ায় স্যাঙ্গুভ্যালি কিংবা বসন্ত কেবিনে ব'সে ব'সে কেবল কথার জাল বুনি। ঠিক সেই আগের মতো।

ঘরে এসে আমারও ভেবে মজা লাগছিল যে 'না' কী ক'রে 'হ্যাঁ' হয়? শব্দের জগতে 'না'কে নিয়ে অনেক কাণ্ড করা হয়। অনেক সময় 'না' মানে তো রীতিমতোভাবে 'হ্যাঁ'। বস্তুজগতে নাকচ ক'রে নাকচ ক'রে এক থেকে হয় নানানখানা।

হঠাৎ 'অলম্' কথাটা মনে পড়ল। ওতে তো প্রয়োজন অপ্রয়োজন দুটোই বোঝায়। অলঙ্কার হল বাইরে থেকে চাপানো বাড়তি জিনিস

উপরন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আবার অভাব মিটিয়ে কাজে লাগে। রূপ খোলতাই করে, দোষগুলো ঢাকে।

অলঙ্কার। আমার আম্মার কোনো অলঙ্কার ছিল না। একটা সেলাইয়ের কল ছিল। আম্মা সেই কলটা ছোটমামার বউকে দিত। কিন্তু ছোটমামা মারা গেল।

ছোটমামা মারা গেল আম্মার কাছে। আসলে ছোটমামা মারা যায় নি। লড়াই শেষ হতেই কিভাবে কিভাবে যেন বিলেতে চলে গিয়েছিল। ওখানে মেম বিয়ে করেছে। সেই চিঠি আর ফটো আসার পরই চিঠিটাতে আগুন দিয়ে আম্মা আমাকে বলেছিল—এই ছাখ্, মা হয়ে আমি মরা ছেলের মুখে আগুন দিচ্ছি।

আম্মার চেহারা দেখে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

তার ঠিক একমাস পরেই একদিন দুপুরে আমাদের কাগজের আপিসে টেলিফোন এল, আমি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই। কলকাতায় সেই প্রথম আমি নিজে পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি চড়লাম। পয়সাটা অবশ্য আমাকে ধার করতে হয়েছিল।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা শুনলাম কলকাতায় দাঙ্গা বেধেছে। তিন দিন তিন রাত্তির আমি আম্মার বিছানা ছেড়ে নড়ি নি। বাইরে যে অত কাণ্ড হচ্ছে ভালমতন জানতামও না।

আম্মাকে কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার সময় দেখলাম রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে বলল।

শ্মশানে পা দিয়ে মনে হল বাঁচলাম—এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত। দেয়ালের এদিক ওদিক দুদিক থেকেই গায়ে কাঁটা দিয়ে কখনও বন্দেমাতরম, কখনও আল্লাহু আকবর আওয়াজ ভেসে আসছিল।

ছোটমামা থাকলে আমার অত ভয় করত না। ছোটমামা খুব ভাল কীর্তন গাইত। আম্মা কীর্তন শুনতে খুব ভালবাসত।

আমাদের অঞ্চলটাতে ছিল পাড়ায় পাড়ায় মোড়ল আর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। নিজেদের ঝগড়ায় কোর্টঘরে কাউকে বড় একটা যেতে হত না। ওমর শেখ লেনের পাড়ার মোড়ল ছিল ফকির মহম্মদ। সে মারা যেতে মোড়ল এখন তার ভাই দীন মহম্মদ। হাজী পাড়ার মোড়ল আগে ছিল হাজী সাহেবের ভাই ওয়াহেদ মোড়ল। তারপর হয় মাসুদ আলি। এখন হচ্ছে--দাঁড়ান, এখন হচ্ছে মাসুদ আলির ছেলে —কী যেন ভালো—হ্যাঁ, গফুর মণ্ডল। গফুর হল গিয়ে গেস্টকীন কারখানার ফিটিং ডিপার্টের হেডমিস্ত্রি।

মোড়ল বাদেও একদল থাকে, তাদের বলে পাশমোড়ল। কারা পাশমোড়ল হবে, সেটা দশ জনে ঠিক করে না। মোড়লই তাদের বেছে নেয়। হয় পয়সা থাকবে, নয় বলনেকহনাওয়ালা লোক হবে —তারাই হয় পাশমোড়ল। এরা সমঝদার বুঝদার লোক, পাঁচরকম লোকের সঙ্গে যাদের ওঠাবসা আছে। বা-জান ছিল এই পাশ-মোড়লদের দলে। তাই প্রায়ই বিচারসালিশিতে বা-জানের ডাক পড়ত।

আমাদের পাড়ায় আগে মোড়ল ছিল গহর আলি। সাহাবাবুদের সেরেস্তায় গোমস্তাগিরি করত। জায়গাজমি করার ফলে পাড়ায় সে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসে। পর পর কয়েকজন মোড়ল এই এক বাড়ি থেকেই হয়। কিন্তু এদের অবস্থা যখন প'ড়ে গেল তখন মোড়ল হল প্রথমে কেরামত, পরে জামাল বক্স। কিন্তু জামাল বক্স যখন মারা যায়, তখন তার পড়ন্ত অবস্থা।

তখন কে মোড়ল হবে এই নিয়ে দুই বাড়িতে চুলোচুলি বেধে গেল। বা-জান নিল গহরের ছেলে গোলাম আলির পক্ষ। তার পেছনে কারণ ছিল।

জামাল বক্স ছিল একজন খুব ডাঁটালো মোড়ল। বিচারসালিশিতে তার খুব নাম ছিল। একবার এক সালিশিতে বা-জান কী একটা কথা বলতে উঠেছিল, জামাল বক্স এক ধমক দিয়ে বা-জানকে বসিয়ে দিয়ে ছিল। মুখ ভেটকে বলেছিল—কে কথা বলে? এব্রাহিমের ব্যাটা। সমাজে তার কথার আবার দাম কী?

সেই থেকে ওদের বাড়ির ওপর বা জান হাড়খচা খচে গেল। কী? এব্রাহিমের ছেলে ব'লে তার কথার দাম নেই? বা-জান নিজের মনে কশম খেল—মোড়লের গদি থেকে ওদের হটাতেই হবে। সেই সুযোগ এল জামাল বক্স মারা যাওয়ার পর। গোলাম আলি তেমন ব'লনেকহনেওয়ালা না হলেও, সবচেয়ে বড় কথা, সে পয়সা করে-ছিল। শেষ পর্যন্ত গোলাম আলিই মোড়ল হল। পাশমোড়ল ক'রে নিয়ে বা-জানকে সব জায়গায় সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াত। এইবার এতদিনে সমাজে বা-জানের কথার দাম হল।

পঞ্চায়েতের কাজ শুধু বিচারসালিশি নয়। এতিম-বেওয়া-মিস্কিন-ছেঁউড়ে—এইসব গরিবগুরবোদের সাহায্য করা। তাছাড়া বিয়েসাদির ঘটকালি করা, ঘরবর কেমন দেখা। তাছাড়া মসজিদের তত্ত্বতাবাশ। পঞ্চায়েতের অনেক কাজ।

এখনও মসজিদের ওপরকার গোল গম্বুজটা দেখলে আমার সাদা মাথা টুনি বুড়ির কথা মনে পড়ে যায়। টুনি বুড়ির মাথাটা ছিল প্রায় ঐ রকমের গোল।

মার চেয়ে বয়সে অনেক বড় আমার এক খালা ছিল। টুনি বুড়ি ছিল আমার সেই খালুর মা। বুড়ি মানে একেবারে থুনথুনে বুড়ি।

খালুর বাড়িতে নিত্যি ছিল শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া। শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে খালু তার মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।

টুনি বুড়ি সেই যে ছেলের বাড়ি থেকে চলে এল, আর ফেরে নি। থাকত জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা একটা ঘরে। শেষের দিকে মাজা পড়ে গিয়েছিল।

বাড়ি বাড়ি থেকে ফি হপ্তায় মসজিদের যে চাল তোলা হত, তা থেকে সবার আগে পেত টুনি বুড়ি। ঐ মসজিদের চাল আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি টুকিয়ে টাকিয়ে যা পেত, টুনি বুড়ির একটা পেট তাতেই চলে যেত।

পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমাকে আর বড় বুবুকেই টুনি বুড়ি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত। খালার বোন হলেও টুনি বুড়ি আমার মাকে খুব ভালবাসত। খালা কত খারাপ, তার মন কত নিচু—বা-জান থাকলে এইসব ব'লে ব'লে আমার বা জানের কান ভারী করত।

টুনি বুড়িকে আমাদেরও খুব ভাল লাগত। আমরা যখন কাঁচা আম, কুল, কিংবা বৈঁচি খেতে জঙ্গলে যেতাম, টুনি বুড়ি আমাদের ডেকে নিয়ে কখনও খাওয়াত কদ্‌বেল, কখনও পাকা তেঁতুলের ঝাল আচার। আমরা খেতাম আর টুনি বুড়ি ব'সে ব'সে হেঁয়ালির ছড়া কেটে কেটে আমাদের ব'লত, 'আচ্ছা, এইবার বল্—দেখি তাহেরের বেটাবেটি পেটে কত বুদ্ধি ধরে—নে বল্—' ব'লে একে একে ছড়া বলত। একটা ক'রে শেষ করত, তারপর বলত—'কী, বল্?··· পারলি নে তো।' এই 'পারলি নে তো' কথাটা টুনি বুড়ি মাথা দুলিয়ে মজা ক'রে বলত।

আচ্ছা, আপনাকে আমি পরীক্ষা করি। অবশ্য আপনি নিশ্চয় উত্তর-গুলো জানেন। না জানলেও ধরে ফেলবেন। আমরা পারতাম না। আচ্ছা, বলুন তো—'এক চাঙাড়ি সুপুরি। গুনতে পারে না ব্যাপারী॥' পারলেন না? আকাশের তারা। আচ্ছা, এবার বলুন—'একটুখানি ঘরে চুনকাম করে। এমন মিস্ত্রি নেই যে তাকে ভেঙে ফেলতে পারে॥' কী, পারলেন না? ডিম। আচ্ছা, আরেকটা—'সুলুক সুলতানের মা, নাকে দড়ি টাঁ্যাকে ঘা। তোমাদের ঐটে দেবে গা?' বলুন, বলুন? পাল্লা। টুনি বুড়ির শেষ ছড়া হত, সেই যে—'পাতায় খস্‌খস্ ফল গেঁড়ুয়া। যে না পারবে তার বাপ মেড়ুয়া॥' শুনে শুনে ওটা আমাদের

মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের 'ডুমুর' বলবার সময় না দিয়েই 'এহে তোদের বাপ মেড়ুয়া, তোদের বাপ মেড়ুয়া' ব'লে ফোকলা গালে একমুখ হেসে আঙুল নেড়ে নেড়ে টুনি বুড়ি আমাদের তাড়া করত আর আমরা চু কিৎকিতের মতো 'ডুমুর, ডুমুর, ডুমুর, ডুমুর' বলতে বলতে খানিকটা পিছু হেঁটে এসে তারপর ছুট দিতাম।

তাহলে দেখুন, আপনিও পারলেন না।

একদিন—

জানেন, আমি আর বড় বুবু জঙ্গলে টোপাকুল কুড়িয়ে ফিরছি, বড় বুবু টুনি বুড়ির দাওয়ার ওপর এক ছুটে উঠে ঘরে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ কোনো রকমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পরই ওর কোঁচড়ের সমস্ত কুল মাটিতে প'ড়ে গেল। আর তার পরই সাঁ ক'রে ঘুরে 'মা' ব'লে চিৎকার করতে করতে বাড়ির দিকে ছুটল। আমিও বুবুর পায়ে পায়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। খিড়কির দরজাটা ঠেলেই বুবু চেঁচিয়ে উঠল—

'মা, টুনি বুড়ি মারা গেছে।'

ওরা আজ আবার ধ'রে পাকড়ে নাকে নল ঢুকিয়ে পেটের মধ্যে এক কাপ দুধ ঢেলে দিয়ে গেল। আজকের দুধটা ছিল ঠাণ্ডা। সব মিলিয়ে আজ আর কোনো উত্তেজনা বোধ করি নি। পরে খবর নিয়ে জানলাম বংশীকে আজও ওরা বাদ দিয়েছে। তার মানে, বংশীকে এখনও ওরা ধরেই নি।

বংশীর শরীর অবশ্য এখনও টস্‌কায় নি। আমারও তো যেমন তেমনিই আছে। আসলে ওরাও নানা রকম কৌশল করছে। শরীরের চেয়েও ওদের বেশি নজর আমাদের মনগুলোর দিকে।

আজ ডাক্তারবাবু গলা নামিয়ে জিগ্যেস করলেন, বাড়িতে যদি কোনো খবর দেবার থাকে বলবেন।

টোপ, অবশ্যই যদি টোপ হয়, প্রায় গিলেছিলাম আর কি। পর-ক্ষণে সতর্ক হয়ে গেলাম। কার মনে কী আছে কে জানে। তাই বললাম—সে আর বলতে। আমার উত্তরটা চূড়ান্ত, অথচ তার মধ্যে একটা অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাবও থেকে গেল।

দিনকয়েক হল বড় শৈল অর্থাৎ আমাদের মার্শাল ভরোশিলভ ছোট্ট কাগজের স্লিপে পিঁপড়ে মতো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে রোজকার খবর চুম্বকাকারে পাঠাচ্ছেন। গোড়ার কয়েক দিন মন দিয়ে শুনেছিলাম। এখন এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার ক'রে দিই।

সাংবাদিকতা আমরাও তো করেছি। দুনিয়ায় প্রত্যেক দিন যদি অত অত ভাল খবরই থাকবে, তাহলে অনেক আগেই দুনিয়া বদ্‌লে যেত। আসলে ভরোশিলভ চাইছেন খবর যুগিয়ে আমাদের চাঙ্গা রাখতে।

খবরগুলো বানানো নয়। কাগজেই বেরিয়েছে। শুধু বেছে তোলার গুণে আমাদের চোখে দুনিয়ার ভোল পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু একটা খবর মনটাকে সত্যিই নাচিয়ে তুলছে ; সে ঐ মার্কিন মুলুকে ধর্মঘটের ঢেউ ওঠার খবর।

যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। একেবারে গোড়ার দিকে। বিদ্যুৎগতিতে হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে চলেছে নাৎসীরা। গোড়ায় ভেবেছিলাম বুর্জোয়া কাগজগুলোর শুধুই বজ্জাতি। দেখা গেল, তা নয়। সোভিয়েটের একটার পর একটা জায়গা জার্মানরা সত্যিই দখল ক'রে নিচ্ছে। একেকটা শহর যায় আর আমাদের বুকে যেন একেকটা শেল এসে লাগে। রাস্তাঘাটে লোকে আমাদের ধ'রে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়। বলে, 'কি হে লালফৌজ, তোমাদের বাপের দেশ তো এবার গেল!'

আমাদের অনেক বন্ধু লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি-ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ বোঝাত ! এটা হল পিছু হটে আসা। এক রকমের চাল। তারপর দেখবি, হিটলার কি রকম নিজের ফাঁদে পড়ে যাবে। ক্রেমলিনে ব'সে স্বয়ং স্টালিন ঘুঁটি চালছেন।

দেশ চাইছে স্বাধীনতা। আমরা চাইছি জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা। একদল বলছে বিদেশী সরকারের কাছে আমরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছি। আমরা বলছি সমাজতন্ত্র গেলে স্বাধীনতা থাকে না। রাস্তায় মার খাচ্ছি, তবু বলছি—দুনিয়ার মজুর এক হও।

তখন সব যে আমরা ঠিক করেছি তা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, দেশসুদ্ধ মানুষের চাওয়ার সঙ্গে নিজেদের চাওয়াটাকে মেলাতে পারি নি। নিজেদের আলাদা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু স'রে থাকি নি। সঙ্গে থেকেছি।

সত্যি বলতে গেলে, রাজনীতি আমি যে খুব তলিয়ে বুঝি তা নয়। গঙ্গায় যেমন বয়া থাকে, তেমনি মোটামুটি একটা আদর্শের বয়ায় নিজেকে আমি বেঁধে ভাসিয়ে রাখি। সেটা কী? আমার বন্ধুরা শুনলে হাসবে—মানুষের ভাল।

আমার তো মনে হয়, শ্রেণী সংগ্রামও সেই জন্যে। যাতে শেষ পর্যন্ত সব মানুষের ভাল হয়। উৎপাদনের কলকাঠি যারা নিজেদের ট্যাঁকে পুরে রেখেছে, তারা চায় শুধু নিজেদের ভাল। দল বেঁধে জোর ক'রে সেটা কেড়ে নিতে হবে যাতে তার ওপর সকলের অধিকার বর্তায়। একাজে সবার আগে থাকবে সঙ্ঘবদ্ধ সেই কাজের মানুষেরা, যাদের নিজের বলতে কিছু নেই।

কিন্তু এতে আসবে মানুষের মুক্তি। লাভ নয়, ভোগ হবে লক্ষ্য। শুধু শরীরের সুখ নয়, মনের স্ফূর্তি।

মনের মধ্যে একটা স্মৃতিকে এতক্ষণ ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে এসেছি। তার ফলে, এক কথা থেকে কেবলি অন্য কথায় গিয়ে আসলে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।

সেটা কোন্ দিন ছিল?

স্টালিনগ্রাড থেকে লড়াইয়ের তখন মোড় ঘুরে গেছে। একে একে জার্মানদের হাত থেকে নিজেদের শহরগুলো কেড়ে নিচ্ছে লাল-ফৌজ। সেটা ছিল ঐ ধরনের একটা জবর বিজয়ের দিন। নিশান

দিয়ে চারদিক লালে লাল ক'রে আমরা সভা করছি। সেদিন আমাদের সবাই আনন্দে নাচানাচি করছে।

আমি সভার মধ্যে ব'সে। আমার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। নিজেকে কত বোঝাচ্ছি—আজকের দিনে মন ভার ক'রে ব'সে থাকতে নেই। সবাই আনন্দ করছে। নিজেকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দাও। আমি পারছি না।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা বোকামি ছিল যে আজ ভাবতেও অবাক লাগে —কী ক'রে আমি এমনটা হতে দিলাম।

সে সময় আমাদের পার্টিতে বিয়ের একটা হুজুগ প'ড়ে গিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত ছিল পার্টিকে চিরকুমার সভা বানাবার একটা ঝোঁক। বিশেষ ক'রে যারা সারা সময়ের কর্মী। এবার ঠিক হল—সংসার থেকে, সমাজ থেকে স'রে যাওয়া নয়। গৃহী হয়ে সমাজের সঙ্গে নিজেদের জুড়তে হবে। একা পার্টির লোক হওয়া নয়, গড়তে হবে পার্টি পরিবার।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলাম, এটা একটা অস্থায়ী ফুরনের কাজ নয়—এটা সারা জীবনের স্থায়ী ব্রত। আমারও একজন জীবন সঙ্গিনী পেতে হবে।

কিন্তু পাই কোথায়? সেই সকালে বেরোই, রাত্তিরে ফিরি। কারো বাড়ি যাওয়ারও ফুরসত হয় না। মিটিঙে একটি মেয়েকে ক'দিন দেখে একটু মন টলেছিল। একটু ঘুরঘুর করতেই দেখি, একজন চেনা কমরেড আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে তার হাত ধ'রে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আঙুল মটকাতে মটকাতে ভাবলাম, তাহলে?

একবার আমাদের আপিসে ক'দিন ধ'রে একটি মেয়ে এসে হিসেব রাখার কাজ করছিল। তার কাকাকে চিনি। তাদের বাড়ি অনেক বার গিয়েছি। দেখে মন বিচলিত হবে, তেমন চেহারাই নয়। তার ওপর রাজনীতিতে কোনো আগ্রহ নেই। একেবারেই ঘরোয়া।

কিন্তু এক সময়ে আমাদের আপিসে নিয়মিত ওকে আসতে দেখে

আগের সব ধারণা আস্তে আস্তে কেমন যেন বদ্‌লাতে লাগল। খারাপ কী। বেশ তো দেখতে। আর কেউ ছোঁ মেরে নেবার আগেই আমার মনের কথা ওকে ব'লে দিতে হবে।

বাধো বাধো ভাব কাটিয়ে উঠে সিঁড়ির কাছে ধ'রে বললাম, চলো হেঁটে তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। একটা কথা বলবার আছে। চোখ দেখেই বুঝলাম, মনে মনে ও বলছে—মরেছে!

হাঁটতে হাঁটতে গেলাম শেয়ালদায়। আমার তখন সারা শরীরে একটা শিহরণের ভাব। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলছি যে, পার্টি ছাড়া জীবনে আমি আর কিছু বুঝি না। আমি চাই এমন একজনকে যে বিপ্লবের পথে সব দুঃখ বরণ ক'রে আমার সঙ্গে থাকবে। এই রকমের যত সব হাবিজাবি কথা।

পাইকপাড়ার বাস আসছিল। মেয়েটি হঠাৎ জিগ্যেস করল, আপনি কী বলবেন বলছিলেন?

তাহলে এতক্ষণ কি কিছুই বোঝাতে পারি নি? অথচ সময় নেই। বাস আসছে। হঠাৎ মরীয়া হয়ে ব'লে দিলাম—মানে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বাসে উঠতে উঠতে মেয়েটি হেসে বলল, কাল দেখা হবে।

শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পেরেছি, এতেই তখন আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে আছি। ভিড় ঠেলে আপিসে ফিরে গেলাম যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা, বিয়ে করা মানেটা কী? ঘর বাঁধা। তার মানে, ঘর ভাড়া করা। বাজার করা। রান্নাবান্না। ইস্, এ সময় আম্মা বেঁচে থাকলে খুব ভাল হত। আচ্ছা, একটা সংসার চালাতে কত টাকা লাগে?

পরদিন আমি প্যাসেঞ্জেই ছিলাম। মেয়েটি অন্য দিকে তাকিয়ে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজে দিয়ে চলে গেল। ধরনটা খুব ভাল লাগে নি। যেন এটা ওর কাছে নতুন কোনো ব্যাপার নয়।

বাথরুমে একা হয়ে গিয়ে কাঁপা হাতে চিঠিটা খুললাম।

গোড়ার লাইনে চোখ পড়তেই এক ফুঁয়ে কেউ যেন আমাকে নিবিয়ে দিল। কথাগুলো মনে নেই, তবে চিঠির ভাবখানা ছিল এই—

কমরেড, মনে কিছু করবেন না। আপনাকে পছন্দ করি কিন্তু একজনকে ভালবাসি। আশা করি, আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হব না। সেই সঙ্গে কামনা করি, আপনার জীবনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

শেষে ছিল, 'বিপ্লবী অভিনন্দন সহ'।

প'ড়ে নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হল। এভাবে ঝোঁকের মাথায় কেন নিজেকে খাটো করতে গেলাম? মেয়েটি আমার সম্বন্ধে কী বিশ্রী ধারণা করল? ভাদ্র মাসের কুকুর নাকি আমি?

সেই সঙ্গে একটা মধুর বিষাদ আমার মন ছেয়ে ফেলল। মধুর, কেননা একটা ব্যথার জায়গা থাকলে তার ওপর আলতো ক'রে আঙুল বোলাতে ভাল লাগে। তাছাড়া, আর কেউ তার জন্যে অপেক্ষা করছে এটা ভেবে এই প্রথম মনে হল মেয়েটি তাহলে সত্যিই প্রার্থনার যোগ্য।

সেই সঙ্গে মেয়েটির নামটা মনে পড়ে চমকে উঠলাম। 'প্রতিমা।

সেই প্রতিমা! মাঝখানে হঠাৎ একটি ট্রাম এসে যাওয়ায় যাকে আমি চিরদিনের মতো হারিয়েছি।

রবিবার

'মাঝখানে হঠাৎ একটা ট্রাম এসে যাওয়ায়—'

কথাটা নিয়ে কাল রাত্তিরে অনেকক্ষণ ভেবেছি। ছ' বছর ধ'রে চলতে চলতে এই ছবিটা হঠাৎ স্ট্যাচুর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ এই প্রতিমা তো ভালো, ঐ প্রতিমার ব্যাপারটা আরও বেশি ঠুনকো।

ঐ প্রতিমা আমাদেরই ক্লাসে পড়ত। প্রফেসরের টেবিলের মুখোমুখি বসতাম আমরা। তাঁর ডানদিকে মেয়েরা। আমরা কয়েক

জন বসতাম পেছনে। মেয়েদের দিকে তাকাতাম। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে একটি মেয়ে। তারই নাম প্রতিমা। যাকে হরিণ চোখ বলে, ঠিক সেই রকম।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আবিষ্কার ক'রে ফেললাম যে, প্রতিমাও আড়চোখে আমাকে দেখে। এটা নাকি আরও বোঝা যায়, যেদিন ক্লাসে আমি থাকি না।

আস্তে আস্তে এমন হল যে ক্লাসে আমি সারাক্ষণ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকতাম। প্রতিমা তো মেয়ে। ওর পক্ষে সম্ভব হত না। তবে মাঝে মাঝে চোখের চাউনিতে বুঝিয়ে দিত যে, এই লুকোচুরি খেলায় তারও মজা লাগছে।

নাটক ক্রমে জমতে চলেছে। ছেলেরা আমাকে ওস্‌কাচ্ছে—এবার যা, গিয়ে আলাপ কর। অন্য মেয়েরা আমাকে আর প্রতিমাকে নিয়ে খোশগল্প জুড়েছে, এটা বুঝতাম ওদের গা টেপাটেপি ক'রে হাসবার ধরন দেখে। একদিন একজন বলল, উর্দিপরা এক ড্রাইভার বাড়ির গাড়িতে ক'রে ওকে নাকি নামিয়ে দিয়ে গেছে। শুনে দমে গেলাম। আশা তাহলে ছাড়াই ভাল। কিন্তু প্রতিমা দেখলাম ক্লাসে ব'সে প্রথমেই আড়চোখে তাকিয়ে আমাকে খুঁজছে। ফলে, আবার মনে জোর এল।

ঠিক করলাম বাইরে ধরব। রোজ গাড়িতে আসে না। ওকে একদিন দেখে ফেললাম আলিপুরের ট্রামে। চেতলা আর আলিপুর একদম পাশাপাশি। বাস ছেড়ে দিয়ে ধরলাম ট্রাম। এও ধ'রে ফেললাম, প্রতিমা কোন্ স্টপ থেকে ওঠে। সেই স্টপে পরের দিন প্রতিমাকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু এগিয়ে কিছুতেই আলাপ করতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম এস্‌প্ল্যানেডে ট্রাম বদল করবার সময় রাস্তায় ধরব। তাছাড়া দিনটা ছিল খুব ভাল। গান্ধীর জন্মদিন প্রতিমা আগে ট্রাম থেকে নামল। ভিড় ঠেলে আমার নামতে একটু দেরি হল। গুমটিটা পেরিয়ে—আমার হাত ধ'রে ফেলে একজনের

কী-খবরের উত্তরে কাষ্ঠ হাসি হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে—লাইনের ওপারে গিয়ে প্রতিমাকে 'শুনুন' ব'লে ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় সামনে ছুট ক'রে একটা ট্রাম এসে গেল। একটা নয়। ল্যাজে ল্যাজে এক সঙ্গে দুখানা।

প্রতিমাকে ডাকবার আগেই একটা সদ্য ছেড়ে দেওয়া ট্রামে ও উঠে পড়েছে। ভাবলাম, আজ যখন হল না তখন নিশ্চয়ই কাল। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কিন্তু পরের দিন প্রতিমাকে স্টপে দেখলাম না। ক্লাসেও এল না। তার পরের দিন থেকে আমাদের ছুটি শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে স্টপ। তারপর 'নাগ' নাম দিয়ে টেলিফোনের বইতে আলিপুরের যত রাস্তার ঠিকানা, সমস্ত চষে ফেললাম। প্রতিমার কোনো হদিশ করতে পারলাম না।

ছুটির পর ক্লাস খুলল। কিন্তু প্রতিমার পাত্তা নেই।

শেষ কালে একটা ভাসা ভাসা খবর পাওয়া গেল। প্রতিমারা রাঁচীর লোক। আলিপুরে এক মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থাকত। কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে ওর বাবা এখানে নাম কাটিয়ে দিয়ে ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন।

তার মানে, আমার প্রেমের প্রতিমার ক্ষেত্রে একেবারে বোধনেই ভাসান।

বাদশার কথা

পরশু কী যেন আপনাকে বলছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ—মসজিদের কথা। আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে বলবার সময় বলি 'মসিদ'। এই রকম অনেক আমাদের মুখে ভেঙে চুরে ছোট হয়ে যায়। আমরা পাড়ায় টার্নার মরিসন বলি না, বলি 'টানার মোর্শন'।

মসজিদের আয়ের দিকটা বলি। বাড়ি বাড়ি থেকে হপ্তায় এক কুন্‌কে বা এক ডিবে ক'রে চাল ওঠে। কারো বাড়িতে বিয়েসাদি

হলে মোল্লাকি-মসজিদ বাবদ একটা খরচ—মোল্লার চার আর মসজিদের চার, মোড়লের হাতে বরপক্ষ এই আট টাকা ধ'রে দেয়। ষোল আনার পয়সায় কেনা পালচাঁদোয়া, হাঁড়ি-হাঁড়া, ডেকচি-গামলা এই সব যার দরকার তাকে ভাড়া দেওয়া হয়।

এবার মসজিদের খরচ।

'ওস্তাজি' বোঝেন? কথাটা বোধহয় 'ওস্তাদজী' থেকে এসেছে। ওস্তাজি হল মসজিদের মৌলবী। তার একটা খরচ আছে। খাওয়া দিলে খাওয়া, নইলে তিরিশ টাকা মাসোহারা। কিংবা রোজ বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়ে একবেলা খাওয়া আর দশ টাকা মাইনে। ওস্তাজিরা বেশির ভাগই বাঙালদেশের লোক। তাদের অন্য রোজগারও থাকে। পাড়ায় ছেলে পড়ায়। ওষুধপত্তর ঝাড়ফুঁক দোয়াতাবিজ জলপড়া— এসব দিয়েও তাদের রোজগার হয়। জুম্মাবারে মানত দিলে পায় শরবত-বাতাসা, মুরগি জবাই দিলে পায় মুরগির কল্লা আর কিছুটা ক'রে মাংস।

সারা বছরের তেলবাতি। মসজিদের সেও একটা খরচ।

যে রাতে রমজানের চাঁদ দেখা যাবে সেই রাত থেকে, যে রাতে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে তার আগের রাত অবধি খতমতারাবি হবে। তারও খরচ আছে। এই ক'দিন কোরান পড়তে হাফেজ আসবে। পুরো কেতাব তার মুখস্থ। তাকে টাকা দিতে হবে। খতমতারাবির শেষ দিনে দানাদার লাড্ডু বালুশাহী জিলিপি বিলোতে হবে। মসজিদ সাজাতে হবে। তার খরচও কম নয়।

মসজিদের টাকা মানে ষোল আনার টাকা। লোকে কঠিন অসুখে পড়লে ষোল আনার এই টাকা থেকে ধার নেয়। সুদ দিতে হয় না। আমার বা-জান একবার নিয়েছিল। মোটে এক কুড়ি টাকা। তাতেও লোকের কথা শুনতে হয়। বলে ষোল আনার টাকা ধার নেয়— লোকটা একেবারে ওঁছা।

ওস্তাজির আছে আরেক রোজগার। কারো ঘরে কেউ মারা

গেলে ওস্তাজির ঘরে কিছু আসে। সেই ঘরে চল্লিশ দিন ধ'রে কোরান পড়া হবে। একে বলে চাল্লিশে-বার-করা। মারা যাওয়ার তিন কি পাঁচ কি সাত দিনের দিন ছোলা-পড়ানি মলু শরীফ করতে হয়। কথাটা বোধহয় মওলুদ।

যার যেমন অবস্থা—কেউ পাঁচ সের, কেউ আধ মণ—ছোলা কিনে পাড়ার বাড়ি বাড়ি খবর দেয়। সন্ধ্যেবেলা লোকজন এলে থেয়ো ছোলা তাদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হল। একটা একটা ক'রে ছোলা তুলে কলমা পড়তে হবে। বলতে হবে, 'লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'। তার মানে, আল্লাতালা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই. মহম্মদকে পাঠিয়েছেন আল্লা। লোকে পাল্লা দিয়ে ছোলা পড়ার পর সেই ছোলা যে যার বাড়ি নিয়ে যাবে। সকলের দরুদ শরীফ নিয়ে. যে মারা গেছে তার নামে, ওস্তাজি দেবে বখ্সে। বখ্সে দেবে. মানে উৎসর্গ করবে। এতে মরা মানুষের নেকি হয়, কেয়ামতে না আখিরির দিনে ভালাই হয়। ছোলাপড়ানি মলু শরীফের পর হবে চাল্লিশে-বার। যাদের অবস্থা ভাল, তারা চল্লিশ দিনের দিন মগফেরাত করবে। খুব ধুমধাম ক'রে লোক খাওয়াবে, ফকিরফক্‌রাদের খয়রাত করবে। যাদের অবস্থা খারাপ, তারা অত সব করবে না। ঐ দিন দুচারজন ফকিরফক্‌রা ডেকে শুধু খাইয়ে দেবে। মগফেরাত হলে পয়সাওয়ালাদের ঘর থেকে ওস্তাজি পাবে গোটা দশেক টাকা, এক সেট কাপড়জামা জুতো আর উড়ুনি। যাদের অবস্থা ভাল নয়, সেখানে ওস্তাজির কোনো খাঁই নেই—খুব বেশি হলে তারা হয়ত দেবে আট সিকে পয়সা আর একজোড়া জুতো কিংবা একটা লুঙ্গি কিংবা উড়ুনি।

পাড়ার কেউ কেউ কানাঘুষো করে। বলে, মসজিদের খরচ আর কতটুকু? সে তুলনায় আয় অনেক বেশি। যার কাছে হিসেবনিকেশ থাকে, সেই নাকি মাবে। সেই সঙ্গে তারা দাঁতে দাঁত ঘষে বলে—শালা খোদার পয়সা খাচ্ছে, ওর গায়ে ফুল বেরোবে।

'গায়ে ফুল বেরোবে' কী জানেন? গায়ে ধবল হবে।

আজ উঠি। ঘুমে আপনার চোখ ছোট হয়ে এসেছে।

সোমবার

কাল দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পাড়ার কথা বলতে গিয়ে বাদ্‌শা বড্ড বেশি খুঁটিনাটিতে চলে যায়। আসলে ও চায় আমি যেন ওকে নয়, ওর পাড়াটাকে দেখি।

বাদ্‌শার কথা বাদ্‌শা বুঝবে। না কী বলেন? বাদ্‌শার ঐ 'না কী বলেন'টা বেশ সুন্দর।

একটু আগে গৌরহরি সানার ঘরে গিয়েছিলাম। মুখটা একটু শুকোলেও বড় হাঁ ক'রে হাসিটা ওর ঠিক আছে। ওর আবার অনেকগুলো ছেলেপুলে। কম বয়সে বিয়ে করলে যা হয়।

জেলে গৌরহরি নিজের বিড়ি নিজে বানায়। বাড়ি থেকে কেউ ইণ্টারভিউতে এসে বিড়িপাতা, শুকা—এসব দিয়ে যায়। একমাত্র কলো ছাড়া আর সবই ওর কাছে মজুত। ঠিক পাশের ঘরের ব'লে ওর বাড়ির মুড়ি, পাটালি আর নিজের তৈরি বিড়িতে আমার ভাগ থাকে। গৌরহরির বিড়ির শুকা খুব ভাল। একবার সিগারেটের তামাক আনিয়ে আমরা নিজেদের জন্যে বিড়ি তৈরি ক'রে নিয়েছিলাম। কিন্তু গৌরহরির ঠিক শানায় নি।

ওর কাছ থেকে আজ বিড়ি আনার আবও একটা উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ওয়ার্ডের তামাকদার কমরেড—যিনি আমাদের সপ্তাহের সিগারেট দেশলাই যোগান, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্টকের অবস্থা ভাল নয়। হাঙ্গার-স্ট্রাইক যদি আরও এক সপ্তাহ চলে, তাহলে তার পরের সপ্তাহে দেওয়া রেশন একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

এ সপ্তাহে মিলেছে দিনে পাঁচটার হিসেবে। গত সপ্তাহে মিলেছিল আটটা। একেবারে গোড়া থেকেই যাচ্ছে দেশলাইয়ের খুব টানাটানি। গৌরহরির কাছেই আমি প্রথমবারের বড় হাঙ্গার-স্ট্রাইকে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ব্লেড দিয়ে চিরে দুখানা করতে শিখেছিলাম।

কাল 'কারখানা'য় ব'সে গৌরহরি দেখাল, এ হপ্তা থেকে একটা কাঠিকে চিরে ও চারখানা বানাচ্ছে। তাও ঘোড়া মার্কা নয়, টেক্কামার্কা দেশলাই। আমি আজ সকালে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে তিন তিনটে কাঠি বিলকুল উচ্ছন্নে দিয়েছি। ফলে, গৌরহরি ভিন্ন আমার গতি নেই।

শুধু দেশলাই নয়, সিগারেটও আমরা ব্লেড দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে নিচ্ছি। যাতে বারে বেশি হয়।

এ ব্যাপারে সুবিধে হয়েছে আমার। এ ওয়ার্ডে একমাত্র আমার। মাস দুই আগে আমার একটা সিগারেট হোল্ডার এসেছে। ছোট্ট পাইপের মতো দেখতে। সিগারেটটা শুয়ে নয়, দাঁড়িয়ে থাকে। সব সময়—অ্যাটেনশন। জমিদারি নয়। জঙ্গীভাব।

বাঁশের তৈরি পাইপটা যে হাঙ্গেরির, এটা সারা জেলে এখন সকলেই জানে। হাঙ্গেরি সমাজতন্ত্র না হলেও জনগণতন্ত্রের দেশ। পাইপটা অনেকেই ছুঁয়ে দেখেছে। চমৎকার। একেবারে নিখুঁত।

কে দিয়েছে তত শত কাউকে বলি নি। একজন বন্ধু। ছেলে না মেয়ে, ওসব ভেজালের মধ্যে যাই নি। একজন বন্ধু। ব্যস্! তা না হলে ঐ নিয়ে দারুণ গবেষণা হতে থাকবে। সে কে? এই পাঠানোর পেছনে কোনো গভীর অর্থ আছে কি না। আমি বাবা ও সবের ধারে বাতাসে নেই।

দু গেলাস জল গিলে চেয়ারের ওপর বাবু হয়ে ব'সে আরাম ক'রে ধরাব ব'লে সিগারেটের একটা টুকরো সবে সাজিয়েছি, এমন সময় জেলগেটে একটা গাড়ির হর্নের শব্দ।

কানটা সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল। আরেক বার। আরও একবার।

ধ্যুৎ! ওটা কয়েদী নিয়ে যাবার গাড়ি।

বার্নিশপাড়ার পীর সাহেবের মুরিদান হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের পাড়ায় চলছিল অনেক দিন থেকে। মুরিদ হওয়া মানে, ইসলাম শরীয়ৎ মেনে চলব, গুরুবাক্যে ইমান রেখে সৎপথে থাকব। ফকিরি নিলে নিজেকে আরও একটু ওপরে তুলতে হয়। তখন আর শুধু সংসারে নিজেকে লাগিয়ে রাখা চলবে না। অনেক কিছু ছাড়তে হবে। তেমনি আবার পীরের কথা শুনে কেউ যদি আদাজল খেয়ে লাগে তাহলে সে অনেক কেরামতি দেখাতে পারে, অনেক কিছুর ওপর তার দখল হয়, এমন কি মরামানুষও বাঁচাতে পারে।

বা-জান যে মদতাড়ি ছাড়ল, সে কি শুধু এমনি এমনি মুরিদ হতে? বা-জানের নজর সব সময় উঁচুতে। বা-জান নিল ফকিরি। কিন্তু তাই ব'লে সংসারধর্মও ছাড়ে নি, চাকরিও ছাড়ে নি। তবে এটা ঠিক লোকের ভাল করার দিকে বা-জানের একটা ঝোঁক গেল।

লোকে কিন্তু বলতে ছাড়ল না—'হুঁঃ, ওটা ওর বুজরুকি। তাহের কি জেকের করে?' জেকের মানে, আল্লা-হো আল্লা-হো বলতে বলতে ভাব এসে যাওয়া।

ফকিরি নিয়ে নাম করেছিল ওমর শেখ লেনের দীনু শা। যারা তিন পুরুষ ধ'রে ধোপার কাজ করে, তাদের বলা হত জাতধোপা। ওরা সেই জাতধোপার বংশ। পাড়ায় ওদের আরও পাঁচ-ছ' ঘর জাত-ভাই ছিল। কিন্তু পাড়ার অন্যদের সঙ্গে ওদের চলিতবলিত ছিল না। এইদিক থেকে যে বিয়েসাদিতে এ-বাড়ির মেয়েরা ও-বাড়িতে খেতে যাবে না। কিন্তু ফকিরিতে ছিল দীনু শা-র খুব নামডাক। এখানে সেখানে মুরিদান-টুরিদানও ছিল।

ফকির হলে, চাঁদের এগারোই শরীফের দিনে ধুমধাম করতে হয়। দূর দূর থেকে মুরিদান এলে—বুঝলেন তো, মুরিদ হল শিষ্য আর

মুরিদান হল শিষ্যবর্গ—তাদের খানা খাওয়াতে হয়। পাড়াপড়শিদের জন্যে থাকে চা-বিস্কুট। কাওয়ালির আসর বসে। মাজারে যেমন ধুমধাম হয় সেই রকম। দীনু শা-র পয়সাওয়ালা মুরিদানও ছিল যথেষ্ট। বছর বছর পীরের জন্মদিনে হত ওরস শরীফ। তিন পাড়ার লোককে খানা ক'রে খাওয়ানো হত। বাইরে থেকে বায়না ক'রে আনা হত বড় বড় কাওয়াল। পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল। সে সময়ের যারা যারা নাম-করা ছিল। এক রাত গাইতো তার জন্যে একেক জনে নিত পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা।

এই কাওয়ালি শুনতে দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসত। গান শুনে অনেকে মস্ত্ হয়ে যেত। লোকজন মস্ত্ হয়ে গিয়ে ট্যাঁক খালি ক'রে টাকাপয়সা বখশিস দিত।

দীনু ফকির লোকটা ছিল খুব ভাল। তোরাব আলি মোড়লের দলিজে মাঝে মাঝে আসত। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগত। বা-জানকে আর আমাদের পাড়ার লোকদের দীনু শা খুব খাতির করত।

দীনু ফকিরের ওরস শরীফে গেলেও, বা-জান কিন্তু মনে মনে তাকে একটু হিংসে করত। বলত—জাতে ধোপা, ওর চেয়ে দাপট আমার কম কী?

একবার হল কি, ওরস শরীফে খেতে ব'সে আমাদের পাড়ার লোকদের খানা কম প'ড়ে গেল। ডাক্তারের ভাই ওয়াহেদ ছিল দীনু শা-র একজন বড় মুরীদ। শুনে ওয়াহেদ বলল—পীরের খানা, পীরের শিন্নি আবার পেট ভ'রে খায় নাকি?

ওর ঐ মুখ বাঁকানো কথায় পাড়ার লোক চটে গেল। পাড়ার মোড়লও চটল। বলল—কী? দাওৎ ক'রে এনে অপমান? আমরা কি শালা খেতে পাই না? চলো সব, দরকার নেই খেয়ে। ব'লে সবাই এঁটো হাতে উঠে পড়ল। দীনু ফকির হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এল। বলল, এখুনি খানা তৈরি ক'রে পেট ভ'রে সবাইকে খাওয়ানো হবে।

তোমরা যেও না। কিন্তু একবার উঠে পড়েছে, আর কি কেউ শোনে?

পাড়ার লোকে দল পাকিয়ে ঠিক করল—দীনু ফকিরের বড় বাড় বেড়েছে, ওকে শায়েস্তা করতে হবে। ফকিরি নিয়ে ও শরীয়তের খেলাপে চলেছে। কিন্তু এসব তো বললেই হয় না। প্রমাণ করতে হবে যে, দীনু শা অমুক জায়গায় রসুলের বিরুদ্ধে ফলনা কথা বলেছে। তাই নিয়ে যে ঘোঁটমঙ্গল বসল, তাতে পাণ্ডা হল গোলাম আলি, তারিফ মণ্ডল আর বা-জান। দীনু শা-র যারা মুরিদান তাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মারপিট হয়ে ফৌজদারি অবধি গড়াল। তাতেও দীনু শা-কে টিট করা গেল না।

তখন ঠিক হল বোরোবত্রিশ ডাকার।

বোরোবত্রিশ যা তা ব্যাপার নয়। ষোল আনা বলতে গ্রাম। এমনি বত্রিশটা ষোল আনার মোড়ল মিলিয়ে যে বিচারসালিশি, তাকে বলে বোরোবত্রিশ। বোরোবত্রিশ ডাকা শক্ত কাজ। মোড়ল ছাড়াও তাতে ডাকতে হবে পাশমোড়ল, বড় বড় হাফেজ, মৌলানা-মৌলবীদের। তাদের খাওয়াদাওয়া আছে। সে আবার যেমন তেমন হলে চলবে না। পোলাও পরাঠা মুরগি। মৌলানা-মৌলবীদের জন্যে আরও কিছু বেশি। তাছাড়া চাই ভাল থাকার ব্যবস্থা। বোরোবত্রিশ ডাকা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। খরচ আছে। তাছাড়া শুধু খরচ ব'লে কথা নয়। তার খাটুনিপরেশানও খুব।

যে গ্রাম বোরোবত্রিশ ডাকবে, তার খুব নাম হবে। বাপ্‌রে, বোরোবত্রিশ ডেকেছে। কোন্ গ্রাম? না অমুক গ্রামের ফলনা মোড়ল। সেই মজলিশে বিচার হবে যে অমুক লোক ইসলাম শরীয়তের খেলাপে চলেছে কিনা।

কেরামত মণ্ডলের যে দোকান, তার পাশে পুলিশের যে ফাঁড়ি, তার ঠিক সামনেই রাস্তার ধারে একটা খোলা মাঠ আছে। সেই মাঠে মেরাপ বেঁধে হল মজলিশের জায়গা। পাল ত্রিপল বাঁধা হল।

দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো হল। আমরা তো তখন ছোট। লোকজন হৈচৈ। আমাদের তাতেই মজা।

মজলিশ তো বসল। মাঠে লোক আর ধরছে না। হাজার দেড়হাজার লোক। একদম গায়ে গায়ে ঠাসা। বত্রিশটা গাঁয়ের মোড়ল পাশমোড়ল। বিচার করবে হাফেজ মৌলানা-মৌলবী। তক্তাপোশের ওপর ফরাস পেতে গদি তাকিয়া দিয়ে তাদের বসবার ব্যবস্থা।

সকালে এক পসলা জোর বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় মজলিশ বসতে একটু দেরি হল। ঐ বৃষ্টি। তাও কী লোক। তক্তাপোশের ঠিক নিচে চাদরের ওপর তাকিয়া পাশবালিশে কনুই ভর দিয়ে বসেছে মোড়ল পাশমোড়ল। তার মধ্যে বুক ফুলিয়ে বসেছে আমার বা-জান।

সেই মজলিশ দুদিন ধ'রে চলল, রাস্তায় ফেরিওয়ালারা দোকান বসিয়ে দিল পানবিড়ি বিস্কুট লজেন্স। যেন ছোটখাটো একটা মেলা।

কে কী বলছে, কী হচ্ছে। কিছুই আমাদের মাথায় ঢুকছিল না। শুধু খুব গর্ব হচ্ছিল, বা-জান যখন দশ জনের সামনে মজলিশে উঠে মাঝে মাঝে কিছু একটা বলছিল। দেখছিলাম আমাদের পাড়ার লোক তাই শুনে ঘাড় নেড়ে 'ঠিক' 'খুব ঠিক' ব'লে থেকে থেকে বা-জানের খুব তারিফ করছেন।

কিন্তু যখনই মনে প'ড়ে যাচ্ছিল যে গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে দীনু শা-কে লোকের চোখে ছোট করার জন্যে, তখন আবার মনটা কেমন যেন খারাপ-খারাপ লাগছিল। দীনু শা লোকটা ভাল। কারো সাতেপাঁচে থাকে না। দেখা হলে ডেকে কথা বলে। সেই লোকের এভাবে পেছনে লাগা ঠিক নয়। সবচেয়ে বড় কথা, বা-জান কেন এর মধ্যে থাকে?

দুদিন ধ'রে খুব তো বলাকওয়া হল। তারপর এবার বোরো-বত্রিশের রায় দেবার পালা। সবাই দম ধ'রে ব'সে আছে, বিচারে কী হয়।

আমাদের পাড়ার মধ্যে আমিই বোধহয় একা—মাঠের এককোণে চুপ ক'রে ব'সে মনে মনে দোয়া করছি—দীনু ফকির যেন হারে না। দীনু ফকির যেন হারে না।

তবু বোরোবত্রিশের রায় হল দীনু শা-র বিপক্ষে।

এক বুক সাদা দাড়ি নিয়ে মাথাটা নিচু ক'রে দীনু শা আস্তে আস্তে মজলিশ ছেড়ে উঠে গেল। ভিড় ঠেলে আমি চেষ্টা করলাম দীনু শা-র কাছে যেতে। পারলাম না।

ঠিক সেই সময় বড় বুবু এসে আমার হাত ধরল।

তখন আমার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি চেষ্টা করছি কিছুতেই থামাতে পারছি না।

হঠাৎ বড় বুবু আমার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় বসিয়ে দিল।

মঙ্গলবার :—

বুধে বুধে আট। তার পর বুধে বুধে আট। তাহলে আটে আটে ষোল। উঁহু, তা কী ক'রে হয়? আচ্ছা, গুণে দেখি। গুণে দেখছি পনেরো হয়। একদিন কমে গেল কী করে? আচ্ছা, না হয় পনেরোই হল। তাহলে আজ নিয়ে কত দিন? বিষ্যুৎ, শুক্কুর, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল—

উঁহু, মঙ্গল তো নয়। আজকের দিনটা গেলে হবে মঙ্গল। তার মানে, পাঁচ দিন। পনেরো আর পাঁচে কুড়ি। কিন্তু বুধবার দুপুরে তো খেয়েছিলাম। কাজেই একবেলা। তার মানে, দাঁড়াচ্ছে সাড়ে উনিশ দিন। বিশ তাহলে এখনও পুরো হয় নি।

আজ এই প্রথম বংশীকে ওরা ফোর্স ফিডিং করিয়েছে। যাক, তাহলে আমাদের দলে এসে গেল। এতদিন ওর চেয়ে নিজেদের বড় বেশি ছোট মনে হচ্ছিল।

বংশীও আজ বলছিল হাঙ্গার স্ট্রাইকে মাথাটা বেশ খুলে যায়। বলা চলে, এও এক রকমের মগজ ধোলাই।

ভোরবেলায় ঘাড়টা যে টনটন করছিল, সেটা এই লিখে লিখে। নইলে একদম ঠিক। শুধু একটা উপসর্গ কিছুতে যাচ্ছে না। পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা। বেশিক্ষণ পা নিচু ক'রে রাখলেই ঝিঁঝিঁ ধরবে।

সুন্দরবন থেকে চাষী ঘরের যে কমরেডরা এসেছে, জানা গেল তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউই হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙে নি। যে ভেঙেছে সে মাঝারি চাষী। ক্ষেতমজুর নয়। এটা লক্ষ্য করবার মতো।

আমি মধ্যবিত্ত। আমাকে নিয়েও ভয়। দোষ আমার নয়। যে শ্রেণীতে জন্মেছি, সেই শ্রেণীর দোষ। না এদিক, না ওদিক। সব সময় একটা দোটানা ভাব। এরা পাহাড়ের একটা জায়গা থেকে ঢাল বেয়ে ক্রমাগত চেষ্টা করছে ওপরে উঠতে। দুচারজন ঠেলাঠেলি ক'রে এর ওর ঘাড়ে পা দিয়ে উঠেও যাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগই পা হড়কে একেবারে নিচে প'ড়ে যাচ্ছে।

আমার দাদু যেমন। উঠতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাউকে ঠেলতে কিংবা কারো ঘাড়ে পা দিতে রুচি হয় নি। ফলে, যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন। এ বাজারে একই জায়গায় থাকা মানেই নেমে যাওয়া। একশো বত্রিশ টাকা বারো আনা পেন্সন। আর আমি জেলে থাকায় সরকারের চল্লিশ টাকা ভাতা। এতে কি আর সংসার চলে ?

ভাগ্যিস, আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাই নি। তাহলে তো ঐ চল্লিশ টাকাটা হত দাদুর নেট লস্।

জন্মের দিক থেকে আরও একটা কারণে আমি হতভাগ্য। আমার জন্মের পরই আমার মা মারা যায়। আমাকে মানুষ করেছে দিদিমা। দিদিমা আমার কাছে ঠিক মা-র মতো। ছোটমামা আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। দিদিমার কোলের ছেলে ব'লেই বোধহয় ছোটমামার সঙ্গে আমার হিংসেহিংসিটা একটু বেশি ছিল। 'আমার মা' 'আমার মা' বলতে বলতে ছোটমামা আমি—দিদিমা হয়ে গিয়েছিল আমাদের

ছুজনেরই আম্মা। সবাই ভাবে মুসলমানরা যে আম্মা বলে—ওটা বোধহয় সেই থেকে হয়েছে। আসলে মোটেই তা নয়।

আমার বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। জ্ঞান হয়ে মা-কে দেখি নি। গোড়ার ক'বছর বাবা মাঝে মধ্যে মামার বাড়িতে আসতেন। আমার জন্যে নানা রকম খেলনা আনতেন। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল জিনিস বাগানোর। আমার কাছে বাবা ছিলেন কিছুটা দূরের মানুষ। বাবাকে পছন্দ করতাম। কিন্তু ভালবাসতাম দাদুকে। দিদিমা আবার আমাকে অত জিনিস দেওয়া পছন্দ করত না। অত পেলে জিনিসে যত্ন থাকে না। সেইজন্যেই আমি নাকি ডোকলা।

আমার আত্মপর জ্ঞানটা ধরা পড়ে যখন একই নিশ্বাসে আমি বলি 'বাবা ছিলেন', 'দাদু ছিল', 'আম্মা ছিল', 'মা ছিলেন'।

এখানে একটু ভুল হল। 'দাদু ছিল' না হয়ে হবে 'দাদু আছে'। আর সব ক্ষেত্রে অতীত কালটাই সঠিক।

বাবা যে পরে বিয়ে করেছিলেন, সেটা দাদু দিদিমারই মত নিয়ে। বিয়ে করেছিলেন এক অবস্থাপন্ন বাপের একমাত্র মেয়েকে। কিন্তু এবার আর ছেলে হয়ে নয়, ছেলে পেটে নিয়েই ছোট মা মারা গেলেন। এরপর বাবা নাকি খুব মদ খেতে শুরু ক'রে দিলেন। এমন খাওয়া যে, মদ খেয়ে চুর হওয়া অবস্থায় অ্যাকসিডেন্টে গলা-কাটা বাবার দেহটা নাকি দূরের এক রেললাইনে পাওয়া যায়।

একটা বিষয়ে আমার মনে বরাবর একটা সন্দেহ রয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুটা মত্তাবস্থায় রেলে কাটা প'ড়ে? না আত্মহত্যা? না, তার পেছনে ছিল বিষয়লোভী কোনো খুনীর হাত?

এই সন্দেহগুলো আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল, ছেলেবেলায় পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা মুনির নানা মত শুনে শুনে। আম্মা বলত, 'সব কিছুতেই ওর ছিল বাড়াবাড়ি—বেহিসেবীর চূড়ান্ত। রেলের গার্ড আর তুই নিজেকে একটু গার্ড ক'রে চলতে পারলি নে?' দাদু বলত, 'যদি অ্যাকসিডেন্টই হবে, তাহলে বলতে হয় নেশার ঘোরে

রেল লাইনে ও গলা দিয়ে শুয়ে ছিল। তা কখনও হয়?' দাদুর এক উকিল বন্ধু ব'লেছিল, 'ব্যাপারটা অত সহজ সরল নাও হতে পারে। ওর এ বউ তো শুনেছি বাপের এক মেয়ে ছিল। বাপের নাকি যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি। কাজেই বিষয়ের লোভে জামাইবাবাজীকে কেউ পথের কাঁটা ব'লেও তো মনে করতে পারে?'

আম্মা মাঝে মাঝে বলত, 'অরু আবার না ওর বাপের স্বভাব পায়।'

আমার বাবার স্বভাব কোন্‌টা? বেহিসেবী হওয়া? না নিজেকে নিজে খতম করা? নাকি নিজের অজানিতে আর কারও মতলব হাসিলের জন্যে বলি হওয়া?

আজও তো নিশ্চয় ক'রে কেউ কিছু বলতেই পারল না!

বাপ্পার কথা

সে সময়ে এমনিতেই কারখানায় কাজ করাটাকে আমাদের পাড়ার লোকে কী-না-জানি এক হাতিঘোড়া ব্যাপার ব'লে মনে করত। তার ওপর বাঙালীবাবুদের সঙ্গে আলাপসালাপ থাকলে লোকে তাকে মনে করত আরও না-জানি-কী।

পাড়ার লোকে মনে মনে বা-জানকে হিংসে করত আর সামনা-সামনি একটা অগ্রাহ্য করার ভাব নিয়ে এড়িয়ে চলত। বিশেষ ক'রে, এটা সম্ভব হত বা-জানের পয়সা না থাকায়।

কিন্তু বা-জানকে একেবারে ফেলতেও পারত না। পাড়ার ঝগড়া-কোঁদলে যেখানেই থানাকাছারির ব্যাপার থাকে, সেখানেই সবাই চায় বাবা-বাছা ব'লে তাহেরকে দলে টানতে।

আপনার বোধহয় মনে আছে, মুসলমানরা এককালে বাঙালী বলতে হিন্দু বুঝত। সেসব আমাদের ছেলেবেলাতেও ছিল। এই বাঙালী-দের সঙ্গে বা-জানের শুধু ভাব ছিল না, তারা দুচারজন আমাদের বাড়িতেও আসত। পাড়ায় এসব ছিল তখন রীতিমতো সাড়া প'ড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার।

এ পাড়ার লোককে শহরবন্দরে ট্রামে বাসে ইস্টিমারে কেউ যদি কোনোদিন আপনি-আজ্ঞে ব'লে কথা বলল, তো ব্যস্—পাড়ায় ফিরে এসে দুদিন ধ'রে তাই নিয়ে চলবে গল্প। কে বলেছে, কোথায় বলেছে, কবে বলেছে—এই সব।

বা-জান যতই ফাঁকে ফাঁকে বেড়াক, পাড়ায় তিন জনের সঙ্গে ছিল তার সদ্ভাব।

এক ছিল কদম রসুল। কেরামত মোড়লের ছেলে। কদম রসুল করত কারখানায় বাইস্‌ম্যানির কাজ। ভাল ফিটার ব'লে সুনাম ছিল। কদম ছিল বা-জনের সমবয়সী। বলা যেত ছেলেবেলার খেলার সাথী। কিন্তু বা-জান আর ছেলেবয়সে খেলতে পেল কোথায়? বা-জানের কাছে কদম আসত তার মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে যুক্তি পরামর্শ নিতে। কদম ছিল একের নম্বরের মামলাবাজ। তার ছিল খুব প্যাঁচালো বুদ্ধি।

আর ছিল মৈজুদ্দি চাচা। যার বড় ভাই তোরাব আলি। তাদের আর যে সব ভাই ছিল তারা কেউই পাতে দেবার মতো নয়। সব রগচটা মারকুটে। গা-জুয়ারি ছাড়া কিছু জানত না।

পাড়ার সবাই ভালবাসত মৈজুদ্দি চাচাকে। খুব ধীরস্থির ঠাণ্ডা মাথার লোক। মৈজুদ্দি চাচার একটা পা খোঁড়া। তাই খোঁড়া পা নিয়ে এক পায়ে লেংচে লেংচে চলে। হাসপাতালে একটা পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়ারই কথা ছিল, বা-জান ছিল ব'লে সেটা রদ হল। তার জন্যে অনেক ঘুষঘাষ দিয়ে কেঁদে কেটে সাহেবদের মন ভেজাতে হল। শেষ অবধি মৈজুদ্দি চাচা উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু একটা পা বরাবরের মতো অকেজো হয়ে গেল। শীতকাল হলেই মৈজুদ্দি চাচার ঐ পায়ে দগ্‌দগে ঘা হয়। আর তার ভীষণ যন্ত্রণা। সারা জীবন বেচারা না করতে পারল বিয়ে, না করতে পারল কারখানার কাজ।

দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল বা-জানদেরই কারখানায়। প্রথম লড়াই

লাগার বছরে। কারখানায় বা-জানই ওকে নিয়ে গিয়েছিল—হাতে ধ'রে নিজের মেশিনে কাজ শেখাবে ব'লে। একদিন ভোরেব দিকে প্লেন মেশিনে কাজ করতে করতে বা-জান তার মেশিনটা ছেড়ে দিয়ে বাইরে চা খেতে যায়। সেই সময় মৈজুদ্দি চাচা হঠাৎ দু:টা পেনিয়নের মাঝখানে পড়ে। তাতে তার হাঁটুর মালাইচাকিটা একদম গুঁড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় হৈচৈ পড়ে গেল। খবর পেয়ে বা-জান পাগলের মতো হয়ে ছুটে এল। তাকে কোলে ক'রে নিয়ে ছুটে যাওয়া, অ্যাম্বুলেন্স ডাকানো, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, তারপর দিনের পর দিন হাসপাতালে তাকে দেখা—সমস্তই করেছিল বা-জান : কিন্তু পা-টা মৈজুদ্দি চাচার জন্মের মতো খোয়া গেল।

ঐ পায়ে কারখানার কাজ তো আর চলবে না। তাই মৈজুদ্দি চাচাকে ভাইদের ব্যবসায় লাগতে হল। দাঁড়িয়ে ইস্ত্রি তো আর কবতে পারবে না। তাই তার কাজ হল সাহেবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড় আনা, কাপড় দেওয়া আর হিসেব-কেতাবের কাজ।

আমরা মৈজুদ্দি চাচা বলতাম না। বলতাম মৈজুদ্দি জাহু। চাচাও যা, জাহুও তাই।

মৈজুদ্দি জাহু শুত বাড়ির দলিজে। দলিজেরই ছোট্ট একটা দোজরায়, মানে কামরায়—মৈজুদ্দি জাহু থাকত।

মৈজুদ্দি জাহু যেমন আমাদের বাড়িতে আসত, আপদে-বিপদে দেখাশুনা করা, সান্ত্বনা দেওয়া—এমন পাড়ার আর কেউ করত না। মৈজুদ্দি জাহু খুব ভাল আরবী জানত। আমার বড় বুবু, মানে আমার দিদিকে কোরান শরীফ পড়াত; বাংলা ক'রে ব'লে ব'লে দিত। কী সুন্দর ক'রে যে পড়ত।

ছোট ছিলাম। কিন্তু দু একটা জায়গা এখনও আমার কানে লেগে আছে। মৈজুদ্দি জাহু বলত—'সেই যেখানে মহম্মদ আছেন মক্কায়, শেষ জীবনে কোরেশরা তাঁকে সমাজচ্যুত করেছে, তার কথা বলা হয়েছে, আয়েতে। বাংলায় আগে বলছি, শুনে নাও—'

তারপর বলত, 'তোমার রবের কাছ থেকে তোমার জাত যে অহী পেয়েছে, তুমি তার পয়রবি করো, তিনি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, আর মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।'

কিংবা যখন বলত, 'হে মহম্মদ, বলো যে আমি রাতপ্রভাতের প্রভুর কাছে—তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আর প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেই অন্ধকারের অপকারিতা থেকে, আর যেসব মেয়েমানুষেরা গিরায় ফুঁ দিয়ে জাহ্ করে তাদের অনিষ্ট থেকে, আর যখন হিংসুক হিংসা করে তার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাইছি।'

মৈজুদ্দি জাহুকে আরও এইজন্যে আমার বেশি ভাল লাগত যে, পাড়ার সবাই যখন বা-জানের কেচ্ছা ক'রে যা তা বলত, দেখেছি মৈজুদ্দি জাহুই একমাত্র যে সব সময় বা-জানের হয়ে লড়াই করত। এমন কি মৈজুদ্দি জাহুর বড় ভাই তোরাব চাচাও যখন দলিজে ব'সে বা-জানের বদ্‌নাম করেছে, মৈজুদ্দি জাহু তখনও বা-জানের হয়ে তর্ক করতে ছাড়ে নি।

একমাত্র মৈজুদ্দি জাহুই আমার বা-জানকে ঠিক বুঝত। তার কী দোষ কী গুণ জানত। তাই ফাঁক পেলেই আমি তার কাছে ছুটে যেতাম। যেখানে যত আঘাত পেয়েছি, যত দুঃখ পেয়েছি—আমাকে এমন ক'রে সান্ত্বনা দিয়েছে যে এক মুহূর্তে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। হয়ত বা-জানের দেওয়া কিংবা নিজের কেনা কাপড়জামা পরে বেরিয়েছি, পাঁচজনে খারাপ বলেছে। শুনে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। মৈজুদ্দি জাহু তারপর আমাকে মিষ্টি কথায় এই ব'লে বুঝিয়ে দিয়েছে—

'জানো বাবা, কোনো জিনিস কেনবার থাকলে আগে মনের মধ্যে ভাল ক'রে উল্টে পাল্টে নেবে—কত পয়সা, কী জিনিস, কোথায় পাওয়া যাবে। তারপর দেখেশুনে পছন্দ ক'রে নেবে। ব্যস, তারপর আর কোনো খুঁতখুঁত করা নয়। তখন যে যাই বলুক, তুমি মনে করবে এমন জিনিস আর হয় না।'

পাড়ার লোকের সঙ্গে মৈজুদ্দি জাহ্নর যত ভাবভালবাসা ছিল এমন আর কারো ছিল না।

মৈজুদ্দি জাহ্ন একটা কথা প্রায়ই বলত—

'বাবা বুলু, রোজ কেয়ামতের দিনে যখন কারো নেকিবদির হিসেব হবে, তখন খোদা দেখবে যে সে বহুৎ নেকি ক'রে গেছে—বদির চেয়ে হয়ত তার নেকির ওজন বেশি হবে। কিন্তু বাবা, কারো মনে যদি কষ্ট দাও, তাহলে খোদা অন্য শত বদি মাপ করলেও, মনে কষ্ট দেওয়ার গোনাহ্ কখনও মাপ করবে না। খোদা বলবে, যে লোকের মনে কষ্ট দিয়েছ, তার কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এসো।'

—কমরেড, আপনার পাইপটি তো বেশ।

বুধবার

পাইপটা যে উমা আমাকে পাঠিয়েছে, বাদশাকে সেটা বলা যেত। কিন্তু বাদশা যে জিগ্যেস করল না: গায়ে পড়ে বললে ও হয়ত মনে করত, 'বাপ্ রে! বিলেত-যাওয়া মেয়ে। অরবিন্দবাবু খুব ডাঁট নিচ্ছেন।' বাদশাটা দেখতেই ভালমানুষ। আসলে বেজায় মিটমিটে।

আমি কাউকে বলতে চাই না এইজন্যে যে, আমার সঙ্গে জড়িয়ে উমাকে নিয়ে কেউ কোনো জল্পনা করছে—এটা জানতে পারলে আমি মনে খুব ব্যথা পাব।

কল্পনা মানেই মিথ্যে নয়। তার ভেতর কোথাও না কোথাও বীজের আকারে লুকিয়ে থাকে একটা কোনো সম্ভাবনা। সোনার পাথরের বাটি কল্পনারও অযোগ্য। টাকার গাছ কিন্তু তা নয়। ভাবতে পারা যায়। কাজেই তার মধ্যেও সম্ভাব্যতা আছে।

উমার ব্যাপারটাও সেই রকম। ভাবাই যায় না। অন্তত আমি তো পারি না।

ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ খিদিরপুরে। আমি তখন সবে

ডকে যাতায়াত শুরু করেছি। ছাত্র আন্দোলনকে নাবালকদের ব্যাপার হিসেবে দেখবার জন্যে সে সময়কার রাজনীতিতে যতটা এগুনো দরকার ততটা এগিয়েছি। কাজ করি লেবার পার্টিতে। মজুরদের মিছিলে থাকি। পাশ দিয়ে ছাত্ররা মিছিল ক'রে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির চেনা বন্ধুদের দিকে করুণার চোখে তাকাই। ওরা সব মজুর শ্রেণীর কথা বলে। কিন্তু ওদের পার্টিতে মজুর নেই। পেটি-বুর্জোয়ায় ঠাসা। কথাটা প্রথম বলেছিলেন কমরেড তেওয়ারী। বলেছিলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে আসলে ওরা চালাচ্ছে ভেজাল মার্ক্সবাদের কারবার। আসল বলশেভিক আমরা। ওরা বুর্জোয়াদের হাতধরা হয়ে চলতে চায়। তাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ওদের মানে না। কোথাও ভারতীয় পার্টির নাম পর্যন্ত করে না। আমরা ব'সে নেই। পোর্টফোলিওতে ক'রে থিসিস নিয়ে আমাদের লোক বিলেতে গেছে। এবার এখানকার গোটা ব্যাপারটা ওরা জানতে পারবে। আমরা মামলা রুজু ক'রে দিয়েছি। রায় আমাদের পক্ষে যাবে। তখন ঐ সাইনবোর্ড আমরা পাব।

এরপর কমিউনিস্টদের থাকবে একটিই পার্টি—লেনিনের এই নির্দেশ প্রসঙ্গে তেওয়ারীর এই একটি বক্তৃতা আমাদের সব সন্দেহ সংশয় ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম সেই তেওয়ারীর হাত ধ'রেই আমি একদিন পুলের নিচে খালধারের এক মুসলমানী নোংরা চা-খানায় ঢুকেছিলাম। চারদিকে গিজগিজ করছে ডকের কুলি, জাহাজের খালাসী। সেখানে একটা টেবিলে দেখি, অবাক কাণ্ড! কাঁধে-ব্যাগ-ঝোলানো ভদ্র ঘরের এক কলেজে-পড়া মেয়ে। সামনে গিয়ে বসবার আগে পেছন থেকে মেয়েটির গলা থেকে অম্লানবদনে যে বাক্যটি বেরিয়ে আসতে শুনলাম, তাতে আমার ভিরমি লাগার যোগাড়। একজন মজুর কমরেডের কাঁধে হাত দিয়ে মেয়েটি বলছিল—'ও শালা সর্দার একের নম্বরের হারামী। আলাপ করাবার সময় হাত বাড়িয়ে দিল। আমি

তখনও জানি না এসব ক্ষেত্রে হাতে হাত ঠেকাতে হয়। আমি বোকার মতো হাত মুঠো ক'রে তুলে বলেছিলাম—লাল সেলাম!

এই তাহলে সেই উমা! আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলনে যে পুলিশের লাঠি খেয়েছিল! লেকে ব'সে সিগারেট খেতে, রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যেতে যাকে আমার ক্লাসের অনেক ছেলেই দেখেছে—সেই উমা।

সেই প্রথম দিনেই আমার পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে উমা বলেছিল—'গরু খেয়েছেন?' খাই নি শুনে তেওয়ারীকে হুকুমের স্বরে বলেছিল, 'ওকে এক্ষুনি শিককাবাব খাইয়ে দাও।' গরুর কথা শুনে তাড়াতাড়ি বললাম—আজ আমার পেটটা খুব খারাপ। উমা তার উত্তরে হোহো ক'রে -মেয়েদের যেভাবে হাসা উচিত নয়—সেইভাবে হেসে উঠে বলল, 'গরু শুনলে সব হিন্দু কমরেডেরই পেট খারাপ হয়।'

উমার কথা বলার ধরনে পরে আমার খুব রাগ হয়েছিল। 'শালা' বা 'হারামী' বলার জন্যে নয়। কেননা প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পরই আমি বুঝেছিলাম যে, আমার আগে ও পার্টিতে আসায় শ্রমিক শ্রেণীকেও ঢের বেশি নিজের ক'রে নিতে পেরেছে। আমার রাগ হয়েছিল ওর বলার ধরনটার জন্যে। ওর চেয়ে বয়সে যে আমি বড়, সেটা ওর মনে রাখা উচিত। বয়সে যে বড়, তার পেটে ওভাবে খোঁচা মেরে কথা বলা উচিত নয়। কমরেড বলেও যার যেমন বয়স তার সঙ্গে সেইভাবে চলা উচিত।

উমা যে লাহোরে মানুষ, ওর বাবা যে সাহেবভাবাপন্ন—পরে সে সব জানতে পেরে আমার রাগ প'ড়ে যায়।

এরপর ছাত্রদের মজুর শ্রেণীর আওতায় টেনে আনার জন্যে আবার আমাকে ছাত্র আন্দোলনে ফেরত পাঠানো হল। ওদিকে যুদ্ধ বেধে গেল। দল থেকে বলা হল— এবার খণ্ড খণ্ড লড়াই থেকে যেতে হবে সর্বাত্মক লড়াইতে। দিকে দিকে গড়ে তোলো সংগ্রাম সমিতি। কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা নেতৃত্ব নাও।

বলা হল, অ্যাক্‌শন করো। পকেটে গরম জলের বোতল রাখো। পুলিশ এলে পুলিশের গায়ে ঢেলে দাও। তাহলেই লড়াইয়ের নেতৃত্ব মুঠোয় এসে যাবে।

পকেটে বোতল রাখার ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। পকেটে বোতল না হয় রাখাই গেল। কিন্তু সে জল কতক্ষণ গরম থাকবে? তাহলে কি ফ্লাস্কে জল রাখতে হবে? পকেটে বোতল যদিও বা রাখা যায়, ফ্লাস্ক আঁটানো অসম্ভব। পকেট বাদ দিলে সংশোধনবাদ হয়ে যাবে না তো?

বেশ বুঝতে পারছি পুরনো কথা আজ লিখতে গিয়ে অনেক গম্ভীর জিনিসকে আমি হালকা ক'রে ফেলছি। তাছাড়া পুরনো দল ছাড়ার পেছনে কি আমার ছোট দল থেকে বড় দলে যাবার লোভ একেবারেই ছিল না? আমি দল ছেড়েছি কি নিছক মতে মিলল না ব'লে?

পরে আমার মনে হয়েছে উমা আমার সম্বন্ধে সেই রকমেরই কিছু একটা ভেবেছিল। রাস্তায় একদিন দেখা হওয়ায় বলেছিল—আমি যদি ছাড়ি, তাহলে একেবারেই ছাড়ব। বড় গাছের ডালে বাসা বাঁধব ব'লে নয়।

পরে সত্যিই ছাড়ল এবং একেবারেই ছাড়ল।

উমা একটু ভুল করেছিল। দল যত ছোটই হোক, ছাড়া সহজ নয়। বরং দল যত ছোট হয় ছাড়াটাও হয় তত কঠিন। দলবদলের ব্যাপারটাও ঘটে ঠিক এর উল্টো। যে পার্টি যত বড়, তার সঙ্গে নতুন ক'রে নিজেকে মানানোর ব্যাপারটাও হয় তত শক্ত। উমা শুধু ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু একবার ছেড়ে দিয়ে পরে যখন ধরতে যাবে তখন ঠেলাটা বুঝবে।

ওর বিয়েটা যে ভেঙে গেছে, সে ব্যাপারে আমি কিছু বলব না। কেননা ওরা দুজনেই আমার বন্ধু। হয়ত এ গোলমাল হত না যদি ওর বিয়ের সঙ্গে ওর বোনের বিয়েটা ওভাবে জড়িয়ে না যেত। একটা সামাল দিতে গিয়ে নিজের অনেকখানি ওকে বরবাদ ক'রে দিতে হল।

উমা জানে না যে, আমি সেটা জানি। তার সেই ব্যথার জায়গায় আমিও কখনও হাত দিতে যাব না। ছেলেটাকেই বা আমি দোষ দিই কী ক'রে? বরং আমি বলব, উমার সামনে ও কখনও মুখোশ এঁটে দাঁড়ায় নি। ও যা করেছে খোলাখুলি।

এই পর্যন্ত লেখার পর আমার মাথায় একটা নাটকের আইডিয়া আসছে। স্থানকাল পাত্রপাত্রী সমস্তই হবে একটা বিয়েবাড়িকে ঘিরে। দুজন বিয়ে করছে। আর দুজন বিয়ে হওয়ার প্রতীক্ষায়। দ্বিতীয় বিয়েটি ঠেকিয়ে রাখলে তবেই প্রথম বিয়েটি হতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, প্রথমটি হয়ে যাচ্ছে ব'লে দ্বিতীয়টি আর ঠেকে থাকবে না। কিন্তু প্রথমটিতে রয়েছে দ্বিতীয়টির ভাঙনের বীজ। আবার দ্বিতীয়টি ভাঙলে তার ধাক্কায় গোড়ারটিও ভাঙবে। কিন্তু সব কিছু হচ্ছে একটা হৈচৈ আনন্দ আর ধুমধামের ভেতর দিয়ে। একমাত্র নাট্যকার জানে এর অমোঘ পরিণতির কথা। বর্তমানে থাকবে ভবিষ্যতের ছায়াপাত। আনন্দের মধ্যেও করুণ সুরে শানাইয়ের একটা সুর বাজবে। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শোকাবহ ক'রে তুলতে আমি রাজী নই। জোড় বাঁধার মধ্যে বন্ধন আর জোড় ভাঙার মধ্যে মুক্তি। তারও একটা আভাষ যেন থাকে।

বিয়ের পর যত বার আমি উমাদের ডেরায় গিয়েছি, পেটে আঙুল দিয়ে অবশ্য খোঁচা দেয় নি। দিয়েছে অন্য ভাবে। কখনও বলেছে, 'যা ছিরির চেহারা, কোনো মেয়ে তোমার দিকে ঘেঁষবে না।' কখনও বলেছে, 'যা একটা হাড়গিলের মতো চেহারা বানিয়েছ।'

একবার গিয়েছিলাম বিয়ে ভাঙার পর আরেক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। ও তখন একা থাকে। দরজা খুলেই বলল, 'কি হে, চান্স নিতে এসেছ?'

আমি তখন খুব লাজুক আর মুখচোরা ছিলাম। কিছু বলতে পারতাম না। কিন্তু মনের মধ্যে বিঁধে থাকত। বিশেষ ক'রে, আমার চেহারা নিয়ে ওর খোঁটাগুলো।

হঠাৎ মনে পড়ল আমার একটা ছোট আয়না ছিল। সেটা ভেঙেছে আজ এক বছর আগে। আয়না না দেখে আমি এখন দিব্যি দাড়ি কামাতে পারি। নিজের চেহারার কথা এখন আমি অনায়াসে ভুলে যেতে পারি।

কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে গিয়েও আমার পুরনো স্মৃতি-গুলোকে খুঁচিয়ে তোলার জন্যেই কি উমা আমাকে এই পাইপটা পাঠিয়েছে? ওর খোঁচা দেওয়ার স্বভাবটা এখনও গেল না!

বাদশার কথা

ছেলেবেলায় খেলার মাঠের চেয়ে আমাকে বেশি টানত তোরাব চাচার দলিজ। সেখানে বসত পাড়ার বড়দের গল্পগুজবের আসর। ভিড়ের মধ্যে এককোণে আমি চুপটি ক'রে ব'সে থাকতাম। কেউ আমাকে কিছু বলত না। মোড়লদের অনেকেই সে আড্ডায় থাকত।

মোল্লাপাড়ায় সে সময়ে একটা লাইব্রেরি হয়েছিল। তার নাম সবুজ মোসলেম সমাজ। সেখান থেকে সমাজসেবার নানা কাজও হত। শরিফ মণ্ডল ছিল বেশ সমঝদার লোক। সে ছিল হাজী-পাড়ার পাণ্ডা। তার বই পড়ার খুব নেশা। তোরাব চাচার দলিজে বসে অনেক সময় সে নাটক-নভেল পড়ে শোনাত। একবার পড়েছিল পাঁচকড়ি দে-র 'লোহার বাঁধন'।

বইটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আপনি পড়েন নি? গল্পটা আমার মনে আছে। এক গরিব ব্রাহ্মণের এক কচি মেয়ে ছিল। এক বুড়ো কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বুড়ো মারা গেলে মেয়েটি বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। সেই সময় তার এক ছোট ভাই হয়। তারপর তার মা বাবা দুজনেই মারা যায়। তখন কী করবে? নিরুপায় হয়ে ছোট ভাইকে বুকে ক'রে আবার সে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে। বৌকাঁটকি শাশুড়ি তাকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দেয়। বাড়িতে থাকে ঠিক দাসীবাঁদীর মতো। বদলোকে

চেষ্টা করে তার অসহায়তার সুযোগ নিতে। তার ভাইকে সবাই ধ'রে ধ'রে মারে। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে ভাইটি বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারপর সে এক সাধুর দেখা পায়। সেই সাধুর দয়ায় অনেক ধনরত্নের অধিকারী হয়ে দিদির কাছে সে ফিরে আসে। তারপর দুই ভাইবোনে মিলে একটা আশ্রম বসিয়ে গরিব দুঃখীদের সেবায় নিজেদের জীবন ঢেলে দেয়। দলিজে দলিজে এই পুঁথি তখন পড়া হত।

সে সময়ে পাড়ায় যারা পড়ার লোক ছিল, তাদের কী খাতির! যে বাড়িতে পুঁথি পড়া হবে, সে বাড়িতে চা-টা হবে, রীতিমতো মজলিস লেগে যাবে। মহরমের চাঁদের সময়ই পুঁথি পড়ার রেওয়াজ বেশি। পড়া হবে সোনাভানের পুঁথি, পড়া হবে সোরাব-রুস্তম। যাতে বেশি ক'রে থাকবে হাসানহোসেনের কথা, কারবালার কথা। লোকে শুনবে আর হা হুতাশ করবে। এই সময়টাই হবে পুঁথি পড়ার মরশুম।

তোরাব চাচার দলিজে আমাকে কি আর এমনি এমনি ওরা বসতে দিত? আমি না হলে কে ওদের ফাইফরমাশ খাটবে? আড্ডার লোকদের দফে দফে তামাক সেজে দেওয়া, পান এনে দেওয়া —এসব আমাকেই করতে হত। তার জন্যে সবাই আমাকে খুব পছন্দ করত।

আড্ডায় হত একেকদিন একেকরকম গল্প। কে কবে কোন্ মেলায় গিয়ে কী কী মজার জিনিস দেখেছে। পুরনো জমানা কার আমলে কেমন ছিল। কোম্পানির বাগানে দপ্তরীর কাজ করত কেরামত মণ্ডল, তার ঝুলিতে সব সময়ই একটা না একটা গল্প থাকত। কেউ টকী দেখে এসেছে। কেউ গিয়েছিল চিৎপুরের মনমোহন থিয়েটারে। তার গল্প। পীর ওয়ালীআল্লা। হুরী পরী জীন। তার রকম রকম গল্প। সেই সঙ্গে ভোট। মিউনিসিপ্যালিটি। অমুক সাহেব। তমুক বাবু। যতসব রাজাউজীর মারা গল্প।

আমার বেশ লাগত। ব'সে ব'সে শুনতাম। অন্য ছেলেরা তখন কেউ ওড়াচ্ছে ঘুড়ি, কেউ খেলছে লাট্টু, কেউ কপাটি, কেউ বুড়িবসন্ত। কেউ টল খেলছে। টল জানেন তো? মারবেল। আমি ছিলাম খেলাধুলোয় ওঁছা। ফলে, কেবল মার খেতে হত। কাজেই ছোটদের ছেড়ে দিয়ে আমি বেছে নিয়েছিলাম বড়দের আড্ডা।

আমাদের ওদিকে আট দশ বছরের ছেলেরা সবাই বিড়িসিগারেট খেত। তখন হাওয়া গাড়ি সিগারেট পাওয়া যেত এক পয়সায় এক প্যাকেট।

আমিও ঐ বয়সে বিড়িসিগারেট খেতে শিখেছিলাম। পাড়ায় ভুষিমালের দোকান যার, তার মেজো ছেলের সঙ্গে ছিল আমার খুব ভাব। আমরা এক বয়সী। এক ইস্কুলেই পড়তাম। দুজনে জঙ্গলে গিয়ে বিড়িসিগারেট খেতাম। একদিন গোলাম আলির দোকানের সামনে খানসামার বাগানে ব'সে সন্ধ্যের একটু আগে আমরা তিন বন্ধুতে মিলে বিড়ি খাচ্ছি। আমাদেব দেখতে পেয়ে গেল আমার খালু আর গোলাম আলি। সেদিন আমাদের দলে ছিল গোলাম আলির ছেলে। ব্যস্ সে এক চব্বর বেধে গেল। গোলাম আলি তার ছেলেকে এই মারে তো সেই মারে। 'শ্‌শালার ছেলেকে আজ মেরেই ফেলব। যত সব হাড়হাবাতে ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিড়ি খেতে শিখেছ?'

আমার খালু বলল, 'এইসব ছোটলোকের ছেলেরা কুরকুণ্ড মেরে থাকে কেন? বাড়তে পায় না কেন? অল্প বয়সে বিড়ি খায় ব'লে। আর ভদ্দর লোকদের ছেলেদের দেখ—কী রকম বাড়বাড়ন্ত। বিশ বছর বয়সের আগে সিগারেট খাওয়া উচিত নয়।'

কথাটা আমার খুব মনে লাগল। সত্যি তো! বিশ বছর বয়স হওয়ার আগে বিড়িসিগারেট খেলে তাহলে তো আমিও বাড়তে পারব না, বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না!

ব্যস, সেইদিন থেকে বিড়িসিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলাম, সেই থেকে বিড়ির ওপর একটা ঘেন্না জন্মে গেল। আধপোড়া বিড়ি দেখলে এখনও গা ঘিনঘিন করে।

বা-জান খুব পান খেত আর বিড়ির টুকরোয় পানের দাগ লেগে থাকত। বা-জানের তক্তাপোশের নিচে বিড়ির টুকরোগুলো স্তূপাকার হয়ে থাকত।

আমার এত ঘেন্না করত যে সেদিকে চাইতে পারতাম না।

বৃহস্পতিবার

আজ খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। লক-আপ খোলার ঢের আগে। ফলে, বাধ্য হয়ে ঘরের টুকরিটা নোংরা করতে হল। দরজার গরাদে কম্বল লাগিয়েছিলাম, সেটা খুলে পাট করতে গিয়ে একটু হাঁফ ধ'রে গেল। আসলে এখন দরকার ধীরসুস্থির হওয়া। কোনো কিছু হুটপাট ক'রে না করা। আজ যখন সিঁড়ি দিয়ে নামব, খুব আস্তে নামতে হবে। ওঠবার সময় এখন এমনিতেই সাবধান হয়েছি। এখন আর একসঙ্গে দুটো ক'রে ধাপ উঠি না।

যেটা সবচেয়ে খারাপ লাগে, সেটা ঐ একঘেয়ে ভাব। 'কারখানা'টা বসিয়ে, এখন মনে হচ্ছে, কাজের মতো একটা কাজ হয়েছে। সত্যি বলতে কি, সারাদিন আমি ঐ 'কারখানা'র জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকি। এখন দেখছি, জীবনের সব বাসনা তো ঐ এক রসনায় এসে ঠেকে গেছে। না খেয়ে এদিকে যত শুকোচ্ছি, যত ছিবড়ে হচ্ছি—রস তত উপচে পড়ছে।

'কারখানা'য় এ পর্যন্ত যে যা বলেছে, তাতে মনে হচ্ছে দুনিয়ায় কিছুই যেন অখাদ্য নয়। আমার খুব ইচ্ছে হয় আমাদের আসরে বংশীকে ডাকতে। বংশীটা একা একা থাকে। সঙ্গী বলতে এক ঐ জামাল সাহেব। বংশী জোয়ান ছেলে। সারাদিন কি আর বুড়ো মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে?

ইদানীং দেখছি, জেলের এত সব দায়িত্ব নিয়ে নিয়ে ও কেমন বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে। এ জেলে আমিই ওর সবচেয়ে বেশি বন্ধু। অথচ হাঙ্গার-স্ট্রাইকের আগে অবধি এক ওয়ার্ডে থেকেও ওর সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হত না। ওকে সারা জেল চরকির মতো ঘুরতে হত। হবে না? জেল কমিটিকে শুধু তো ডেটিনিউ নয়—আমাদের যারা আণ্ডার ট্রায়াল, সাজা হয়ে যারা কয়েদ খাটছে, সবাইকে দেখতে হয়। দেখা বলতে প্রত্যেকের সুখসুবিধের ব্যবস্থা করা তো আছেই, সেই সঙ্গে তাদের সবাইকে সামলানো, রাজনীতিতে তালিম দেওয়া, মন চাঙ্গা রাখা।

এ বছরটা যে কি গেছে। এক সময়ে মনে হয়েছিল বাইরে আর কেউ রইল না। সেই যখন রেলের চাকা বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা ঘটল। বাঁধভাঙা জলের মতো লোক আসছে তো আসছেই!

আমার কিন্তু কমলের ব্যাপারে এখনও কেমন যেন সন্দেহ হয়। ও যে পুলিশের লোক, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। অথচ পার্টি যে সূত্রে খবর পেয়েছে বলছে সেও তো উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। নাম বলে নি, কিন্তু যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে কমল না হয়ে যায় না।

খাঁকি জামার ব্যাপারটা আমি জানি। আমি ধরা পড়ার মাত্র কয়েকদিন আগে ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে কমলের সঙ্গে আমার দেখা হল। কমল ছিল মহা পেটুক। বলেছিল আমাদের বাড়িতে একদিন কচ্ছপের মাংস সাঁটাবে আর আমরা পুরনো কিছু বন্ধুতে মিলে সারাদিন আড্ডা দেবার পর সিনেমায় যাব।

ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে ও তখন চাকা বন্ধের ব্যাপারে বেজায় ব্যস্ত। নেতাদের মধ্যে একমাত্র কমলই তখন বাইরে রয়েছে।

খাঁকি জামা ব'লে নয়। দেখলাম ওর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। অত যে খেতে ভালবাসে, সেই কমল একটা টোস্ট দূরের কথা চা পর্যন্ত খেল না। টেবিলে আর কেউ ছিল না। বলল, 'চা-সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি আজ একমাস।' কমলের চা-

সিগারেট ছাড়া, এ সত্যিই ভাবা যায় না। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'কাল আণ্ডার গ্রাউণ্ডে যাচ্ছি। আর হয়ত দেখা হবে না।' তার মানে, এই একমাস ধ'রে আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কষ্টের জন্যে নিজেকে ও তৈরি করেছে। আমি একাই চা খেলাম। কিন্তু ওর সামনে সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল না।

সেই কমল এই এক বছরে পুলিশের লোক হয়ে গেল?

কমলকে আমি প্রথমে দেখি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। তখনও আমি পার্টিতে আসি নি। কমল ছিল প্রেসিডেন্সির নামকরা ছাত্র। কী একটা বিষয় নিয়ে ইংরিজিতে মক্ পার্লামেন্ট হচ্ছিল। বংশীও তাতে ছিল। সামনের দিকে দ্বিতীয় কি তৃতীয় সারিতে একজন থেকে থেকে উঠে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলছিল। তার বলার ধরন আর চোখা চোখা কথা আমার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছিল। পাশের একজনকে জিগ্যেস করায় বলেছিল, 'চেনেন না? বাপ্‌রে—কমল কর!' নাম বিলক্ষণ জানা। যত দূর মনে পড়ে, ম্যাট্রিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে হয়েছিল।

এরপর যাকে বলে জমিয়ে আলাপ, সেটা হয় মুর্শিদাবাদে। বাড়িতে ও তখন ইন্টার্ন হয়ে আছে। সন্ধ্যে থেকে রাত্তির অবধি খেলার মাঠে ব'সে আমরা আড্ডা দিতাম। সেই একটা মাস আমার খুব আনন্দে কেটেছিল। কমলের বাড়ির অবস্থা ভাল মানে খুবই ভাল ছিল ব'লে জানতাম। ইচ্ছে করলে কত কিছুই তো ও হতে পারত। সেই কমল পুলিশের লোক হবে?

হালে বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের কাউকে কাউকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেছি। ওর এখনকার খবর কেউ কিছু দিতে পারে নি। শুধু একজন বলেছিল, ওকে নাকি কে একজন কোহিমায় দেখেছে। সেখানে এক গ্রামে মাস্টারি করে।

বাইরে কি সব যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে থেকে তার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কমল যদি পুলিশের লোক

হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। বংশী তো ছার। এমন কি নিজেকেও নয়।

কিন্তু কমল তাহলে দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে কোহিমায় গিয়ে গ্রামের একটা সামান্য মাস্টারিই বা নিতে যাবে কেন?

বাদশার কথা

আমাদের বাড়িতে ছিল দুটোমাত্র কামরা। একটা কামরায় মা আর বা-জান। খুব ছোটতে আমরাও থাকতাম। আরেকটা যে কামরা, তার পেছনের অর্ধেকটা দেয়াল পড়ে গিয়েছিল। পরে সে জায়গায় ছিটেবেড়া দেওয়া হয়। সেই ঘরে থাকত বুবু আর বড় বুবু। পরে আমরা যখন একটু বড় হয়ে বা-জানের ঘর থেকে এ ঘরে এলাম তখন বুবুর জন্যে হেৎনেয় একটা হোজরা তুলে থাকার ব্যবস্থা হল। রান্নার জায়গা ছিল বহু পুরনো একটা রান্নাঘরে। সেখানে বর্ষায় জল পড়ত। তাই রান্না হত উঠোনে। বৃষ্টির সময় ঘরের ভেতর উঠোচুলোয়। মানে তোলাউনুনে রাঁধা হত। রান্না ভাততরকারি থাকত আমাদের শোবার ঘরে। রান্নাঘরে থাকত হেঁশেলের জিনিসপত্তর।

আমাদের বাড়িটা কিন্তু আমার বাপদাদার তৈরি নয়। এ বাড়ি ছিল বুবুর, মানে আমার ঠাকুমার ভাই রফিক দাদার। আগে ছিল গোলপাতার ঘর। টিনের ছাউনি যে কবে হয়েছে আমরা জানি না। তবে আমাদের জ্ঞানে নয়। যুদ্ধের আগে কিংবা পরে একবার টিনের দাম খুব পড়ে যায়। বা-জান টিন কিনবে ব'লে সেই সময় বাড়ির দলিল বাঁধা রেখে তারু ঠাকুরের কাছ থেকে দেড় শো টাকা ধার করে। মাসের ঠিক গোড়ায় তারু ঠাকুর আসত সুদের টাকা আদায় করতে। তারু ঠাকুরের আসল নাম তারাদাস। লোকে বলত তারু ঠাকুর। আমরা ঠাট্টা ক'রে বলতাম তাড়ু ঠাকুর। একটা সাদা খাতা ছিল, রসিদ লিখে লিখে সেটা ভ'রে গিয়েছিল। তারপর

হাতচিঠিও ভ'রে গেল। তারু ঠাকুর মারা যাওয়ার পর পাওনাদার হিসেবে আসত তার ছেলে। পরে আমরা চাকরিতে ঢুকে এক শো পঁচিশ টাকায় রফা ক'রে সেই দেনা যখন শোধ করি তখন দেখা গেল শুধু সুদ বাবদই ওদের দেওয়া হয়েছে দুশো তেষট্টি টাকা। বাড়ি বন্ধকের দলিল এতদিনে ছাড়াতে পেরে বাবার সেদিন কী আনন্দ। আমাদেরও খুব ভাল লাগছিল। কেননা ছোট থেকে 'দলিল' কথাটা শুধু শুনেই আসছিলাম। দলিল যে কী তা এই প্রথম দেখলাম। ব্যাপারটা মিটমাট ক'রে দেয় বা-জানের বন্ধু কদম রসুল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা বা-জান তাকে পেট পুরে খাইয়ে দিল।

তারপর হল আমার দাদার বিয়ে। তখন দাদাকে ঘর ছেড়ে দিয়ে আমাদের থাকার জায়গা হল হেংনেয়।

বা-জানদের কারখানায় সুদে টাকা খাটাত এক পাঞ্জাবী জমাদার, রিবিটম্যান হারান মিস্ত্রি, বাইসম্যান ভূষণ পাল আর পাইপঘরের নিতাই মিস্ত্রি। এদের সকলের কাছ থেকেই বা-জান টাকা ধার করত। কারখানায় বড় সায়েবের ঠিক পরেই ছিল জমাদার ব্যাটার প্রতাপ। ধার দিয়ে সে যেন সকলের মাথা কিনে নিয়েছে, এই ভাবে কথাবার্তা বলত। বা-জান যেদিন ধার পেত না, সেইদিন মা-র কাছে এসে ধার চাইত। না দিলে বেধে যেত দুজনে তুমুল ঝগড়া। পয়সা আদায় ক'রে ছাড়ত বুবুর কায়দায়। 'ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলো তো—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

চটেমটে পয়সা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মা কাঁদতে বসত—'এমন পুরুষমানুষের পাল্লায় পড়েছি, এমন পুরুষমানুষের ঘর করতে হল যে, খোদা আমার কপালে সুখ ব'লে কিছু লিখল না। একদিন একটা ভাল কুর্তো পর্যন্ত পেলাম না। চিরদিনটা আমার জ্বলতে জ্বলতে গেল। একটা সুখসাধ পর্যন্ত মিটল না কোনো দিন।'

সত্যি। আমরা মায়ের গায়ে কোনোদিন একটা নতুন গহনা দেখলাম না। শুধু হাতে দায়মালকাটা, যাকে আপনারা বলেন

ডায়মণ্ডকাটা—তিনগাছা ক'রে রুপোর বাতানা। একেবারে ক্ষয়ে-যাওয়া। কবে যে গড়া হয়েছিল কে জান। মাকে বা-জান শাড়ি এনে দিত একখানা ছিঁড়ে গেলে তবে আরেকখানা। চোদ্দ আনা একটাকা দামের কালোপাড় কি লালপাড়, বোয়েম পাড় কি রসগোল্লা পাড় শাড়ি। তাও অনেক ব'লে ব'লে তবে আসত। বা-জান নিজে কোনোদিন একটা কুর্তো পর্যন্ত দেয় নি। মাঝে মাঝে ছোট মামু মাকে দিয়ে যেত ছাঁট কাপড়ে তৈরি কুর্তো। মার মুখের দিকে চেয়ে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হত ঈদপার্বণের সময়।

আর কষ্ট হত সোবরাত, মানে সবের রাতের সময়। তখন সব বাড়িতে ধুমধাম। পাড়ার লোকে একেক বাড়িতে কম ক'রে একেক ঢেঁড়ি তুবড়িবাজি আনত। ছেলেদের কী ফুর্তি।

মা এই নিয়ে বা-জানের সঙ্গে ঝগড়া করত। আমরা বা-জানকে ভীষণ ভয় করতাম। কথা বলব কি, সামনে যেতেই ভরসা পেতাম না। বড় বুবু মাঝে মাঝে গিয়ে সুপারিশ করত। কখনও কাল্লুমামা গিয়ে ধরত। তখন হয়ত বা-জান আমাদের হাতে আটগণ্ডা পয়সা দিত।

মা আর বা-জানের ঝগড়ার রকম দেখে আমরা ধরতে পারতাম ঈদের আর দেরি নেই, মা হয়ত বলতই, 'আকবরের জন্যে অমুক, বুলুর জন্যে অমুক চাই, এটা না এনে দিলে হবে না।'

বাবা করত কি, এর জামাটা ওর কাপড়টা টান দিয়ে দিয়ে বলত, 'এই তো ঠিক আছে, এটা কাচিয়ে ইস্ত্রি ক'রে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। সব লবারের বাচ্ছা হয়েছেন।'

ঈদের এক হপ্তা আগে থেকেই পাড়ার ছেলেরা কেউ নতুন টুপি, কেউ নতুন জামাজুতো কিনে এনে দেখাত—'ছাখ বুলু, আমার আব্বা কেমন কিনে এনেছে আমার জন্যে।' আমাদের তো দেখবার মতো কিছু থাকত না, তাই খুব কষ্ট হত। যদিও বা কোনোবার কিছু পেতাম, সেও ঈদের ঠিক মুখে। ঠিক আগের দিন। তখন আর দেখাবার সুযোগ থাকত না।

বড় বুবু কিছুটা বাংলা লেখাপড়া শিখেছিল। বড় বুবু সেই মধুবিধুর কবিতাটা পড়ে শোনাত। 'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি—'। রায়বাবুর বাড়ি গিয়ে কেঁদেকেটে মধু নতুন জামাকাপড় পেল, কিন্তু তার ভাই বিধু বাপের দেওয়া মোটা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকল। মনে মনে নিজেকে বিধু ভেবে গর্ব হত। আমরাও তো গরিবের ছেলে।

বা-জান একবার ছোটবেলায় লাল শস্তা তুর্কী টুপি কিনে দিয়েছিল—ফতালির ফকিররা যা পরত। ফতালির ফকির বলতে নিচুস্তরের ফকির। বছর বছর সেই টুপিই আমাদের পরতে হত। দূর থেকে আমাদের আসতে দেখলে ছেলেছোকরা, এমনি কি বড়রাও আঙুল দেখিয়ে বলত, 'ত্যাখ্ ত্যাখ্ ফতালির ফকিররা আসছে,' 'ত্যাখ্ ত্যাখ্, ফকিরের বাচ্চারা আসছে।'

এ সব ব্যাপারে দাদা ছিল খুব বুঝদার। যদিও গোঁয়ারগোবিন্দ আর রাগী লোক ছিল। নিজে উড়ুনি প'রে আমাদের সে নতুন জামাকাপড় কিনে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করত। আমাদের কাঁদতে দেখে মা বলত, 'বাব', করবি কি দেখতে তো পাচ্ছিস সংসারের অবস্থা! তোরা একটু বুঝতে শেখ। বড়সড় হ', মানুষ হ'। উপায়-সুপায় কর। সব দুঃখ ঘুচবে।' কখনও আবার রেগে গিয়ে বলত, 'বেরো, বেরো—এ সংসারে এসেছিলি কেন? আমি আর এ দেখতে পারি নে।' বা-জান যখন থাকত না, তখন বলত, 'ত্যাখ্ তো, মানুষটা খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছে, তোদের জন্যেই তো এত কাণ্ড করছে।'

মাকে কাঁদতে দেখে, কখনও পাড়ার গিন্নীবান্নি কখনও মৈজুদ্দি জাদু, কেউ বলত বৌ কেউ বলত বুবু, এসে বোঝাত, 'কেঁদে কী করবে বলো—সবুর করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এই যে তোমার ঘরে খোদা এতগুলান মানিক দিয়েছে, এই মানিকদের মানুষ করো। তোমার তখন আর দুখ্যুকষ্ট থাকবে না।'

মা তখন আমাদের দিকে কি রকম একটা চোখে যে তাকাত!

খুব সাধারণ লোক। তাদের মধ্যে একেকজন এত সুন্দর কথা বলতে পারে!

আমি যে আগের জেলটাতে থাকতাম, সেখানে এক বুড়ো কয়েদী ছিল। তার নাম শেখ বাঙাল। দেশবন্ধু যখন জেলে ছিলেন, ওর জেলখাটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। সেই যে জেলে আসা ধরেছে আর ছাড়ে নি। সেই যে পকেটমার হয়ে জীবন শুরু করেছিল, আজও সেই পকেট মারই থেকে গেছে।

শেখ বাঙাল একদিন বলছিল দাশবাবুর গল্প।

'বাবুর খুব বায়োস্কোপের শখ ছিল।'

'কি রকম?'

'বাবুর বাড়ি থেকে আটদশ তাল মিছরি আসত। লক-আপের আগে রোজ বিকেলে জানলার ধারে ব'সে সেই মিছরি বাবু ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত মাঠে জড়ো-হওয়া কয়েদীদের দিকে। আর তারা ছোটাছুটি শুরু ক'রে দিত আর কাড়াকাড়ি ক'রে খেত।

শেখ বাঙাল বুড়ো আর হামিদ ছিল ছোকরা। যারা হজ করতে যায়, তাদের টাকা পয়সা হাতানোর ব্যাপারে একদল বিশেষ চোর থাকে, হামিদ সেই দলের। বাকি দিনগুলোতে যে পকেট মারে। শেখ বাঙাল হামিদকে বলত, তোরা পকেট মারার কী জানিস— আজকালকার ছোকরা?'

হামিদ দমবার পাত্র নয়। বলত, 'হুঁঃ, তোমাদের জমানা তো ছিল ভারি ডিব্‌রিবাতির জমানা। আর এখন? এ হল বিজলী-বাতির জমানা। বুঝলে?'

আর বলত, 'তুমি বাঙাল হয়ে, চাচা, এখানে কেন? কলকাতা বড় শক্ত ঠাঁই। পদ্মাপারে যাও। এখনও ভাল ভাল মক্কেল পাবে।'

শেখ বাঙাল মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসত।

ওর ঐ 'বাবুর খুব বায়োস্কোপের শখ ছিল'টা, সত্যি, ভোলা যায় না।

সকালে একটা বিশ্রী খবর শুনলাম আমাদের ফালতু হরির মুখে। হরিটাও একটা রাম মিথ্যুক। তার কারণ আছে। আমরা যখন প্রথম এ জেলে আসি, হরি তখন এ ওয়ার্ডের ফালতু। হরির মতো এরকম মানুষ আমরা ফালতুদের মধ্যে কম দেখেছি। দেখিনিও বলা যায়।

আজ পর্যন্ত কোনো ফালতু আমাদের কোনো জিনিস চুরি করেছে, প্যাকেট খুলে না ব'লে একটিও সিগারেট নিয়েছে—আমার জেল-জীবনে আমি বড় একটা দেখি নি। অথচ আমরা ঘরে থাকি না। টেবিলে পেন ঘড়ি সিগারেট দেশলাই সমস্তই খোলা প'ড়ে থাকে। জেলের বাইরে এ জিনিস ভাবা যায় না।

কাজেই হরি যে কখনও চুরি করত না, আমাদের কাছে এটা ওর কোনো বিশেষ গুণ ব'লে মনে হয় নি। হরি আসলে আরও বড় চোর। আমাদের মনগুলোকে চুরি ক'রে নিয়েছিল। আমরা জানতাম রেলে বিনা টিকিটে ধরা প'ড়ে হরি জেলে এসেছে। হরি শুধু যে অমায়িক সজ্জন চটপটে তাই নয়, হরি সব সময় আমাদের সবাইকে যেন বুকে ক'রে আগ্‌লে রাখত। নইলে কোনো ফালতুকে কি ডেটিনিউবাবুরা ঘটা ক'রে ফেয়ারওয়েল দেয়? যার যা আছে উজাড় ক'রে উপহার দেয়? এমন কি চোখ পর্যন্ত ছলছল করে? হরি ছিল আমাদের কাছে এ সমাজের অবিচারে একজন নিরীহ ভালমানুষের সাজা পাওয়ার দৃষ্টান্ত। ফলে তার ঠিক পরের দিনই ধরা প'ড়ে হরির আবার জেলে আসার খবরে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়েছিলাম। তদন্ত ক'রে যেটা জানা গেল গোড়ায় সেটা আমাদের বিশ্বাস করা শক্ত হয়েছিল। হরি নাকি একজন দাগী পকেটমার। এবারেও হাতেনাতে ধরা পড়ে এসেছে। সাজা হয়ে যাওয়ার পর হরি যখন আবার ফালতু হয়ে আমাদের ওয়ার্ডে ফিরে এল, তখনও একই

ভাবে এক বানানো গল্প। জেল থেকে বেরিয়ে সিনেমা দেখবে ব'লে লাইনে দাঁড়িয়েছিল পুলিশ এসে বেকসুর তাকে ধরে।

আবদুলের খবরটা আজ আমি পেলাম সেই রাম-মিথ্যুক হরির কাছ থেকে। হরি আমাকে বলল, 'দাদাবাবু, আপনার আবদুল তো আবার এসে গেছে।'

'কোথায় আছে?'

'ইউ-টিতে ছিল। এখন ডাণ্ডাবেড়িতে আছে। পানিশমেণ্ট সেলে।'

'কেন?'

'আর বলেন কেন? বিশ্রী ব্যাপার।'

'কী করেছিল?'

'একজনকে ব্লেড মেরে ফালা ফালা ক'রে দিয়েছিল। তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। আবদুলের একটা ছোকরা ছিল। লোকটা তাকে ফুসলে নিয়েছিল। হিংসেহিংসির ব্যাপার।'

বাদশার কথা

কারো বাগানে আম হলে, লিচু হলে আমি আর দাদা কুড়োতে যেতাম। ধরা পড়ে গেলে, যাদের বাগান তাদের হাতে কী মার কী মার। এখনও গায়ে সে সব মারের দাগ আছে।

পাড়ার লোকের হাতে বড় বুবুর একদিনের মার খাওয়ার কথা কখনও ভুলব না। নতুন পুকুর আড়ায় তাল কুড়োতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটেছিল। ঝগড়াটা বাধে বেগদের মেয়ে হাসিনার সঙ্গে। আমার বড় বুবু ফাতেমা খুব ঠাণ্ডা গোবেচারা মেয়ে। বড় বুবু যেমন মিনমিনে হাসিনা তেমনি খাণ্ডাই। বেগদের যে খুব পয়সার জোর আছে তা নয়। ওদের হচ্ছে গায়ের জোর। ছ'টি ভাইই মারপিটে ওস্তাদ। ঝগড়ার কথা কানে যেতেই হানিফ মণ্ডল খুব গরম হয়ে দুপুরে তাদের বাড়ির সাত আট জন মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে দরগাতলায় এসে হাঁক

দিল, 'ফতেমাকে টেনে নিয়ে আয়।' এরপর ওরা বড় বুবুকে টেনে নিয়ে গেল। হানিফ মণ্ডল ওদের হাতে নারকোলের খোবড়া তুলে দিয়ে বলল, 'নে এবার পেটা।'

তারপর কী মার যে মারতে লাগল।

আমরা তো ভয়ে কাঁপছি। মা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে। ওরা বড় বুবুকে মেরে বেহুঁশ ক'রে ফেলে রেখে চলে গেল। পাড়ার লোক কেউ এসে কিছু বলল না।

মা ঘরে এসে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে আর বড় বুবুর গায়ে তেল লাগাতে লাগাতে বলতে লাগল, 'এই মানুষ আসুক একবার—এর বিহিত ক'রে ছাড়ব।' বলতে লাগল, 'খোদা এত জুলুম কিছুতেই সহ্য করবে না। খোদা এত জুলুম সহ্য করবে না। এত তেজ খোদা রাখবে না। এ তেজ একদিন ভাঙবেই ভাঙবে। খোদার কি চোখ নেই? খোদা কি দেখতে পাচ্ছেন না—এত অত্যাচার! এত অন্যায়!'

পাঁচটার সময় বা-জান কারখানা থেকে বাড়ি এল। বড় বুবুর গায়ের দাগ দেখিয়ে দেখিয়ে মা সব বলল। 'এর বিহিত তোমাকে করতেই হবে—ঘরে এসে বাছাকে এমনি ক'রে মারল—এর বিহিত তোমাকে করতেই হবে।'

বা-জানের সেই অসহায় চেহারার কথা এখনও মনে আছে। এত তো দাপট অন্য সময়ে—অমুকের সঙ্গে আমার আলাপ, একি ধোপার বংশ বলে মনে করেছ, শালাদের দাঁড়াও না আমি টিট করব, পুলিশে দেব!—বা-জান, কই, কেন কিছু বলছে না এখন? কেন চুপচাপ গুম হয়ে ব'সে আছে? ভেবেছিলাম বা-জান এবার আর সহ্য করবে না, এবার ঠিক ওদের জব্দ করবে। কেন কিছু বলছে না?

খানিক পরে বা-জান উঠল। সাইকেলের বাত্তিটা নিল। এক কাপ চা পর্যন্ত মুখে দিল না। বেরিয়ে গেল। আমার আশা হল, এইবার একটা কিছু হবে।

অন্য বেশির ভাগ দিন দরগার চেরাগে তেল ঢেলে লম্প নিয়ে গিয়ে বাতি ধরায় হয় মা, নয় বড় বুবু। সেদিন আমি গেলাম। চেরাগ জ্বেলে সকলের অসাক্ষাতে আমি চুপি চুপি খোদাকে বলতে লাগলাম, 'এই রকম জুলুম আমাদের ওপর—আমাদের পয়সা নেই ব'লে, আমাদের বা-জান গরিব ব'লে, আর আমার বা-জানের কোনো ভাই নেই ব'লে। ওদের যেন ওলাউঠো হয়, ওরা যেন একটা একটা ক'রে মরে। আমরা ছোট ব'লে, খোদা, আমাদের ওপর এই জুলুম। তুমি এর বিচার ক'রো।' বলবার সময় টপ টপ ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

রাত্তিরে বা-জান কখন এসেছে জানি না। ঘুমিয়ে পড়েছি। পরদিন সকালে উঠে বা-জান যেমন রোজ কাজে যায় তেমনি গেছে। মাকে জিগেস করলাম, 'মা, বা জান যে কাজে গেল—ওদের কিছু হবে না? বা-জান কিছু করল না?' মা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কী আর হবে, বাবা? তোর বা-জানের কি পয়সা আছে? তোর বা-জান কি বড়লোক? তোরা সব বড় হ'। বড় হ'য়ে এর শোধ নিস।'

এ রকম ঘটনা অনেক আছে। কত বলব।

মোড়লপাড়ার ইকবাল ছিল আমার দাদার বয়সী। তার ভাই নবী আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু। ওদের বাড়িতে ক্যালেণ্ডারের ডেট কার্ড নিয়ে খেলতে খেলতে তিন চারটে কার্ড ছিঁড়ে যায়। এমন সময় ইকবাল এসে পড়ে। আমার ছোট ভাইকে সে মারতে মারতে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসে মাকে বলে, 'তোমার ছেলে ক্যালেণ্ডার ছিঁড়ে ফেলেছে, গুনোগার দিতে হবে। নয় তো নতুন ক্যালেণ্ডার চাই। তা না হলে তুলক্লাম কাণ্ড করব।' মা বলল, 'দাঁড়া, তোর চাচা আসুক, বলি?' বা-জান ফিরতে না ফিরতে ইকবাল এসে হাজির। 'ক্যালেণ্ডার চাই, নইলে মুশকিল ক'রে ছাড়ব। বা-জান তখন তাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'অত চটছ কেন? ব'সো। ব'সে বোঝাও কোথায় কী ছিঁড়েছে না ছিঁড়েছে।'

ইকবাল সেখানে ডাঁটের মাথায় ব'সে ডেট কার্ডগুলো খুলে খুলে দেখাচ্ছে। ইংরিজিতে মাসের নাম বলছে। সানডে, মনডে বলছে। বা-জান হাঁ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাহলে ইকবাল তো মেলা লেখাপড়া জানে! বা জান বলল পাতলা কাগজ দিয়ে জুড়ে দেবে। ইকবাল বলল, না। তিন চারটে কার্ডের জন্যে গুনোগার দেবে। ইকবালের তাতেও না। তার ঐ রকমের ক্যালেণ্ডার চাই। শেষে বা-জানকে পরের দিন কাজ কামাই ক'রে কলকাতা হাওড়া ঢুঁড়ে ঠিক ঐ রকমেরই ক্যালেণ্ডার কিনে দিতে হল। বা-জানের কাণ্ড দেখে আমার সেদিন খুব রাগ হয়েছিল।

কেন বড় বুবুর লগনসার সময়, বড় বুবু যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন কী হয়েছিল? বা-জান মোড়লকে বলেছিল, এ উপলক্ষে দেইজিবর্গ আর শুধু মোড়লদের খানা খাওয়াব। কিন্তু ঠিক লগনসার দিনে হঠাৎ মোড়লমাতব্বরেরা ঘোঁট পাকিয়ে বেঁকে বসল। বলল, মালং না খাওয়ালে —না মোড়ল, না দেইজিবর্গ —কেউ খেতে যাবে না। মালং বা মাহ্‌লৎ, মানে ষোলআনা—সারা গাঁ। বা-জানের তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দুপুরে খাওয়ার কথা। বা-জান গিয়ে কত খোশামোদ করল। তবু কেউ এল না। তখন বিকেলে বা-জান বেরোলো টাকা ধার করতে। সেই টাকায় বাজার ক'রে রাত্তিরে খানা পাকানো হল। বড় বুবুর লগনসায় এইভাবে হল বা জানের মুখ বাঁচানোর জন্যে মাথা বিকিয়ে মালং খাওয়ানো।

কিন্তু আরেকটা ব্যাপার? সেটা তো এর চেয়েও জঘন্য।

অলি বক্সের ছেলে নুরুদ্দির সঙ্গে বা-জানের একবার খিটিমিটি হয়। সেই রাগে ওরা বড় বুবুর নামে রটিয়ে দেয় যে, ফাতেমা তো আছে এক হিন্দুস্থানী ধোপার সঙ্গে। এগারো বছরে বিয়ে হয়ে তার তিনচার বছর পরেই বড় বুবু শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বড় বুবুর সঙ্গে যে ছেলেটির বিয়ে হয়, সে ছিল রিখিটম্যান। সে ছিল গণ্ডমূর্খ। কিন্তু কাজের হাত খুব সাফ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব কাজেই সে দড়।

বড় বুবুর এই বদ্‌নামে মা বা জানের তো মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। পাড়ার কিছু লোক ঐ মিথ্যুকদের পক্ষ নিল। বিচার-সালিশি বসল। তাতেই কি ওদের টিট করা গেল? নুরুদ্দির কয়েকটা ছেলেই বড় বড়—গোঁয়ারগোবিন্দ ক্লাসের। কাজেই বা-জান ওদের ভয় পেল।

যাদের বয়স কম ছিল তারাই বা কী কম যেত?

গোলাম আলির ছোট ছেলে মনি আমার খেলার সাথী। একদিন আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছি। মনি সেটা আমার হাত থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। 'ঘুড়ি দে', 'ঘুড়ি দে' ব'লে আমি ওর পেছনে ছুটছি, এমন সময় ওর বড় ভাই আখতার এসে আমাকে ধরে ফেলল বেগদের দলিজের গোড়ায় তালগাছটার সামনে। ধ'রেই লাথি কিল চড় ঘুষি। 'শালা ফকিরের ছেলে, এত বড় আস্পর্দা। আমার ভায়ের ঘুড়ি কাড়তে চাস?' অনেকেই সেখানে ছিল। কেউ কিছু বলল না। আমি কাঁদলাম না। কাউকে কিছু বললাম না।

চুপটি ক'রে এসে পুকুরে নাক মুখের রক্ত ধুয়ে সোজা গিয়ে ঢুকলাম দরগায়। তখন সন্ধ্যে। খোদাকে ডেকে মোনাজাত ক'রে বললাম, 'খোদা, গরিব ব'লে আমাদের ওপর এই জুলুম। তুমি এর শোধ নিও। ওরা যেন মুখে রক্ত উঠে মরে।' মাকে কিছু বলি নি। মা কী করবে? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদবে। কিছু তো করতে পারবে না।

যে তালতলায় আমাকে মারছিল, তার সামনেই আমার টুপিওলা খালার বাড়ি। সে আমাকে মার খেতে দেখেছিল। পরদিন খালা মাকে এসে বলেছিল। 'হ্যাঁ রে বুবু, তোর ছেলেটাকে অমনি ক'রে মারল। তোরা কিছু বললি নে?' শুনে মা তো আকাশ থেকে পড়ল। 'কী ব্যাপার?' 'কেন, তোর বুলুকে যে কাল আখতার অমন মারল—এই কিল, এই লাথি, এই চড়। নাকমুখ দিয়ে গলগল ক'রে রক্ত বেরোতে লাগল। 'কিছু তো আমি জানি না।' ব'লে মা আমায়

ডেকে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। 'কোথায় মেরেছে বাবা, কোথায় লেগেছে?' তারপর খালার দিকে ফিরে বলল, 'কী আর বলব বানু—ওদের পয়সা আছে, তাই ওরা জুলুম করে।'

বা-জানের সাইকেলটার ওপর মাঝে মাঝে খুব রাগ হত, মনে হত ঐ সাইকেলটাই বা-জানকে কেবলি বাড়ির বাইরে, পাড়ার বাইরে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায়। নইলে বা-জান যদি অতটা বাড়ি ছেড়ে পাড়া ছেড়ে না থাকত তাহলে আমাদের গায়ে ওভাবে হাত তুলতে কারো সাহস হত? আবার তারপরই দেখেছি, বা-জানের সাইকেল সারাবার জন্যে হয়ত কেষ্টবাবুর দোকানে গিয়েছি—সাইকেলটা দেখা মাত্র আমাকে কী খাতির! শুধু কেষ্টবাবু নয়। আশেপাশের দোকান-বাজারের সবাই। ব'সো ব'সো—চা খাও, বিস্কুট খাও। মনে হত, এ সব বা-জানের ঐ সাইকেলেরই গুণে। তখন আবার সাইকেলটার ওপর রাগ পড়ে যেত।

নিজেদের বিপদে-আপদে অসুখে-বিসুখে মামলা-মোকদ্দমায় পাড়ার লোকে কিন্তু সব সময় ঐ তাহের মোল্লার কাছেই ছুটে আসত। সব ভুলে গিয়ে তাদের বাঁচাবার জন্যে বা-জান তক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ত। পাড়ার লোকেদের শুনিয়ে শুনিয়ে তখন মা ভেতর থেকে বলত, 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। করতে হবে না তোমাকে কারো জন্যে কিছু। বিল্লাইয়ের জাত সব। গলায় কাঁটা ফুটলে মেঁউ মেঁউ, কাঁটা নামলে কেউ নয়।' বা-জান বলত, 'দুশমনকে জব্দ করতে হয় তার উপকার করে। ক্ষতি ক'রে নয়। বা-জানের পয়সার জোর ছিল না তো। সেটাই হয়েছিল বা-জানের এই ভাল-মানুষির কারণ।

তবে এই যে পয়সাওয়ালা লোকেরা ঠেকায় প'ড়ে বাড়ি ব'য়ে আসছে, এতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মনে মনে খুশি হতাম। মনে মনে বলতাম—খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে! ঘুঘু পড়েছ ফাঁদে!

আজ ডাক্তারের ওপর চটে গিয়েছিলাম। নাকে নল ঢোকাতে গিয়ে লোকটা লাগিয়ে দিয়েছে।

আসলে লাগার ব্যাপারটা অত নয়। নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢোকাতে গেলে খোঁচাখুঁচি একটু হয়ই। কাজটা ডাক্তারবাবু তেমন মন দিয়ে করছিলেন না; তাঁর আসা বসা যাওয়ার মধ্যে ছিল একটা দায়সারা ভাব।

আজ এই প্রথম ফোর্সফিডিংয়ের সময় আমার ভয় হল। নল ঢোকাতে গিয়ে ফুসফুস ফুটো হয়ে, শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ভুল জায়গায় দুধ গিয়ে নিউমোনিয়া হয়ে অতীতে কম বন্দী মারা যায় নি। কাজেই এসব কাজ মন দিয়ে সাবধানে করা উচিত।

কাজেই, ব্যথা পেয়েছিলাম ঠিকই—কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভয় পেয়েছিলাম।

নাকি এর সবটাই জেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত? যখন ওরা দেখছে না-খাওয়ার দরুন যে ভয়, সে ভয় দেখিয়ে আর কাজ হচ্ছে না—তখন এবার দেখাতে শুরু করেছে খাওয়ানোর ভয়।

ভয় তো ওরা দেখাবেই। কিন্তু আমিই বা কেন ভয় পাচ্ছি? আসলে তো ভয়টা সেই মরে যাওয়ার। তা সে ইচ্ছে ক'রে না খাওয়া থেকেই হোক আর জোর ক'রে খাওয়ানো থেকেই হোক।

এ কিন্তু একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। ওরা যখন গোড়ায় এল, হাত পা ছুঁড়ে রীতিমতোভাবে লড়েছি। এখন লড়াইয়ের ভান করি। ওরাও সেটা বিলক্ষণ জানে। তাই ওরাও যেটা করে, সেটা বল-প্রয়োগের অভিনয়।

মরে গেলেও নিজের কাছে এ কথা স্বীকার করতে পারব না যে, আমি মরতে ভয় পাই। সেটা হবে মাথা নিচু করার, হেরে যাওয়ার

ব্যাপার। আমি ভয় পাই, আর আমি মরতে ভয় পাই—এ দুটো এক নয়। প্রথমটার মধ্যে আছে একটা তাৎক্ষণিকতা আর দ্বিতীয়টার মধ্যে আছে পরিণাম।

কিন্তু যখন বাঁচার কথা ওঠে? যখন বলি, 'আমি বাঁচতে চাই?'

এইখানেই মজা। মরতে ভয় না পেয়েও বাঁচতে চাওয়া যায়। তাই যদি না হবে, তাহলে নির্ভীক মানুষগুলো ছুটে গিয়ে ইলেকট্রিকের জ্যান্ত তার চেপে ধরত, পটাসিয়াম সায়ানাইড খেত, চলন্ত ট্রেনের সামনে শুয়ে পড়ত—

রেলগাড়ির ব্যাপার এলেই—এই আরেক মুশকিল—আমার বাবার কথা মনে পড়ে যায়।

আমি কাউকে বলি নি, এবার যখন রেলের চাকা বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা ঘটল—আমি মনে মনে একটা সমস্যা নিয়ে বহুবার নিজের মধ্যে তোলপাড় করেছি। আচ্ছা. আমার বাবা কী করতেন? ধর্মঘটে থাকতেন, না ধর্মঘট ভাঙতেন?

এর উত্তর শেষ পর্যন্ত মনে মনে আমিই বাবাকে যুগিয়ে দিয়েছি। বাবাব কানে মন্ত্র দিয়ে আমি বলেছি—

রেল ধর্মঘট মানেই তো রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ট্রেন যদি থেমে যায়, তাহলে তো বাবা তুমি মরো না?

আমার মনে মনে বাবা লাফিয়ে উঠে বলেছে—আমার অরুর কী বুদ্ধি!

বাদশার কথা

মকবুলের মা যেদিন মারা যায়, সেদিন ওদের বাড়িতে কী ভিড়! আমার কেবল মনে হচ্ছিল, ইস্! আমার মা মরলেও তো আমাদের বাড়িতে লোকের এমনি ভিড় হবে।

মা মরে যাক, এটা আমি চাই নি। আমি চাইছিলাম পাড়ার অন্য পাঁচটা বাড়ির মতো আমাদের বাড়িতেও লোক আসুক, ভিড়

হোক। বা-জানের অসুখের সময় দু চারজন লোক আসত বা-জানকে দেখতে। আমার খুব ভাল লাগত। তবু তো বা-জানের অসুখ ব'লে আমাদের বাড়িতে দু চারজন লোক এল!

ভাবতাম একা পড়ে গিয়েই আমরা মার খাচ্ছি। বাড়ি যদি লোকে গমগম করত, তাহলে বা-জানের ওপরও এত জুলুম হতে পারত না। বাড়িতে মা-বাজানের নিত্যকার ঝগড়াঝাঁটিও কমত।

কিংবা যদি বা-জানের চার পাঁচটা ডাগর ডাগর সা-জোয়ান ভাই থাকত, তাহলেও চলত।

কখনও ভাবতাম—ইস্, একটা গায়েবী টুপি পেলে বেশ হত। তাহলে শালাদের খুব ফাঁকি দিতে পারতাম। গায়েবী টুপির গল্প আমাকে ব'লেছিল বড় বুবু। কোথায় কী ক'রে এই টুপি পাওয়া যাবে তাও বলেছিল। শ' শ' বছরের পুরনো গোয়াল ঘরে গিয়ে মগরেবের সময় ব'সে থাকতে হবে। যার নসিব ভাল, সে একটা ছোট্ট বাছুরের মাথায় গায়েবী টুপি দেখতে পাবে। তখন টুপিটা যে তুলে নেবে, টুপিটা তার হয়ে যাবে। তারপর তুমি সেই টুপি প'রে যেখানে খুশি যেতে পারবে। তুমি সবাইকে দেখতে পাবে, তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। এই গায়েবী টুপির খোঁজে আমি কতদিন যে বেগদের দলিজের সামনের গোয়াল ঘরে চুপি চুপি গিয়ে বসে থেকেছি!

বুবু গল্প করেছিল—

গভীর জঙ্গলের মধ্যে রাজার গরু চরাতে যেত এক রাখাল ছেলে। সেখানে আসত এক বড় অজগর সাপ। রাখাল ছেলে করত কি, গরুর বাঁট থেকে আধ-ছটাক এক-ছটাক দুধ নিয়ে সাপটাকে খাওয়াত। তারপর সেই সাপের মাণিক পেয়ে সেই রাখাল মস্ত বড়লোক হয়ে গেল।

আমিও অমনি সাপের মাণিক পাব ব'লে আমাদের বাড়ির কাছেই ঝুটিকাঁটার জঙ্গলে গিয়ে ব'সে থাকতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অজগর সাপের যদি দেখা পাই তো সে দুধ খেতে চাইলে দুধ খাওয়াব। সাপের মাণিক আমি চাই।

কখনও মাঠে চলে যেতাম রাত্তিরে। শুনেছিলাম পুরানো সাপ নাকি মাঠে যখন পোকামাকড় খায়, তার মাথার মণি মাটিতে নামিয়ে রাখে। তাতে চারদিক আলো হয়ে যায়। তখন কায়দা ক'রে সেই মণির ওপর গোবর চাপা দিয়ে দিতে পারলে সাপটা ছটফট ক'রে মরে যায়। আমি রাত্তির বেশি জাগতে পারতাম না। বাড়িতে এক ঝুড়ি গোবর যোগাড় ক'রে রেখেছিলাম। সেই গোবর নিয়ে প্রায়ই অন্ধকার হলে মাঠে গিয়ে হাপিত্যেশ হয়ে ব'সে থাকতাম। কিন্তু কোথায় মণি কোথায় মাণিক। শেষকালে তার আশা আমাকে ছাড়তে হল।

কখনও কখনও জিন হাসিল করার কথা মনে হত। জিন হাসিলের ব্যাপারটা হয় এই ভাবে—

কোরানে কতকগুলো সুরো আছে। নির্জন জায়গায় গিয়ে কিংবা মসজিদে বা কোনো পাক জায়গায় ব'সে কোনো সুরো পাঁচশো বার, কোনোটা হাজার বার, কোনো সুরো চল্লিশ দিন, কোনোটা আশি দিন ধ'রে এক মনে পড়লে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে জিন এসে নানা রকমের বিভীষিকা দেখাতে থাকে। জিন সোজা জিনিস নয়। মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। জিন হল আগুনী। মানুষের কাছে এলে মানুষ ছাই হয়ে যায়। কিন্তু এই জিনকে যে কেনাগোলাম বানাতে পারে, দুনিয়ার সব কিছুই তার মুঠোয় এসে যায়। যদি একটানা ঠিক মতো পুরো মেয়াদে জেকেব করা যায় তাহলেই জিন হাসিল হয়। সাধারণ মানুষ পারে না। তাদের ধৈর্য নেই। কেননা কল্‌মা বা দরুদ পড়লে জিন বাধা দেবেই। তাতে তারা ভয় পায়। একমাত্র ওলিওল্লা গোছের লোকেরাই পারে।

তোরাব চাচার দলিজে ব'সে শুনেছি জিন হাসিল করতে গিয়ে একবার ওমর শেখের মসজিদের ছোট ওস্তাজির কী দশা হয়েছিল।

সাতাশ দিনের দিন থেকেই জিন তাকে ভয় দেখাতে শুরু করে। কখনও তেড়ে আসছে বাঘভাল্লুক সেজে, কখনও অজগর হয়ে হাঁ ক'রে গিলতে আসছে। এই উড়ে যাচ্ছে আবার এই গায়েব হচ্ছে। উনচল্লিশ দিনের দিন বিরাট এক দেওয়ের চেহারা ক'রে তার বউকে নিয়ে জিন হাজির হল। এক রাশ কাঠ যোগাড় ক'রে তাতে আগুন দিল। ওদের খুব ক্ষিধে। কোত্থেকে ওরা একটা ছেলেকে ধ'রে এনে ঠ্যাং ধ'রে চিরে ফেলে তাকে দুভাগ ক'রে পুড়িয়ে খেল। ওরা যত খায় তত ক্ষিধে বাড়ে। তখন ওরা ওস্তাজির দিকে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে দেখে ওস্তাজি ভয় পেয়ে জেকের করতে ভুলে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেল। ওস্তাজির জিন হাসিল করা হতে হতেও আর হল না।

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিত বটে তবু মনকে এই ব'লে সাহস দিতাম—মোটে তো চল্লিশ দিন। কুল্ হুয়াল্লার দরুদ। এমন কি শক্ত ব্যাপার। ও আমি হাসিল করব। একটু বড় হই। তারপর।

কখনও ভাবতাম নক্শে সুলেমানির ওপর দখল আনবার কথা। কোরানের কোনো এক সুরো কিংবা বয়েদের ওপর দখল রাখতে পারলে এই চিজ হাতে আসে। তখন নক্শে সুলেমানিকে যে জিনিসই আনতে বলা যাবে, সেই জিনিসই সে এনে হাজির করবে।

কিসে সব কিছু পাওয়া যাবে, আমার শুধু সেই ধান্ধা।

রবিবার

না খেয়ে শরীর শুকোলেও দেখছি সহজে রস মরে না।

কাল রাত্তিরে লক-আপের পর, যেসব কথা ভাবা উচিত নয়, সেই সব ভেবেছি। ইস্কুলে আমার ঠিক পাশে একটি ছেলে বসত। তার কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। আমাকে প্রায়ই বলত তার মনে সব সময় কুভাব ছেয়ে থাকে। তার জন্যে সে বিবেকানন্দের বই পড়ে। কিন্তু প'ড়েও তার মন থেকে কুভাব যায় না। বরং অনেক

সময় আরও বাড়ে। নিজের কাছেই নিজেকে ওর দুঃসহ লাগে। প্রায়ই জামার হাতা সরিয়ে দেখায়, নিজেকে শাসন করার জন্যে ব্লেড দিয়ে কিভাবে কেটেছে। ওর আত্মগ্লানি দেখে আমার খুব কষ্ট হত। নিজের পিঠে চাবুক মেরে মেরে রাস্তায় যারা হাপু গায় তাদের কথা মনে হত। পরে সে বড় হয়ে পুলিশে চাকরি নেয়। দু একবার দেখা হয়েছে। এখন স্বাভাবিক।

হাপুগান আমার খুব বাজে লাগে। আমি অত বোকা নই যে, নিজের গায়ে ব্লেড বসিয়ে অনুচিত চিন্তার জন্যে নিজেকে সাজা দেব।

পেটের খিদের মতো শরীরের অন্য খিদেটাও শরীরের ধর্ম। খাওয়ার ব্যাপারে যেমন খাদ্যাখাদ্যের পথ্যাপথ্যের বিচার করতে হয়, এখানেও তাই। খিদেটা তাড়না। কিন্তু রুচি জিনিসটা বাসনা।

জানোয়ারে-মানুষে এবং মানুষে-মানুষে তফাত হয়ে যায় এই রুচির জায়গায় এসে। রাস্তায় মানুষকে ডাস্টবিনের এঁটো পাতা চাটতে দেখে আমাদের রুচিবাগীশরা তার সামনে দিয়ে দিব্যি খোশ মেজাজে হেঁটে যেতে পারেন, কিন্তু একটি ছেলে একটি মেয়ের হাত ধরলেই তাঁদের মহাভারত সঙ্গে সঙ্গে অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় এক সময়ে আমাদের স্বদেশির নাটের গুরু ছিলেন নিবারণদা। বিজ্ঞানের ছাত্র। গালভাঙা শুকনো কালো চেহারায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করত। তাঁর মধ্যে কোথায় কী একটা জাদু ছিল।

নিবারণদা দিস্তে দিস্তে প্রবন্ধ লিখতেন। তাতে শ্রীঅরবিন্দ, ক্রোপোটকিন, বার্নার্ড শ—সব মিলিয়ে যেটা তৈরি করতেন সেটা চর্বণ-যোগ্য খাদ্য হত না। হত গেলবার পানীয়। শরীরে লাগত না, বেশ একটা ঘোর-ঘোর ভাব হত।

নিবারণদা একদিন যোগীপুরুষের মতো পাশবালিশের কায়দায় আমার গায়ে পা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'কক্ষনো বিয়ে করবি না। ডাগর ডবকা মেয়েদের দিকে তাকাবি না, এই সময় সাবধান হবি। তা না হলেই পা পিছলে সংসারে ডুবে যাবি।' ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে

বলতেন, 'ঐ যে একতলা বাড়িটা দেখছিস, ঐখানে কমিউনিস্টরা থাকত। পুলিশ ঐ বাড়ি থেকে ওদের ধরে। ওরা বলে, কারো নিজস্ব ব'লে কিছু থাকবে না। এমন কি বৌও হবে সাধারণের সম্পত্তি। যে যার সঙ্গে যখন ইচ্ছে হবে শোবে.

এখন মনে হয়, নিবারণদা বোধহয় আমাকে সামনে খাড়া ক'রে আসলে নিজের সঙ্গে কথা বলতেন। নইলে ছোট ছেলের মাথা খেতে না চাইলে কেউ ঐসব কথা ঐভাবে বলে ?

এও দেখছি, মহারানী ভিক্টোরিয়ামার্কা নিবারণদার চকচকে সিকি দোয়ানি রেজগী হয়ে আমাদের মধ্যে আজও অনেকে রয়ে গেছেন! একদল যেমন মালকোঁচা আঁটা, আরেক দল তেমনি কাছা আল্গা।

কিন্তু কেন আমি নিজেকে বার বার এড়িয়ে গিয়ে পরের চরকায় কেবলি তেল দিতে চাইছি ? সেদিনের সেই ঋষিতুল্য পুরনো বিপ্লবীর ইউ-টি ওয়ার্ডের একটি ছেলেকে লেখা প্রেমপত্র হাতেনাতে ধরা পড়ায় সকলের সঙ্গে, অরু, তুমিও সেদিন খুব মজা পেয়েছিলে। কিন্তু তোমার বিধবা মাসতুতো বোন যেদিন তোমার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে প'ড়ে তোমার হাতের বইটা দেখতে দেখতে গরম নিশ্বাস ফেলেছিল, হঠাৎ চমকে উঠেছিলে কিন্তু চেয়ার ছেড়ে তো কই উঠে যাও নি ? কেননা তোমারও ক্ষুধিত শরীরে সে সান্নিধ্য ভাল লেগেছিল। ঢালা বিছানায় বাড়িসুদ্ধ সকলের সঙ্গে শুয়ে ঘুমের মধ্যে তোমার হাত তার বুকের ওপর উঠে গেছে জেনেও নিজের হাত তো সরিয়ে নাও নি! মশারি টাঙাতে গিয়ে যেদিন তার মুখ হঠাৎ তোমার মুখের ওপর নেমে এসেছিল, তার পরের দিনই কাজের অছিলা ক'রে তুমি ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে। তোমার সেই বিধবা বোন বলেছিল— অরু, আমিও মানুষ। এসব এবং আরও অনেক কিছু, তুমি কি অস্বীকার করো ?

না। আমি স্বীকার করি। কিন্তু অরু খুব ভাল ক'রে নিজেকে উল্টেপাল্টে দেখেছে, তার মধ্যে এর জন্যে খুব একটা অপরাধবোধ

নেই। অঙ্ক বলে না যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না। খাওয়া বন্ধ করলে তার ক্ষিধে পায় না।

আমি। তুমি। সে। আমি একই সঙ্গে জজ আসামী উকিল হওয়ার চেষ্টা করছি। আমি এমন একটা কেস্ খাড়া করার চেষ্টা করছি যেখানে আসামীর অসদুপায়ে অর্জিত পয়সায় তলায় তলায় আসামীপক্ষের উকিলের কাছে জজ আগে থেকেই ঘুষ খেয়ে ব'সে আছে। কাজেই এ মামলার ভবিষ্যৎ যে কী সেটা বুঝতে কারও বাকি নেই।

আমার বন্ধুরা কত সময় আমাকে 'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ' ব'লে ঠাট্টা করেছে। সত্যি ব'লেই আমি তার জবাব দেবার কখনও চেষ্টা করি নি।

মাঝে মাঝে আমার সত্যিই খুব একা লাগে। বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে তাদের পাই না। বউদের নিয়ে তারা সিনেমায় গেছে। কারো ছেলেমেয়ে হয়েছে। তারা কী সুন্দর আধো আধো কথা বলে। জেল থেকে কত চিঠি মেয়েদের কাছে যায়, মেয়েদের কত চিঠি জেলখানায় আসে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি। পাইপ না পাঠিয়ে উমা আমাকে একটা চিঠি পাঠালেই তো পারত! রোজ যখন ডাক আসে সবাই ভিড় করে। আমি সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি— কোনোদিনই কেন আমার কোনো চিঠি আসে না।

বারশোর কথা

পাঠশালা উঠে গেলে ভোলা মাস্টার আমাকে ইউ-পি ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেখানে আমার এক নতুন বন্ধু হল। করম আলি। করমের কথা এখনও আমি ভুলতে পারি না। লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। ওকে মনে হত বড় হয়ে ও নিশ্চয় বিদ্যাসাগর হবে। ওর বাড়ি ছিল দক্ষিণ চকে। গুরুট্রেনিঙের মেসে রান্না করত আর

আমাদের সঙ্গে পড়ত। ওকে দেখে বুঝলাম, তাহলে আমাদের চেয়েও গরিবমানুষ সংসারে আছে। ক্লাসে করম হল ফার্স্ট, আমি সেকেণ্ড। কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার হিংসে তো ছিলই না, আমাদের বরং দুজনের ছিল গলায় গলায় ভাব।

আমি বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম। ভালভাবে পাসও করলাম। কিন্তু অসুখ ক'রে যাওয়ায় করম আলির আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। যাকে ভেবেছিলাম বিদ্যাসাগর হবে তার পড়াশুনো ঐখানে খতম হয়ে গেল। পরে একবার খোঁজ ক'রে ওর গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে করমের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। পনেরো বছর পরে দেখা। তখনও ভাঙা ঘর। বিয়ে করেছে। দুটো ছেলে হয়েছে। দর্জির কাজ ক'রে কোনোরকমে সংসার চালায়। কি রকম যেন হয়ে গেছে। আমাকে দেখে ছুটে এল না, এসে জড়িয়ে ধরল না। অভাবের চাপে ছোটবেলাটা ওর মধ্যে মরে গিয়েছে।

আমি তো তারপর বৃত্তি পাস ক'রে রংকলের ডাক্তারকে ধ'রে মাইনর ইস্কুলে ভর্তি হলাম। ভর্তির ফি আর মাস-মাইনে দিতে রাজী হলেন রংকলের কেমিস্ট। আলি সাহেব। ক'মাস মাইনে দেবার পরই আলি সাহেব চলে গেলেন বিলেতে। আর মাইনে দিতে না পেরে আমারও ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িতে নিজে নিজে একটু আধটু পড়ি। মাঝে মাঝে মনে হয়, পড়াশুনো হওয়ার আর আশা নেই। তারচেয়ে কারিগরি ইস্কুলটাতে বয় হয়ে ঢুকে পড়ি। কিন্তু সেও তো পাঁচ বছর ধ'রে বিনা মাইনেতে শুধু কাজ শেখার ব্যাপার। আমাদের যা অবস্থা, তাতে অতদিন ধৈর্য ধ'রে থাকা যাবে না।

ভ্যাগাবণ্ড হয়ে যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটাও ভাল লাগছিল না। এমন সময় একদিন পুকুরপাড় দিয়ে আমাকে যেতে দেখে আড়বাঁশী বাজানো থামিয়ে মৈজুদ্দি জাদু আমাকে ডাকল। তার পাশে বসে ছিলেন আতিকুল মাস্টার।* তাঁর একটা এল-পি ইস্কুল ছিল।

মৈজুদ্দি জাহু ব্যবস্থা ক'রে দিল, আপাতত এল-পি ইস্কুলে আমি পড়াব আর তার বদলে আতিকুল মাস্টার আমাকে পড়াবেন—তারপর বছর শেষ হলেই উনি আমাকে শিবপুরের বড় ইস্কুলে ঢুকিয়ে দেবেন।

বড় ইস্কুলে তো গেলাম। ব্রজদুলাল হেডমাস্টারের গালে বড় একটা আব। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। একে আমি মুসলমানের ছেলে, তায় বড় ইস্কুল। কিভাবে সেলাম করবে, নমস্কার করে জানি না। হাত দুটো জোড় ক'রে, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন আমার পরীক্ষা নিলেন, তখন আমি অবাক। এত মিষ্টি ক'রে, এত স্নেহ-মমতার সুরে কথা বলতে এর আগে কাউকে দেখি নি। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বললেন, ফ্রিশিপ সব হয়ে গিয়েছে। এখন করাতে গেলে ধরতে হবে সেক্রেটারি নৃসিংহবাবুকে। কিন্তু তার জন্যে দরখাস্তে সই চাই, এ ওয়ার্ডের কমিশনার বলরামবাবুর। বলরামবাবু ছিলেন জুটমিলের ক্যাশিয়ার।

ভোট সুবাদে বা-জানের সঙ্গে বলরামবাবুর চেনা জানা। বা-জান বলল, 'ঠিক আছে, আমার সঙ্গে বলরামবাবুর খুব ভাব।'

তিনচার দিন আগে থেকে চলল, বলরামবাবুর সঙ্গে মোলাকাত করতে যাব, তার পাঁয়তারা। বা-জান আমাকে তালিম দিতে লাগল : গিয়ে এই রকমভাবে দাঁড়াবি আর এই রকমভাবে সেলাম করবি। ওঁরা হচ্ছেন ভদ্দরলোক—খুব সাবধান! মাকে বলল, 'সাবান-টাবান দিয়ে ভাল ক'রে ওর কাপড়জামা সাফ ক'রে দাও।' শুনে যেমন ভয় হচ্ছে, যাব ব'লে তেমনি আনন্দও হচ্ছে। নিয়ে যাবার দিন বা-জান বলল, 'ভাল ক'রে কাপড় পর, ঐভাবে নয় এইভাবে। চুলে তেল দে। কী দেখতে, যেন মুদ্দোফরাস। দাঁতগুলো হেঁড়ে হেঁড়ে। ভাল মুখ দেখলে কোথায় লোকের একটু মায়ামহব্বত হবে। তা নয়, শালার ছেলের চেহারা দেখ না!'

বা-জানের সাইকেলের পেছনে বসেছি। সারা রাস্তা বা-জানের উপদেশ--কিভাবে দাঁড়াবে, কিভাবে বলবে। বলরামবাবু হলেন

ভদ্দরলোক। ভদ্দরলোকদের সঙ্গে কিভাবে চলাফেরা করতে হয়। পাড়ার লোকে আর ভদ্দরলোকে কী তফাত। এইসব সমানে।

বলরামবাবুর অবস্থা ভাল। পুরনো আমলের দোতলা বাড়ি। বারবাড়িতে ঠাকুরদালান। সামনে মাঠ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঠাকুরদালানের পাশেই লম্বা ঘর - বলরামবাবুর বৈঠকখানা। ভেতরে তক্তাপোশ পাতা। দরজার বাইরে ঢাকা বারান্দা। তার পাশে দালান। দালানের নিচে ধাপে ধাপে নেমে গেছে সিঁড়ি।

বলরামবাবু গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। সাইকেলটা রেখে বা-জান ডিবে থেকে পান বার ক'রে মুখে দিল। তারপর একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে আমাকে সিঁড়ির ওপর বসতে বলল। আমি বসলাম। বা-জান দাঁড়িয়ে থাকল।

বলরামবাবু ফিরলেন। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে তাঁর ছাড়া কাপড়। গঙ্গার জলে ভিজে মেটে রং। বা-জান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকলাম। বলরামবাবু সেলাম নিয়ে কোনো কথা না ব'লে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমি একটু দমে গেলাম। তবে যে বা-জান বলছিল বলরামবাবুর সঙ্গে বা-জানের খুব ভাব? সব কি বানানো বাড়ানো কথা? বলরামবাবুর ভাব দেখে মনে হল না আমার জন্যে কিছু করবেন। বা-জান ঘুরে এসে বসল। আমার মনে তখন কত কী হচ্ছে, কিন্তু বা-জানকে সাহস ক'রে বলতে পারছি না।

আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পরে বলরামবাবু এলেন। 'কী তাহের কী মনে ক'রে?'

বা-জানের ভাবটা এই যে, বলরামবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পেরে বা-জান যেন কৃতার্থ। সেইসঙ্গে একটা বিশ্বাস, বলরামবাবু কি বা-জানের কথা ফেলতে পারবে? বা-জান আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখানো মাত্র, আগে থেকে শেখানো মতো, আমি মাথা নিচু ক'রে সেলাম দিলাম। বলরামবাবু তাকাতে বা-জান বলল, 'আমার মেজ

ছেলে। ওকে তো পড়াতে পারছি না টাকার জন্যে। ভাল ছেলে। আপনারা, বাবু, যদি একটু মেহেরবানি না করেন তো ওর পড়াশুনা আর হবে না। আপনি যদি এক কলম লিখে দেন তো ওর ফ্রি-টা হয়ে যেতে পারে।' ব'লে আমার কাছ থেকে দরখাস্তটা নিয়ে বলরামবাবুর হাতে দিয়ে বা-জান বলল, বাবু, একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে।'

দরখাস্তর মার্জিনে বলরামবাবু তাঁর ফাউন্টেন পেনের নীল কালিতে সুন্দর হরফে সুপারিশ লিখে দিচ্ছেন, বা-জান গর্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। এবার বাজি মাৎ। ছাই। একমাস পরে থোঁতা মুখ ভোঁতা। আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নি। তার মানে, বলরামবাবুর দৌড় বেশি নয়। বলরামবাবুকে দিয়ে আসলে ধরতে হবে নৃসিংহবাবুকে। এদিকে পাঁচ ছ' মাসের মাইনে বাকি। চুরি ক'রে ক্লাস করি। ডিফল্টার লিস্ট এলে ক্লাস থেকে সরে পড়ি। বা-জানকে রোজ বলি বলরামবাবুকে দিয়ে নৃসিংহবাবুকে ধরবার কথা। বা-জান বলে: 'আমার সময় নেই। তোকে তো আলাপ করিয়ে দিয়েছি। রোজ যেতে হবে। একদিনে কি হয়? রোজ যাবি, দেখা দিবি তো দয়া হবে। তাছাড়া ওরা ভদ্দরলোক। দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেও তো ভদ্দরলোকদের চালচলন কথাবার্তা শেখা হবে।'

শেষ পর্যন্ত বলরামবাবু রাজী হলেন। নৃসিংহবাবুর কাছে যাবেন ব'লে আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বারও হলেন। কিন্তু মাঝপথে কারো বৈঠকখানার আড্ডায় ফেঁসে গেলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে। শেষকালে এসে বললেন, 'আজ তো দেরি হয়ে গেল—তুই বরং কাল আসিস।' কাল কাল ক'রে চলে গেল বেশ কিছু দিন। শেষকালে বললেন, 'আচ্ছা, আমি আরেকটা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি আর সেইসঙ্গে একটা চিঠি। তুই নিজে গিয়ে নৃসিংহবাবুকে দিবি।'

সেই দরখাস্ত আর চিঠি নিয়ে, গায়ে একটা সাদা চাদর জড়িয়ে একাই গিয়ে ঠেলে উঠলাম নৃসিংহবাবুর বাড়ি। পুকুর পাড়ে বিরাট

দোতলা বাড়ি। লোহার গেট। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। বাজার সরকার মতন একজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে গেটের বাইরে আসছিল। তাকে জিগ্যেস করতে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বাড়ি। যাও না, ভেতরে যাও।'

লোহার গেট পেরিয়ে সামনে ফুলের বাগান, বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে বাড়ির পৈঠে। উঠে খোলা বারান্দা। বারান্দাটার দুপাশে ছোট ছোট দুটো কামরা। তার মাঝখানে বাড়ির কোনো মোটা দোহারা চেহারার ভদ্রলোক দাড়িগোঁফে সাদা মতন, কি রকম ফেনা লাগিয়ে—পরে পাড়ার লোকদের জিগ্যেস ক'রে জেনেছিলাম—ওটা হল সায়েবদের দাড়ি কামানোর বিলিতি সাবান—দেখলাম নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন। আমি যে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেটা কারো নজরেই পড়ছে না। আমি কোনো রকম তাল পাচ্ছি না কাকে কী বলব। নাম ধ'রে জিগ্যেস করব কি করব না। তাতে বেআদবি হবে কি হবে না। ভাবছি। তিন পোয়া কি আধঘণ্টা সময় পরে আমার বয়সী একটি ছেলে এসে জিগ্যেস করল—কী চাই? গলা দিয়ে কিচ্ছু বার হল না। দরখাস্ত আর চিঠিটা হাতে দিলাম। সে পড়তে পড়তে ভেতরে গেল। আমি তো অবাক! অতটুকু ছেলে, ইংরিজিতে কী দখল! পাশের ঘর থেকে নৃসিংহবাবুকে চিংকার ক'রে বলতে শুনলাম 'বলুগে এখন তো ফ্রি করা আর যাবে না। আগে খবর নিই কি রকমের ছাত্র, হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্টটা দেখি—তারপর আসছে বছর দেখা যাবে। এখন মাইনে দিয়ে পড়তে হবে।' মন খুব ভেঙে গেল।

বলরামবাবু তবু আশ্বাস দেন। 'ভেবো না, ব'লে ক'য়ে তোমার ফ্রিশিপ ঠিক ক'রে দেব।'

বছর যায়। পুরো এক বছরের মাইনে বাকি। পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারলাম না। গোপনে জানলাম শুধু যে পাস করেছি তাই নয়—চৌঠা হয়েছি! কিন্তু হলে কী হবে, প্রমোশন তো পাই নি।

নতুন ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। তখনও দিয়ে যাচ্ছি দিস্তে দিস্তে দরখাস্ত। তখনও সমানে তদ্‌বির করছি। কিন্তু কমিটিতে সবাই হিন্দু। আর আমি যে মুসলমানের ছেলে, আমার কিছুতেই হওয়ার নয়। তখন পনেরো দিন অন্তর পরীক্ষার নতুন রেওয়াজ শুরু হয়েছে। আমাদের ইংরিজির মাস্টার ভূদেববাবু ছিলেন ভীষণ মুসলমান বিদ্বেষী। লাস্ট বেঞ্চে ব'সে আছি। একদিন ডাকলেন—এখানে এসো। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। আমাকে নিশ্চয় গাঁট্টা মারবেন। ধমক দিয়ে বললেন—তুমি ফাস্ট হয়েছ, ফার্স্ট বেঞ্চিতে এসে ব'সো। শুনে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কিন্তু কতদিন আর লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাস করা যায়। হেডমাস্টার মশাই একদিন ডেকে বললেন, 'তোমাকে অনেকদিন সময় দেওয়া গেছে। কিন্তু বিনা মাইনেতে আর তোমাকে ইস্কুলে আসতে দেওয়া যায় না।'

মাইনের কথা বা-জানকে বলা যাবে না। তার মানে, আমাকে পড়া ছাড়তে হবে। আমার মনে ভীষণ দুঃখ। সেইসঙ্গে খুব অভিমান হচ্ছে।

আবার এও ভাবছি—হায় রে! এই সময় রাস্তায় যদি হঠাৎ টাকাসুদ্ধু একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেতাম!

সোমবার

এবারকার লড়াই আমাদের কী দিয়ে যেন?

কেন, কিসের জন্যে—এসব ব্যাপার এখন আমাদের কাছে গৌণ। আসলে জেলের বাইরে আর জেলের ভেতর, এ দুটোকে একাকার ক'রে দিতে হবে। বড় জেলখানা আর ছোট জেলখানা, এইটুকুই যা তফাত। দিনে দিনে এটাই তো স্পষ্ট হল, আমাদের দেশ স্বাধীন হয় নি। সাম্রাজ্যবাদ ভোল বদল করেছে মাত্র।

কমরেড প্রসাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। কমরেড স্টালিন সেই

কবে একথা ব'লে দিয়েছেন যে, এ দেশের বুর্জোয়ারা বরাবরের মতো সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়ে গেছে। তা তো হবেই, ওরা যে দেশের সর্বহারাদের অনেক বেশি ডরায়। কমরেড প্রসাদ এত সব পড়াশুনো ক'রেও পার্টির সর্বোচ্চ পদে থেকেও এই রকমের একটা ভুল ক'রে বসলেন?

অথচ কমরেড প্রসাদের মতো মানুষ হয় না। একটা দিনের কথা এখনও আমার মনে আছে। তখন সবে আমাদের দৈনিক কাগজ বেরিয়েছে। আমি তখন থাকি পার্টির কমিউনে।

সকাল আটটা থেকে একটানা কাজ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমরা তখন খুব কম লোক। তার ওপর সেদিন একজন আসে নি। ফলে, দুপুরে খেতে যাওয়া হয় নি।

হঠাৎ একজন এসে খবর দিল, কমরেড প্রসাদ ডাকছেন। পার্টি আপিসের একটা ছোট্ট ঘরে তখন প্রসাদ এসে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। প্রসাদ তখন ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন। ইশারা ক'রে বসতে বললেন। ভেতরে ভেতরে উসখুস করছি। প্রেসে আরও কপি দিতে হবে। একটু আগে তাড়া দিয়ে গেছে। ডিক্টেশন শেষ ক'রেই টিফিন কেরিয়ারটা খুললেন। খাবারটা দু জায়গায় ভাগ হল। শুধু একবার বললেন খাও। তারপর গড়বড়-করা ইংরিজিতে বলতে লাগলেন, বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘোরো। কী এখানে ব'সে আছ? জানতে চাইলেন আমার দাদু কেমন আছেন।

কার খাওয়া হয়েছে কি হয় নি, এটা এত কাজের মধ্যেও কোনো পার্টি নেতা লক্ষ্য করবেন, শুধু সেদিন কেন আজও, এ আমার আশার বাইরে। প্রসাদকে নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দিয়ে আমরা ঠিকই করেছি, কেননা সংস্কারবাদের পাঁকে পার্টিকে তিনি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু অমন মানুষ হয় না। আবার এটাও লক্ষ্য করেছি, পার্টিতে ভাল মানুষেরাই কিন্তু সংস্কারবাদের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। বিপ্লব খুব শক্ত কাজ। তার জন্যে মন শক্ত করা দরকার। ভালমানুষির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব'লেই সংস্কারবাদের জড় সহজে উপড়ে ফেলা যায় না।

তার মানে, 'কেন' 'কিসের জন্যে' এ সব প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। নইলে জেলে এসে লড়াই ক'রে এ পর্যন্ত যেসব দাবি আমরা আদায় করেছি, তাই নিয়ে আমরা তো দিব্যি বহালতবিয়তে থাকতে পারতাম। সেটা হত সংস্কারবাদ। কিছু সুখসুবিধে পেয়ে খুশি থাকার লড়াই। রুটি নয়, আমরা চাই ভেঙে নতুন ক'রে গড়তে।

সরকার চাইছে আমাদের অন্য কোথাও পাঠাতে। কোনো দূরের জায়গায়। যত দূর শোনা যাচ্ছে, বক্সায়।

এটা হল আমাদের দূরে কোথাও যেতে না চাওয়ার লড়াই। আমরা বলছি, আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে আমাদের এভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আসলে দূর ব'লে নয়, আত্মীয়বন্ধু ব'লেও নয়—আমরা চাইছি সংগ্রামী জনতার কাছাকাছি থাকতে। দক্ষিণ থেকে মুক্ত এলাকা ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। বাইরে থেকে ছাপানো যে ম্যাপটা এসেছে, তাতে দেখিয়েছে কিভাবে সাঁড়াশির মতো দুটো সংগ্রামী বাহু আমাদের এই গোটা তল্লাট বেড় দিয়ে ক্রমেই পরস্পরকে বজ্র আঁটুনিতে বাঁধতে চলেছে। পিছু হটার আগে এই সরকার আমাদের সরিয়ে ফেলতে চায়।

জেল কমিটি এতদিন ডান ঘেঁষে চলছিল। বাইরের ধাক্কায় এবার ঠিক রাস্তায় এসেছে।

বংশীর মুশকিল হয়েছে, ও পড়েছে জামাল সাহেবের পাল্লায়। জামাল সাহেবের মুশকিল হয়েছে, উনি তো ঠিক নিজের হাতে কখনও গণ-আন্দোলন করেন নি। তাছাড়া টেরোরিজমের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে ব'লে বোমাপিস্তল জিনিসটাতেই ওঁর অরুচি। এর মধ্যে হাল ধরতে পারত বাদশা। কিন্তু জেলে এসে ওর চোখে চালশে পড়েছে। সামনেই বিপ্লব, অথচ ও বলছে ও দেখতে পাচ্ছে না। তার আরেকটা কারণ, বাদশা শ্রমিক বটে—কিন্তু নিঃস্ব নয়। ওদের নিজেদের ঘরভিটে আছে।

সেদিক দিয়ে বড়াই করতে পারি আমি। বিষয়সম্পত্তির বালাই

নেই। মাসোহারা পেন্সনটা বাদ দিলে আমার দাদুও সর্বহারা। আমাদের নিজেদের ঘরভিটে ব'লেও কিছু নেই। কিন্তু মাথার কাজ। আর হাতের কাজ। ঐখানেই হয়ে যায় শ্রেণীর তফাত।

আমি দূরে কোথাও চলে গেলে দাদুর বুক ভেঙে যাবে। দাদু থাকবে মুক্ত এলাকায়। তখন দাদুর কথা ভেবে আমার কষ্ট নয় হিংসে হবে।

কাল দোতলায় বাঁকুড়ার বিড়ি শ্রমিক করালী বলছিল—এতদিন হয়ে গেল, মুক্তিফৌজ এখনও কেন আসছে না? জেল ভেঙে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে না কেন?

আমি উত্তর দিলাম—মুক্ত অঞ্চলের এখন হাজারটা সমস্যা। মুক্ত অঞ্চল মানে তো আর হাওয়া খাওয়ার জায়গা নয়।

কিন্তু যাই বলি, ও প্রশ্ন আমারও।

ব ংশার কথা

পড়া আর হল না ব'লে মন যখন খুব খারাপ, তখন একদিন আবদুল এসে বলল, 'নক্সার কাজ শিখবি? গোড়ায় দোনামনা ক'রে শেষ অবধি রাজী হয়ে গেলাম।

আবদুল হল শেখ জলিলের ছেলে। রেঙ্গুনে পিনম্যানের কাজ ছেড়ে শেখ জলিল দেশে এসে রেলের আপিসে করত রসিদ লেখার কাজ। বিয়ে করেছিল ইদ্রিস খানসামার মেয়েকে। আবদুলের মার সঙ্গে আমার মার খুব ভাব ছিল। ওদের অবস্থা ছিল আমাদেরই মতো খারাপ। ফলে, আবদুলকেও লেখাপড়া ছেড়ে কাজে ঢুকতে হয়। ড্রইং, বিশেষ ক'রে ট্রেসিং—এ কাজে খুব বেশি ইংরিজি জানার দরকার হয় না। আবদুলের ওপরওয়ালা ছিলেন স্টোন সাহেব। আবদুলকে তিনি ভালবাসতেন। তাছাড়া আবদুলকে ব্লু প্রিন্ট করতে হয়, ট্রেসিং করতে হয়—একার পক্ষে কাজ খুব বেশি। স্টোন সাহেব বুঝতেন, ওর একজন হাতুড়ি-ফুড়কুত দরকার। কাজেই আবদুল তাঁকে বলায় আমার কাজটা অতি সহজেই হয়ে গেল।

নিজেকে বোঝালাম—অত যে ভাল ছেলে ছিল আলতাফ, অবস্থার ফেরে প'ড়ে তাকেও ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়ে দিতে হল। আলতাফ ছিল আমার চেয়ে বড়। লেখাপড়া, খেলাধুলো, দুরন্তপনা—সব কিছুতে চৌকষ। বাপ মারা যাওয়ার পর চাচা-চাচীর দৌরাত্ম্যে বাড়ি ছেড়ে মেটেবুরুজে গিয়ে এক বাড়িতে জায়গিরি নেয়। জায়গিরি জানেন তো? কারো বাড়িতে থেকে খেয়ে ছেলে পড়ানো। ওর ঘরে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ধর্মপুস্তক বিজ্ঞান—সব রকমের বই ছড়ানো থাকত। ইংরিজি ডিক্সনারি মুখস্থ করা ছিল ওর বাতিক। কী একটা প্রেমের ব্যাপারে নাকি ঘা খেয়ে আলতাফ পরে হয়ে যায় বাউণ্ডুলে। সেই আলতাফ আমাকে সাহস দিয়ে বলল, 'ভয় কি? নাইটইস্কুলে আমরা প'ড়ে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব।' শুনে মনে জোর পেলাম।

তো মন স্থির ক'রে কাজ আরম্ভ করলাম। এতদিনে লক্ষ্য করলাম পাড়ায় বেশ গুঞ্জন উঠেছে—তাহেরের নসিব ফিরেছে, তাহেরের মেজ ছেলে নক্সার কাজ পেয়েছে। ওয়াছেল মোল্লার দোকান থেকে দু টাকা চোদ্দ আনা দিয়ে দাদা আমাকে একটা সিল্কের শার্ট কিনে দিয়েছিল। সেই শার্ট প'রে কাজে গেলাম। মা, দাদা—ওরা বলল, আপিসে যাবি একটু ধোপদুরস্ত হয়ে। পাড়ার লোকে নানা উপদেশ দিল। অনেকে খুশি হল আবার কেউ কেউ হিংসেও করতে লাগল.

পাড়ায় একটা জোর আড্ডা বসত মোল্লাদের দলিজে। আমি কাজ পাওয়ায় নিয়ামত চাচা খুব খুশি হয়েছিল। নিয়ামত চাচা কাজ করত লিলুয়ায় রেলের রেকর্ড কীপারের আপিসে। কী কাজ? না আপিসের কাজ। আসলে যে দপ্তরীর কাজ, সেটা ভেঙে কখনও বলত না। আর মুখে এমন রাজাউজির মারত যে, পাড়ার লোকে ঠাট্টা ক'রে তাকে বলত 'বড়বাবু'। নিয়ামত চাচা খুশি এইজন্যে যে, পাড়ার একটা ছেলে যাই হোক আপিসে তো কাজ পেয়েছে, আর সব তো ধোপা নয় কারিগর। নিয়ামত চাচা বলল, 'শোনো, সিল্কের

শার্টটার্ট প'রে যেও না, ওসব বড়মানুষি। তাছাড়া দুদিনে ছিঁড়ে যাবে। তার চেয়ে একটা হাফশার্ট কেনো। শনিবারে ধুয়ে ইস্ত্রি ক'রে নেবে। মন দিয়ে কাজটা করো। গরিবের ছেলে। অবস্থার উন্নতি হবে।' তারপর বললেন আমি যেন এইভাবে এইভাবে আপিসে চলি। পাড়ার লোকে নিয়ামত চাচার কথাগুলো হাঁ ক'রে শুনল আর সেই সঙ্গে আমার ওপর তাদের খানিকটা হিংসে যে না হল তা নয়।

বা-জানের খুব ফুর্তি। ছেলে আপিসের কাজ পেয়েছে। বলল. 'এখেনে ভাল ক'রে কাজ শিখে নে। পরে পালবাবুকে ব'লে আমাদের কারখানায় ঢুকিয়ে নেব।' বা-জান আবদুলকে ডাকিয়ে এনে খুব আদরযত্ন করল। বা-জান এই প্রথম আমাকে ডেকে কথা বলতে লাগল। আমারও বেশ একটু হামবড়াই ভাব হল। নক্সার কাজ করে ব'লে পাড়ায় আবদুলের কত নাম। পাড়ার মেয়েরা পর্যন্ত আবদুল বলতে অজ্ঞান। আমি ভাবলাম—হবে, আমারও ঐ রকম হবে।

আপিসের কাজ করলেও আবদুলের কোনো অহঙ্কার ছিল না। মাথা খুব ঠাণ্ডা ছিল, আবার তেমনি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে মারপিটেও তার জুড়ি ছিল না। একবার রাগলে রক্ষে নেই। ফলে, পাড়ার ছেলেছোকরারা তাকে খুব মানত। নিজেদের পয়সা খরচ ক'রে তাকে মদগাঁজাতাড়ি খাওয়াবে, বেশ্যাবাড়ি নিয়ে যাবে, কাপড় না থাকলে কাপড় কিনে দেবে। আবদুল ছিল হিসেবী। বাপের অনুগত। আমাকে সে আপিসে ভাই ব'লে পরিচয় দিত। সে তুলনায় আলতাফ একটু যেন দাম্ভিক।

যাই হোক, রোজ তো কাজে যাচ্ছি। ব্লু প্রিন্ট করি, ফাইফরমাশ খাটি। পয়েন্ট ক্রসিং, বোলিং, ফিটিং, কামারশাল—এমনি ডিপার্ট ডিপার্ট থেকে নানা নম্বরের নক্সা আনা-নেওয়া করি। ট্রেসিং ক্লথ, ট্রেসিং পেপারের ওপর ইংরিজি হরফ নক্সা করার কাজ শিখি। নাইট ইস্কুলে ভর্তি হলাম বটে, কিন্তু পড়ার দিকে আর সে রকম টান নেই।

আবার কিছুদিন যাবার পর আপিসটাও আর তেমন ভাল লাগে না। গেটের গোড়ায় টাইম আপিসের ছাদে ব্লু প্রিন্টের সাজসরঞ্জামগুলো যখন আনতে যেতাম, বেয়ারা টেয়ারা অনেকে থাকত কিংবা যখন শপে গিয়ে কারখানার কাজ হচ্ছে দেখতাম, চেনাশুনো কারিগরদের সঙ্গে কথা বলতাম—তখন ভাল লাগত। কিন্তু আমি তো আপিসের বাবু, ওদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করলে ইজ্জতে বাধে।

আপিসে ইংরিজিতে কথাবার্তা। কে কী বলে বুঝি না। আবদুল সব সময় আমাকে সামলে সুমলে নিয়ে চলে, চট্ ক'রে বাংলায় বুঝিয়ে দেয়। ড্রাফ্ট্‌স্‌ম্যান দুজন--চৌধুরীবাবু আর ঘোষবাবু। স্যুট পরেন। ইংরিজি বলেন। দুজনেই আমাকে ঘৃণার চোখে দেখেন। তাঁদের ভাবখানা—কোত্থেকে এক হাড়হাভাতে এসে জুটে প'ড়ে ড্রইঙের কাজ শিখছে, এ কাজের আর জাত থাকল না। আবদুলের কথা আলাদা।

কেননা আবদুল দেখতে ভাল। পেছনে ওল্টানো চুল। ফরসা রং। যাই পরুক মানায়। কখনও স্যুট। কখনও ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি। ধোপারাই ওকে এসব যোগাত। দামী স্যুটের সঙ্গে জুতো ম্যাচ করার ব্যাপারেই মাঝে মাঝে ঠেকে যেত। তখন ওকে উদ্ধার করত ওর ইয়ারবন্ধুরা। নিচের ঠোঁটটা একটু মোটা হলেও, ভাল পোশাকে ওকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাত। সেইসঙ্গে ছিল কইয়ে বলিয়ে। আর আমি? একে কেলে কুচ্ছিত, তায় গায়ে ধোকড়। না জানি লেখাপড়া, না পারি ইংরিজি বলতে বুঝতে। এই বাবুগিরির কাজ—আমার পক্ষে এ যেন হয়েছে কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরা।

আপিসে খুব খারাপ লাগত। ব'সে থেকে থেকে ঘুম আসত। আবদুল এসে আমাকে ডেকে দিয়ে ধমকাত। আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে হাই তুলে তুলে ঘণ্টা গুনতাম। আর ভাবতাম কখন পাঁচটা বাজবে।

জানলা দিয়ে বাইরের গোরস্থানটার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে

থাকতাম। মার জন্যে, বাড়ি জন্যে মন উতলা হত। আবদুল বুঝেছিল কাজে আমার মন লাগছে না। এসে পাড়ার লোকদের সে কথা দুঃখ্যু ক'রে ব'লেওছে। শুনে পাড়ার লোকে ছি ছি করতে লাগল। কথাটা বা-জানের কানেও উঠল। তাহেরের ছেলে আপিসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আখের নষ্ট করছে। বা-জান বলল, 'আমি সেই আট বছর বয়সে রশিকলে ঢুকেছি। আর তুমি এমন সুযোগ পেয়েছ, তাও হেলায় হারাচ্ছ।' যখন ব'লে ব'লেও হত না, তখন শুরু হল বা-জানের গালাগাল আর ধমক।

দেড় মাস এইভাবে চলতে চলতে শেষকালে সত্যিই অচল হয়ে পড়লাম বাঁ-পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় ফোড়া হয়ে। ওয়াহেদের মা সেই ফোড়া ফাটিয়ে দিল কী একটা গাছের আঠা দিয়ে। কিন্তু তার ঘা সেরে বিছানা থেকে উঠতেই তিন হপ্তা পেরিয়ে গেল। একদিন আবদুল এসে বলল যে, দেরিতে ছুটির দরখাস্ত যাওয়ায় স্টোন সাহেব আমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সে জায়গায় নাজিরগঞ্জের অনিল ব'লে একটি ছেলেকে কাজে ভর্তি করেছেন।

বা-জান আমার ওপর রেগে খুন। আমি যে ফোড়া হয়ে তিন হপ্তা যেতে পারি নি, বা-জান তা বললেও কানে তুলবে না। 'আপিসে গিয়ে কেবল ঘুমুলে, তাতে কি আর কারো চাকরি থাকে?' চৌধুরী-বাবু ঘোষবাবুকে ধ'রে বা-জান উঠে প'ড়ে লাগল আমাকে আবার নক্সার কাজে ঢোকাতে। চৌধুরীবাবুর পাতিলেবুর ওপর খুব ঝোঁক। আমাদের বাড়িতে বারোমেসে পাতিলেবুর গাছ আছে। পাতিলেবু আর চাষের জিনিসপত্তর যুগিয়ে চৌধুরীবাবুর মন পাবার কত চেষ্টা, করল বা-জান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

বা-জান তখন আমার ওপর ক্ষেপে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে গালাগালি। আমাকে দেখলেই বা-জান তেড়ে আসত। বলত 'দূর হ' দূর হ' বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা—'

পার্টির লাইনটা যে ঠিক, তার বড় প্রমাণ এখন আর আমরা শুধু পরের দিকে তাকিয়ে নেই। এখন আমরা নিজেদের দিকে তাকাতে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখছি। শুধু বর্তমান নয়, অতীতকেও আমরা খুঁড়ে খুঁড়ে যা নেবার তা নিচ্ছি, যা ফেলবার তা ছুঁড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলছি।

ইস্, আর দু বছর আগে যদি আমরা কমরেড প্রসাদকে সরিয়ে দিয়ে, তার মানে সংস্কারবাদকে হটিয়ে, আজকের এই লাইনে চলে আসতে পারতাম—

তাহলে আর স্বাধীনতা জিনিসটা ভিক্ষের দান হিসেবে আসত না। আমরা পেতাম সশস্ত্র লড়াই ক'রে বীরের ভোগ্য স্বাধীনতা।

ইংরেজকে তাড়িয়ে তাহলে আমাদেরই হাতে ক্ষমতা আসত। দেশের পুরো চেহাবাটাই যেত বদ্‌লে। দেশ ভাগ হত না। হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি হত না।

অবশ্য যা হয় নি, তা নিয়ে অনর্থক বুক চাপড়ে লাভ নেই।

বংশীর কোনো কোনো কথা শুনে মনে হয়, বাইরের নেতৃত্ব জেলের নেতৃত্বের ওপর খুব প্রসন্ন নয়। প্রসন্ন না হওয়ারই কথা। আমার নিজেরই অনেক সময় জামাল সাহেবদের ধরনধারন ভাল লাগে না। বংশীর মাথা খাচ্ছেন জামাল সাহেব। বংশীর চলায় বলায় এসেছে একটা বুড়োটে ভাব। এই করলে সেই হবে—সব কিছুর এদিক সেদিক উল্টে পাল্টে ভাববে। আমি যদি বংশীর জায়গায় থাকতাম—আগে তো আমি লাগিয়ে দিতাম, তারপর ভাবাভাবি।

এও জানি, আমার যত লাফঝাঁপ শুধু মুখেই। তাও নয়, আসলে আমার সমস্ত তড়ফানি মনে মনে।

কাজের বেলায় এসে কী হয়, এই এক হাঙ্গার-স্ট্রাইক দিয়েই তা

বিলক্ষণ বুঝছি। যখন এই ডাইরি লিখছি, তখনও যে ঠিক ঝেড়ে কাশছি তা নয়। মনে মনে যা হয়, লেখবার সময় তা হুবহু এক হয় না। শুধু যে কাটছাঁট হয় তা নয়, লিখতে গিয়ে মনের ভাব বদ্‌লে যায়।

আমি অবশ্য বিজ্ঞান পড়ি নি। একজন আমাকে বলেছিল, পরমাণুর ভেতরে কী হয় তা চাক্ষুষ করা কোনোদিন নাকি সম্ভব হবে না। কেননা দেখতে গেলে আলো চাই। আর আলো ফেললেই অস্তর্কাঁপুনিতে সব সরে নড়ে যায়।

যদি তাই হয়, তাহলে বলব মন জানার ব্যাপারেও বোধহয় এই রকমটাই ঘটে।

আসলে আমার কষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যের পর আমার কান পড়ে থাকে জেলগেটে। কখন শুনতে পাব একটা হর্নের শব্দ।

ফোর্সফিডিং থেকে আজ যে আমি বাদ গেলাম, তার জন্যে খুব একটা আপশোস হচ্ছে না। একটু সর্দির ভাব হওয়ায় নাকে নল ঢোকাতে গেলেই আমার হাঁচি আসছিল। তখন ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে আজ থাক। তার উত্তরে আমিও বললাম, আজ থাক।

ওটা বলা আমার উচিত হয় নি। কেননা 'আজ থাক' বলা মানেই 'তাহলে কাল হবে'। এটা একটা আপোসের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না কি ?

কিন্তু কথাটা হল, এই ক'রে আর কতদিন চলবে ?

হয়ত চলবে। বিড়িতামাকের ব্যাপারটা থেকে সেটা মনে হচ্ছে। এরা যে কী ক'রে আবার নতুন স্টক যোগাড় ক'রে ফেলল, সেটাই আশ্চর্য। রেশনের বরাদ্দ যা ছিল তাই আছে।

একেবারেই ভাল লাগছে না। বাদ্‌শার জীবনের গল্পটা অবধি জ'লো লাগছে। শুরু ক'রে মুশকিলে পড়েছি। এখন আর ছাড়া যায় না।

একবার যখন ধরেইছি, তখন সব কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ছি না।

এখন যে ইস্কুল, আগে সেটা ছিল নুরুল দেওয়ানের হাওয়াখানা। মানে বাগানবাড়ি। নুরুল দেওয়ান ছিল ডাকসাইটে জমিদার। সেইসঙ্গে সি-সি মেন কারখানার হেড ড্রাফ্ট্সম্যান। তার ছিল জুড়িগাড়ি। তার বাড়ির সামনে দিয়ে গাড়ি চড়ে কারো যাওয়ার হুকুম ছিল না। পাড়ায় এমনি তার দবদবা। আজ তার ছেলেপুলে নাতিপুতিদের থাকার মধ্যে আছে বাপদাদাকেলে বাড়িটা। তাও নানা হিস্যায় ভাগ-হওয়া। সেই থেকে আজ অবধি ঐ বাড়ির বেশির ভাগ বংশানুক্রমে করে চলেছে নক্সাঘরের কাজ। বাদবাকিরা কেউ সওদাগরী আপিসে কেউ ডাকঘরে কেরানী।

ঐ বাড়ির নুরন্নবীও হয়েছিল হেড ড্রাফ্ট্সম্যান। অসুখের পর ওদের বাড়িতে বা-জান আমাকে পাঠাল নক্সার কাজ শিখতে। দেওয়ানবাড়ির ছেলেরা তো ছিলই, তাছাড়া সেখানে আরও অনেকে শিখতে আসত। একজন ছিল বেচারাম। তার বাপ ছিল টাটা কারখানার ফর্মা ঘরের বড় মিস্ত্রি। বেচাদের বাড়ির অবস্থা মন্দ ছিল না। কিন্তু যে যতই শিখুক, কাজ হওয়ার বেলায় হত ঐ দেওয়ান-বাড়ির ছেলেদের। দেড় দু বছর ধ'রে শিখেও যখন কিছু হল না, তখন বেচারাম একদিন রাগারাগি ক'রে ধ্যেত্তোর ব'লে চলে গেল। আরও একটা কারণে দেওয়ানবাড়ির ওপর আমার ঘেন্না ধ'রে গেল। ওদের বৈঠকখানায় থাকত ওদের বাড়ির দুজন প্রাইভেট টিউটর। একজন আই-এ আর একজন বি-এ। তাদের ছিল চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। বাড়িতে থাকত ঠিক চাকরবাকরের মতো।

নুরন্নবী আমাদের শেখানোয় ফাঁকি দিত ব'লে ফাঁক পেলেই আবদুলের বাড়িতে গিয়ে নক্সার কাজ শিখতাম।

এই সময় আমি ভিড়লাম কাদের শেখ আর গেন্দা শেখদের দলিজের

আড্ডায়। সব কুকাজেই পাণ্ডা ছিল ব'লে কমবয়সীরা ওকে 'মাস্টার' ব'লে ডাকত। আড্ডার অনেকেই জাহাজের কাজ নিয়ে বিলেতে গিয়েছিল। তাদের কাছে শিখে আড্ডার সবাই একজন আরেক-জনকে 'জন্' ব'লে ডাকত। বারোজন ইয়ার নিয়ে গড়ে উঠেছিল ব'লে এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'বারোয়ারী'। বেশির ভাগই ছিল আবদুলের প্রাণের বন্ধু এবং এক গেলাসের ইয়ার। কয়েকজন অবশ্য মদতাড়ি ছুঁত না।

এই আড্ডায় খারাপ কথাও যেমন হত, তেমনি হত নানা বিষয়ের আলোচনা। জাহাজীরা বিলেত, পেনাং, আমেরিকা, রেঙ্গুনের গল্প বলত। ইকবাল রেঙ্গুনে থাকতে 'সওগাত' আর 'মোহাম্মদী'র গ্রাহক হয়। তাতে মুসলমান সমাজের উন্নতির কথা লেখা হত। ইকবাল সেইসব প'ড়ে প'ড়ে শোনাত।

সেই সময় পাড়ায় পাড়ায় দেখা দেয় মুসলমান ছেলেছোকরাদের নিয়ে নানা রকম সমিতি, ক্লাব, লাইব্রেরি বানাবার হুজুগ।

আমাদের পাড়াতেও দাদার চেষ্টায় একটা সেবাসমিতি গড়ে উঠল। নজরুলকে নিয়ে মুসলমান ব'লে তখন আমাদের কী গর্ব। পাঁচপাড়ায় থাকত কবি ইদ্রিস। তারও তখন খুব নাম। অনেক বইপুঁথি লিখেছে। বঙ্কিম মুসলিমবিরোধী ব'লে বঙ্কিমকে কেচ্ছা ক'রে লিখেছিল 'বঙ্কিমদুহিতা'। তাছাড়া তার আরেকটা বই 'হিন্দুনারী কুলটা' বাজেয়াপ্ত হয়। ইদ্রিসের তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা জরিমানাও হয়। সে সময়ে হিন্দুবিরোধী লেখক হলে লেখাপড়াজানা মুসলমানরা তাকে খুব খাতির করত।

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল ইদ্রিসের কাছে গিয়ে সমিতির জন্যে গান লিখিয়ে আনতে হবে। পরে ঠিক হল গান লিখবে ইউনুস। ওর ছিল দর্জির কারবার। যাত্রাথিয়েটারের ঝোঁক ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে ওর ভাব-ভালবাসা ছিল। চমৎকার কথা বলত আর ভাল বাংলা লিখতে পারত।

ইউনুসের গানে চাঁদ মামুর দেওয়া সুরে গলায় গলা মিলিয়ে ফি

রবিবার গানের দল রাস্তায় বার হলে পাড়ায় সাড়া জেগে উঠত। বারো চোদ্দ মাইল ঘুরে চাঁদাপয়সা চালডাল কাপড়জামা তোলা হত। সবাই স্বপ্ন দেখত, দশ-বারো বিঘে জমির ওপর উঠবে সমিতির ঘর—দেশে গরিবদুঃখী আর থাকবে না।

পাড়ায় নাইট ইস্কুল বসল জামাল বক্সদের দলিজে। আবদুলের বাবা বি-এন-আরের সিগন্যাল ঘরে কাজ করত। আণ্ডার-ম্যাট্রিক। ভাল হাতের লেখা। দরখাস্ত লিখতে পারত ভাল। জামাল বক্স ছিল রেলের টালি ক্লার্ক। সেই সুবাদে জুটিয়ে আনল এক মাস্টার। বিহারীলাল দে। ইস্কুল সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল। হিন্দুপাড়া মুসলমান পাড়া সব জায়গা থেকেই হুড় হুড় ক'রে ছাত্র আসতে লাগল। এমনও হল, বাপ ছেলে দুজনেই হল ছাত্র। ফতে ভাই আর হাঁদু জাদু দুজনেই খুব উন্নতি করল। নাটক নভেল পড়তে শিখে গেল। ইস্কুলের পেছনে প্রচণ্ড খাটত ফতে ভাই আর বিলায়েৎ মামু। রোজ ইস্কুল খোলা, আলো জ্বালা, সপ—মানে মাদুর—পাতা, এসব করত নিয়ামত চাচা। গোড়ায় জ্বালা হত কেরোসিনের চোদ্দ নম্বর আলো, পরে আনা হল গ্যাসবাতি।

বিহারীলাল মাস্টার ভারি মাথাঠাণ্ডা লোক। খুব মিশুক। সবাই তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তার মাইনে ছিল দশ টাকা।

মাস্টার খুব গরিব। তার বিয়ের সময় পাড়ার লোকে এক শো টাকা চাঁদা তুলল। তাই দিয়ে কেনা হল জর্জেটের ভাল শাড়ি। সোনার পাত-লাগানো খোঁপায়-গোঁজা চিরুনি। আর রুপোর পানের বাটা—তার ওপর লেখা হল: 'নৈশবিদ্যালয়ের গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ'। মাস্টার নেমন্তন্ন করতে পারে নি। ঠিক হল, জিনিসগুলো দিয়েই চলে আসা হবে। দলবলে সব গেল। গিয়ে হাজির হতেই হুলুস্থুলু কাণ্ড। চেয়ার-টেয়ার বার ক'রে, সে দেখতে হয় খাতির। সেদিন ছিল বৌভাত। না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না। হিন্দুদের বাড়িতে খাওয়া। সকলেরই খুব ফুর্তি।

গোরস্থানের একজন মুন্সী ছিল। তার কাজ কোত্থেকে কার মড়া এল না এল লেখা। তার নাম ইসলাম মুন্সী। জোলাপাড়ায় বাড়ি। সে ছিল হিন্দুবিরোধী। তাকে একজন গিয়ে ধরল। তার এক ভাই ছিল কমিশনার। মিউনিসিপ্যালিটির প্যাঁচ পয়জারে মুন্সীর মাথা আর হাত দুটোই থাকত। মুন্সীর ছিল এক কথা, হিন্দুরা আমাদের ঘাড়ে ব'সে আছে—ওদের মেরে ফেলে দিয়ে আমাদের উঠতে হবে। ওদিকে মুন্সীর কথামতো ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুলস্‌-কে ইস্কুল দেখাতে এনে পোলাও মুর্গির ব্যবস্থা হল। তিনিও ছিলেন কপালগুণে মুসলমান। এমনি ক'রে, ইস্কুলে তিন জন মাস্টার দেখিয়ে, সরকারের কাছ থেকে আট আর মিউনিসিপ্যালিটির আঠারো, মোট ছাব্বিশ টাকা এড পাওয়ার বন্দোবস্ত হল।

কয়েক বছর চলার পর ইস্কুল ঝিমিয়ে পড়ল। নিয়ামৎ চাচা রোজ ঠিক ঘড়ি ধ'রে ইস্কুল খোলে কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা কমে যায়। বাচ্চু মামু চটে গিয়ে বলে; 'শালার ছেলেগুলো এখানে সেখানে আড্ডা দেবে তবু ইস্কুলে আসবে না! হ্যাঁ, আসবে—যদি এনে রাখতে পারো দুটো ক'রে তাড়ির কলসী আর একজন মাস্টারনী।'

শেষ অবধি শুরু হল নিজেদের কোঁদল। বিহারীলাল মাস্টার চলে গেল। সে জায়গায় যে এল, সে এদের টাকা মারতে লাগল। হিসেবনিকেশ দিতে না পারায় এড বন্ধ হয়ে শেষে ইস্কুলটাই উঠে গেল।

২ [illegible] কথা   [illegible]

কেউ যখন বলত : এ কি আর এমনি এমনি করি? করি পেটের জন্যে। বাড়িতে ছ'টি পেট। ভরতে হবে তো! দুনিয়ায় পেটই তো সব।

পেট। পেট : পেট! শুনে বিচ্ছিরি লাগত। এখন মনে হচ্ছে, খুব সত্যি কথা।

এখন আমাদের ওয়ার্ডটার দিকে তাকানো যায় না। সব ঝিম মেরে আছে। সবাই যদি পেটে কিল মেরে ব'সে থাকে, তাহলে কী দশা হবে এই দুনিয়ার?

সারাদিন আমরা যে যাই করি, আমাদের মন প'ড়ে থাকে সন্ধ্যের আড্ডায়। কখন আমাদের 'কারখানা'র চুলো ধরানো হবে, তার জন্যে। আড্ডায় সব সময় যে শুনি বা বলি তা নয়। অনেক সময় নিজের মনেই ভাবি। কবে কী খেয়েছির চেয়ে, কে কবে কী দিয়েছিল কিন্তু খাই নি। সেই কথা; যে সব কথা কোনোদিন মনে ছিল ব'লে জানতাম না। সেই সব কথা।

শুনে শুনে ঠিক করি, এবার বেরিয়েই কী কী খাব। রয়ালের চাঁপ। আমজাদিয়ার মোরগমসল্লা। মোল্লার চকের দই। বাগবাজারের উষ্ণ রসগোল্লা নয়—তেলেভাজা। বড়বাজারের হিং-দেওয়া কচুরি। নারকোলের দুধে রান্না ভাত। নারকোলের মালার ভেতর পুরে, ওপরে মাটি দিয়ে বন্ধ ক'রে উনুনের তলায় রেখে দিয়ে গুমসো আঁচে ঝলসানো চিংড়ি।

কাল সন্ধ্যের আড্ডায় হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল পাইকপাড়ার কাকিমার কথা। আমার অবশ্য দিদিমা বলা উচিত। কিন্তু ছোট মামা যাকে যা ব'লে ডাকে, ছোটবেলা থেকে আমিও তাকে তাই ব'লে ডাকি। বাড়িতে কেউ বাধা দিত না। কেননা শুধু আমি যে বুঝতাম তাই নয়, সবাই চাইত আমি বুঝি যে, আম্মাই আমার মা।

পাইকপাড়ার সেই কাকিমা, আমি জেলে আসার আগে অনেকবার খবর পাঠিয়েছিলেন যে, এক রবিবারে গিয়ে তাঁর হাতের রান্না যেন খেয়ে আসি। রান্না বলতে চিংড়িমাছের ঝোল। পাইকপাড়ার কাকিমা যে খুব ভাল রাঁধিয়ে তা নয়। কিন্তু ঐ ঝোল রান্নায় তাঁর জুড়ি নেই। অনেক দেখেছি। আম্মা যে অত ভাল রাঁধত, চিংড়িমাছের ঝোলের ঐ রকম কালচে রং কিছুতেই হত না। দাদু যশোরে থাকতে সতীশ কাকাবাবু ছিলেন থানার দারোগা। কাকাবাবুর মেয়ে বুড়ি ভাল

গান গাইত। একবার গজল গানের প্রতিযোগিতায় বুড়ি হয়েছিল ফার্স্ট আর আমি সেকেণ্ড। একদিন কাকিমা কী একটা খবর দিতে আমাকে ওঁদের কোয়ার্টারের কাছেই থানায় পাঠিয়েছিলেন। দরজার কাছে গিয়ে আমি থ' হয়ে গেলাম। ঐ রকম নরম প্রকৃতির ভালমানুষ সতীশ কাকাবাবুর যে ঐ রকম ভয়ঙ্কর চেহারা হতে পারে, আমার ধারণাতেই ছিল না। একজন আসামীকে সতীশ কাকাবাবু তখন সমানে কিল চড় লাথি মারছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে রেগে বেরিয়ে এলেন। আমাকে কিছু বলতেই দিলেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় শুধু বললেন, 'বেরোও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও। থানার ত্রিসীমানায় তোমাকে যেন আর কোনোদিন আসতে না দেখি।' সতীশ কাকাবাবুর ঐ চেহারায় দেখা সেই আমার প্রথম এবং শেষ।

এখন বুঝতে পারি : চাকরির জীবনে দারোগা সতীশ কাকাবাবুর চেহারা ছিল দুটো—একটা পোশাকী আর একটা আটপৌরে।

জেলার, জেলসুপার—এদেরও নিশ্চয় তাই।

বাংলার কথা

একটা ইস্কুল ছিল, তাও উঠে গেল। একেক সময় ভাবি, দাউদ ভাইয়ের মতো জাহাজে কাজ নিয়ে পালিয়ে যাই।

আমাদের ওদিকে রেঙ্গুনে পালানো ছিল সাধারণ রেওয়াজ। পাড়ার যে কোনো দলিজে বসলেই শোনা যাবে রেঙ্গুনের গল্প। যারা ইস্ত্রির কাজ ধোপার কাজ করে, তাদের মধ্যেই এটা বেশি। যাদের অবস্থা ভাল, তাদের ছেলেরা বাপের বাক্স ভেঙে পালায়। যাদের অবস্থা খারাপ, তারা যাবে ব'লে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমায়।

জাহাজে নানা রকমের কাজ। লণ্ডিম্যান, বয়, বাবুর্চি, বারবার, ক্রু। মেটেবুরুজের ধোপাবাড়ির লোকেরা দর্জির কাজ করে—জাহাজী কাজ

বড় একটা নেয় না। জাহাজে লণ্ড্রিম্যান হয় অধিকাংশ আমাদের পাড়া থেকে। কড়েয়ার মুসলমানেরা করে বয়, বাবুর্চি, বারবার বা চুল ছাঁটাইয়ের কাজ।

আমি যদি লণ্ড্রিম্যানের কাজ চাই তো জাহাজের চিফ লণ্ড্রিম্যানকে ধরতে হবে, তাকে খাইয়ে দাইয়ে হাত করতে হবে, মাল খাওয়াতে হবে। তাতে যদি মন ভেজে তো সে বলবে—আচ্ছা এই ট্রিপে আমি তোকে নিয়ে যাব। কী ক'রে নিজেদের লোক নেওয়াতে হয় ওরা জানে। জাহাজ ছাড়ার ঠিক একদিন দু'দিন আগে সায়েবকে বলবে, একজন লোক কম আছে। সায়েব তখন বাধ্য হয়ে তার সুপারিশ মতো লোককে কাজে ভর্তি ক'রে নেবে। যে জাহাজে যাবে তাকে তখন নলী করাতে যেতে হবে শিপিং আপিসে। নলী মানে, নিজের ফটো-ওয়ালা সার্টিফিকেট। শিপিং আপিসে ঘুষের রাজত্ব। তার ওপর দালাল ইউনিয়নের গুণ্ডাদের জবরদস্তি আদায়। নলী দেবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি থেকে তিন মাসের যে মাইনেটা আগাম পাবে তার সবটাই শিপিং আপিসে ঢেলে আসতে হবে।

তবে জাহাজে অবশ্য কোনো কোনো কাজে উপরি রোজগার আছে। সমুদ্রের জলে কাপড় ধোয়া চলে না। তার জন্যে আছে আলাদা জলের ব্যবস্থা। ফলে, জাহাজে কাপড় ধোয়ার চার্জ খুব বেশি। কাজেই প্যাসেঞ্জাররা লণ্ড্রিম্যানদের দিয়ে আলাদাভাবে কাপড় ধুইয়ে নেয়। উপরি রোজগারটা বিভিন্ন হারে ভাগ হয়ে যাবে চিফ লণ্ড্রিম্যান থেকে শুরু ক'রে সাধারণ লণ্ড্রিম্যান অবধি।

বয়-বাবুর্চিদের আরও লাভ। বখশিস তো আছেই, তার ওপর চোরাপথে খাবার বিক্রি ক'রেও তারা দশ দু পয়সা পায়। তেমনি কোনো পোর্টে জাহাজ ভিড়লে মদমাগীর পাল্লায় প'ড়ে ওরা অনেকে সব দিক দিয়েই সর্বস্বান্ত হয়। ওদের ওপরওয়ালা হল বাট্‌লার—জাহাজীরা বলে বোটরেল।

ক্রুদের হেড হল সারেং। তাদের জাহাজেও যেমন জমিদারি,

গ্রামেও তেমনি জমিদারি। গাঁ থেকে লোক ধ'রে এনে জাহাজে ক্রু-র কাজে ভর্তি করায়। পোর্টে গিয়ে ক্রুর দল নিজেদের সামলাতে না পেরে চড়া সুদে সারেঙের কাছ থেকে টাকা ধার করে। পরে গলায় গামছা দিয়ে ধারবাবদ মাইনের প্রায় সবটাই হাতিয়ে নেয়।

ক্রুদের ওপর জুলুম যেমন, তেমনি তাদের অমানুষিক খাটুনি। অনেক সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। ক্রু-ফায়ারম্যানদের কাজ জাহাজের তলায় বয়লার ঘরে। কিছুদিন কাজ করলেই শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাই জোয়ান বয়সের ছেলেরা টিঁকতে না পেরে পালিয়ে যায়। অবশ্য পোর্টে পোর্টে সারেংদের গ্যাং থাকে। অনেক সময় তাদের হাতে ধরা পড়ে যায়।

দাউদ ভাইয়ের মামা হোসেন যে জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছে, আজ অবধি তার কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। ধোপাপাড়ার দর্জিদের কেউ কেউ আবার ট্যাঁকে মেম গুঁজে নিয়ে ফিরেছে।

দাউদ ভাই নিজে ছিল বি-বি-আই জাহাজে চিফ লণ্ড্রিম্যান। কয়েক ট্রিপ সফরে বেশ কিছু দেশ জায়গা দেখে এসেছে। দাউদ ভাই জাহাজে কাজ নেয় রেঙ্গুনে থাকতে।

লোকে বলে, রেঙ্গুন নাকি চিরবসন্তের দেশ। নদীতে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে সাম্পানে বেড়ায়। হাঁ? অমনি পাড়ার ছেলেরা ক্ষেপে উঠত পালিয়ে রেঙ্গুনে যাবার জন্যে। ভারতীয় আর বর্মীতে মিশে যে ছেলেপুলে হয়, তাদের বলে জেরবাদি। তাদের দেখতে যে কী সুন্দর হয়, তার নমুনা দেখেছি আমার এক খালুর বাড়িতে। রেঙ্গুনে বোমা পড়ার পর একটি জেরবাদি ছেলে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসে খালুর বাড়িতে ওঠে। খালুকে সে 'বাবু' বলত। খালু তাকে মুসলমান ক'রে নেয়। লোকে বলে, রেঙ্গুনে থাকতে আমার খালু নিশ্চয় বর্মী বিয়ে করেছিল। এ হল সেই বউয়ের সন্তান। খালু সে কথা মানতে চাইত না।

দাউদ ভাই বলে রেঙ্গুনে থাকতে খালুর দোকানে একজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সবাই তাকে বলত মাস্টার, তার আসল নাম, কী যেন ভাল, অনিল না সুনীল। বাঙালী। ব্রাহ্মণের ছেলে। জাহাজে সে চিফ লণ্ড্রিম্যানের কাজ করত। মাস্টারই তাকে জাহাজের কাজে ঢোকায়। মাস্টারের গোটা ব্যাপারটার মধ্যে ছিল একটা রহস্যের জাল। কেউ সে রহস্য ভেদ করতে পারে নি। কেননা যে কাজ ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া, সে রকম একটা নিচু কাজ একজন লেখাপড়া জানা হিন্দু, তার ওপর ব্রাহ্মণের ছেলে, নিতে যাবে কেন? ভেতরের রহস্য যাই হোক, মাস্টার বাইরে ছিল খুব দিলখোলা, আমুদে, ফুর্তিবাজ। মদ খেত, কিন্তু কেউ কোনোদিন তাকে মাতাল হয়ে বেগোল হতে দেখে নি। মাস্টার খুব মন খুলে মুসলমানদের সঙ্গে মিশত। মাস্টারকে সবাই যেমন মানত তেমনি ভালও বাসত। জাহাজের কাজ ছাড়ার পরে এর ওর কাছে খবর নেবার চেষ্টা করেছি, কেউ কিছু হদিশ দিতে পারে নি। একজন বলেছিল, 'মাস্টার হাওয়া হয়ে গেছে— আসলে নাকি মাস্টার তলে তলে ছিল স্বদেশিবাবু। হোক স্বদেশি, মানুষটা কিন্তু ভাল ছিল।'

মনে মনে দেশ ঘোরার ইচ্ছে হলেও আমার ভয় হত—পোর্ট এলে আমাকেও তো ঐ মদ মেয়েমানুষের পেছনে ছুটতে হবে আর তারপর বিচ্ছিরি সব ব্যামোয় অঙ্গ পড়ে যাবে, সারা গা পোকায় খাবে? সারাক্ষণ জল দেখে দেখে তারপর ডাঙায় এলে মানুষ নাকি বেহুঁশ হয়ে হুরীপরীদের মেকুর বনে যায়।

পরে দেখেছি, শুধু দরিয়ায় কেন, উজানী জাহাজেও ঐ মুশকিল। একবার গিয়েছিলাম এক মস্ত উজানী জাহাজ খালতে। অনেক সময় জাহাজের কলকব্জা নিজেদের দোষে বিগড়ে গেলে সারেংরা গোপনে লোক ডেকে সারিয়ে নেয়। সেই জাহাজে দেখেছিলাম তেরো-চোদ্দ বছরের একটা ফুটফুটে ছেলেকে। মুখে ছিল বেদনা মাখানো। মাইনে নেই, শুধু পেটভাতা। সারেঙের খুপরি হলে

খুপরি, কেবিন হলে কেবিন—ঝকঝকে তকতকে রাখা, ফাইফরমাস খাটা আর রাত্তিরে সারেঙের বউ হওয়া। ওকে দেখে আমার যে কী মায়া হয়েছিল কী বলব।

কাজেই যখন আমি বেকার, তখনও নিজেকে জলে ভাসিয়ে দিতে মন চায় নি।

আমার কথা **বৃহস্পতিবার**

কেউ যদি বলে 'ডালমুট' সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হবে 'দার্জিলিং'। ডালমুট আর দার্জিলিং। এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, পাগলেও বলবে না। তাছাড়া আমি কখনও দার্জিলিং দেখি নি।

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে। ছেলেবেলায় যখন আমরা মফস্বল শহরে থাকি, সেখানে কো-অপারেটিভের একটা বড় কনফারেন্স হয়েছিল। কনফারেন্সে দার্জিলিং থেকে এসেছিলেন একজন হোমরাচোমরা নেপালী ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গে এসেছিল তাঁর ছেলে। তার নামটা মনে ছিল অনেকদিন অবধি। তারপর যা হয়। ভুলে গিয়েছি। টকটকে গায়ের রং, ছিপছিপে চেহারা। দেখে মনে হয়েছিল এই সেই গল্পের রাজপুত্তুর। আমার ছোটমামার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গেও কথা বলতে চাইত। আমি তো ইংরিজি জানি না। তাই ও কাছে এলেই আমি ছুটে পালাই। ও যেদিন চলে যায়, আমাদের তখন কী মন খারাপ। তারপর অনেকদিন ধ'রে ছোটমামার সঙ্গে ওর চিঠি লেখালিখি চলেছিল, তারপর যা হয়। একদিন বন্ধ হয়ে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পরই কনফারেন্সে বেঁচে যাওয়া দুটিন টাটকা ডালমুট আমাদের বাড়িতে এল। জীবনে ডালমুট খেলাম সেই সর্বপ্রথম। তার স্বাদ আজও ভুলি নি।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম : দার্জিলিং→কনফারেন্স→ডালমুট। মধ্যপদ লোপ করলেই দুটো হয়ে গেল লাগোয়া।

আজকালকার কবিতায় এ জিনিস এখন আকছার হয় বাংলায় একে মধ্যপদলোপী সমাস বললে কেমন হয়?

কথায় কথা বাড়ে। খুব ঠিক। যেমন, এই মুহূর্তে আরও দুটো কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

জেলখানায় আমাদের যে পামেলা অ্যাভিনিউ। ওটার নাম কিন্তু আদৌ পামেলা নয়। রাস্তাটার দুপাশে পাম গাছ। অথচ নাম পাম অ্যাভিনিউ হয় নি।

ধ্বনিসাদৃশ্যে নাম হল পামেলা। মাউন্টব্যাটেনের মেয়ে পামেলাকে নিয়ে পণ্ডিত নেহরু তখন খুব আদিখ্যেতা করছিলেন। নামটা দিয়ে বুর্জোয়া নেতাদের একটু ঠুকে দেওয়া হল। নামটা দিয়েছিলেন আমাদেরই মধ্যে সাধারণ কেউ। মুখে মুখে এমন চলে গিয়েছিল যে, নিহিতার্থ না বুঝলেও, কয়েদীরা বা জেল আপিসের লোকেরাও পামেলা অ্যাভিনিউ যে কোন্ রাস্তা তা বুঝত।

আমাদের কাগজের আপিসের কর্তা ছিলেন কমরেড চৌধুরী। আমরা বলতাম শুধু 'চৌধুরী'। কবি যতীন সেনগুপ্ত খেজুরগাছ নিয়ে যা লিখেছেন, একদম তাই। বাইরেটা শুকনো বিরস, কিন্তু তা থেকেই রোজ বেরিয়ে আসত কলসী কলসী রস।

আমাদের আরও দুজন নেতা ছিলেন। হরেনদা আর জিতেনদা। চৌধুরী সকলেরই পেছনে লাগতেন। এটা ওঁর এমনই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, খুব গম্ভীর আলোচনাতেও উনি একনিশ্বাসে একজনকে বলতেন 'হারেনবাবু', আরেকজনকে 'জেতেনবাবু'। তখন আমাদের বয়স কম। পেট ফেটে হাসি আসত। একজন পুরনো কমরেড চৌধুরীর ওপর চটে গিয়ে আমাকে একদিন বললেন, 'আপনারা হাসেন। বোঝেন তো না, কী প্যাঁচ! একে অমুক ওকে তমুক ব'লে চৌধুরী দুজনকে লড়িয়ে দিচ্ছেন।'

পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন ধরতে পারলাম সেদিন খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একজন কেষ্টবিষ্টু নেতা বলেছিলেন,

'পার্টি যখন ভুল দিকে যায়, তখন তাকে ঠিক রাস্তায় আনবার জন্যে ভেতরে ভেতরে জোট বাঁধতে হয়। লেনিন এইভাবেই মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।' শুনে মনে হল, কথাটা ঠিক। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে হল, এই করতে গিয়ে পার্টিতে লেনিনের সংখ্যা বেড়ে যাবে না তো?

শিব আর শক্তি—পার্টিতে এ দুইয়ের চাই হরগৌরী মিলন। একটু ডানবাঁ হলেই, ব্যস্, গেল। অথচ সমানে চলতে হবে। সত্যি এ এক ভারি অসিধার ব্রত।

কাজেই তলিয়ে গেলেন প্রসাদ। কাছেই ছিলেন কমরেড তোড়কর। তিনি লাফিয়ে এসে ঝাণ্ডা ধরলেন। বাকি সবাই স'রে ন'ড়ে ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

আমি অত খুঁটিনাটি বুঝি না। আমি ভাষার কারিগর। আমি শুধু জেনে নেব কখন কী করতে হবে। কিভাবে করব সে ভাবনা আমার।

বাদ্‌শার যেমন ওয়েল্ডিং যন্ত্রটার জন্যে কষ্ট হয়, আমারও তেমনি পার্টির কাগজের জন্যে মন কেমন করে। পার্টিতে কাগজ আর আমি একসঙ্গে বেড়ে উঠেছি।

চৌধুরী আমার পেটি বুর্জোয়া অভিমানকে মেরে মেরে কাগজের কাজ শিখিয়েছেন। আপিসঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ এমন কিছু নয়। নেতারাও দিয়েছেন। কিংবা কাগজ ভাঁজ, বাণ্ডিল করা, ঠিকানা মারা, টিকিট সাঁটা—এসব করেছি সবাই একসঙ্গে। কিন্তু ছাপাখানা? প্রুফ দেখা, মেকআপ করা, বাদ দেওয়া, ঢোকানো, ছবি তোলানো, ব্লক আনা, গ্যালি সরানো, প্রুফ টানা, নিজে হাতে স্টিক ধ'রে হেডিং কম্পোজ, ব্লকে চিপি দেওয়া, কাতুরি দিয়ে রুল কাটা, চিৎপুরে গিয়ে কাঠের হরফ করানো—তখন আমার কত বয়স?

তারপর সেই কাগজ কত বড় হল। নিজেদের প্রকাণ্ড প্রেস। প্রত্যেকটা কাজের জন্যে আলাদা আলাদা লোক। কাগজের বহর

যত বড় হল, আমার দৌড় তত ছোট হয়ে এল। ক্ষুদ্রায়তনে হাতের কাজ আর বৃহদায়তনে কলের কাজে যে তফাত হয়।

পার্টির সেই কাগজটার জন্যে আমার এখনও মন কেমন করে। বাদ্‌শার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, বেরোলেই ওর যন্ত্রটা ও ফিরে পাবে। কিন্তু আমার সে উপায় নেই। কেননা সে যন্ত্র এখন সরকার গায়েব ক'রে নিয়েছে।

একটা নিষ্ঠুর নৃশংস সরকার। আমাকে আর আমার এতগুলো ভাইকে এই সরকার তিলে তিলে মারছে।

তার মানে, যা ভেবেছিলাম তা নয়। বাইরে বোধহয় এখন আমাদের মুঠোর জোর একটু কম। সরকার বোধহয় আমাদের আরও কিছু মরামুখ দেখতে চায়।

বাদ্‌শার কথা

দাউদ আলির দলিজে, আঃ, কী একখানা আড্ডা হত। মাসিক কাগজ, খবরের কাগজ ওরা পয়সা দিয়ে কিনত আর আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিত।

ভূগোলে পড়েছি আমি—কেপ অব গুড হোপ, বাংলায় বলে উত্তমাশা অন্তরীপ; ভিক্টোরিয়া স্টেশন—সেখানে আছে মজার সিঁড়ি, পা দিয়ে দাঁড়ালেই ওঠানামা করা যায়; টেম্‌স্ নদী—তার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গকাটা রাস্তা।

বলা মাত্র, শ্রোতার দল লাফিয়ে উঠত—আরে, তুই জানলি কী ক'রে? আমরা তো দেখে এসেছি।

কাগজে তখন পড়ছি ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণের কথা। মুসোলিনি, হাইলে সেলাসি। হিণ্ডেনবুর্গ উড়োজাহাজ। সব মিলিয়ে ঐ আড্ডাটা আমার কাছে নেশার মতো লাগত।

এদিকে সংসারেও খুব টানাটানি। গেস্ট কীনের সামনে ছিল

একটা ফুলুরিবেগুনির দোকান। সেখানে খাতা লেখা আর বাজার করার কাজে লেগে গেলাম। মাইনে নেই, তবে বিনিপয়সায় ফুলুরি বেগুনি খেতে পাই।

তখন আমার রোজগার বলতে ফতে ভাই আর কাদের শেখকে পড়িয়ে মাসে একটাকা একটাকা দুটাকা। তাছাড়া ওরা আমাকে সিনেমা দেখায়, বনভোজনে গেলে সঙ্গে নিয়ে যায়। লোকগুলো খুব দিলখোলা, পয়সার ওপর মায়া নেই। ধোপার কাজে কাঁচা পয়সা। কিন্তু ওদের স্বভাব ভাল। মদটদ খায় না। সেইসঙ্গে আমার গর্ব, ওদের আড্ডায় আমি বসতে পাচ্ছি, নানা রকমের জ্ঞান হচ্ছে।

বা-জানের রাগ, আমি কিছু করছি না। শুধু গিল্‌ছি আর বয়সের চেয়ে মাথায় বেশি ঢ্যাঙা হয়ে যাচ্ছি। এর পর কি আর কেউ কাজ দেবে? বা-জান মুখ-ঝাড়া দিয়ে খালি বলত, ধোপাদের সঙ্গে মিশছিস—গাধা হয়ে যাবি।

আমাকে টিট করার জন্যে বা-জান আমাকে তার কারখানায় রিবিটম্যানের কাজে ভর্তি ক'রে দিল। আমাকে কাজ করতে হবে ঠিকেদার গঙ্গারাম নস্করের কাছে।

ছোট থেকে শুনে এসেছি যে, কারখানায় বা-জান একজন কেষ্টবিষ্টু লোক। বা-জানের খুব খাতির। আর এইবার বা-জানের সঙ্গে কারখানায় ঢুকে দেখি কোথায় কী। সবই যে উল্টো। একেবারে সেই গেট থেকে বা-জান সবাইকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যাচ্ছে—ছেঁড়া তালি-মারা টাইম আপিসের ক্লার্ক, এমন কি যুদ্ধ-ফেরতা হোঁতকা দরোয়ানটাকে পর্যন্ত। সবাই বা-জানকে 'তুই' 'তুই' ক'রে কথা বলছে।

প্রথম দিন মেশিন শপে ঢুকে বা-জান দাঁড়াতে বলল—'এখানে দাঁড়া, ঝপ ক'রে আমি টিকিটটা দিয়ে আসি।' টিকিটের ব্যাপারটা জানেন তো? মানে, টাইম আপিসে টিকিটবোর্ড আছে। সেখান থেকে সকাল আটটায় টিকিট নিয়ে নিজের ডিপার্টের ফারবাবুর কাছে

জমা দিতে হবে। তারপর বাড়ি যাবার সময় টিকিটটা নিয়ে টাইম আপিসে জমা দিয়ে যেতে হবে।

টিকিটটা দিয়ে এসে বা-জান পেটির কাছে কাপড় ছেড়ে ডিবে বার ক'রে পান খাচ্ছে, এমন সময় বা-জানদের ফারবাবু—মানে, খগেনবাবু—ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বা-জান সেলাম ক'রে ডিবেটা বাড়িয়ে দিল। খগেনবাবুর মুখের চেহারার কোনো ভাবান্তর হল না। বা-জানকে তিনি দেখেও দেখছেন না, এই রকম ভাব। বা-জান হাত বাড়িয়েই আছে। শেষকালে খগেনবাবু যেন, খুব দয়া ক'রে ডিবে থেকে পান নিলেন। অমনি, বা-জানের চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা কৃতার্থ হওয়ার ভাব। খগেনবাবু বা-জানের হাঁটুর বয়সী। তাঁর মধ্যে বা-জান সম্বন্ধে এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আমিও সব কিছু বুঝেও না বোঝার ভাব ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বা-জান আমাকে রিবিটম্যানের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে কাঠের রোলার—যার ওপর ফেলে লোহার চাদর বিঁধ করা হয়। দেখলাম সেই রোলারের ওপর একটা পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকেদার গঙ্গারাম নস্কর। গায়ে গলাবন্ধ কোট। দামী হলেও, দাগ লাগা কাজের পোশাক। কারিগররা খুব ব্যস্তসমস্ত। কেউ রং নিয়ে আসছে। কুলীরা প্লেট নিয়ে এসে চাতালে রাখছে। কেউ দাগ মারছে। আটটা বাজতেই সব হুলুস্থুলু পড়ে গেছে।

গঙ্গা নস্করকে বা-জান আগে থেকেই বলা কওয়া ক'রে রেখেছিল। বা-জান ডেলির লোক। যারা ঠিকে নেয়, তারা ডেলির লোকদের হাতে রাখে। কেননা অনেক সময় তাদের যন্ত্রপাতির দরকার হয়ে পড়ে। বা-জানের সঙ্গে গঙ্গা নস্করের আলাপ সেই সূত্রে।

আমরা ঘরে ঢুকেছি, গঙ্গা মিস্ত্রি দেখেছে। তবু সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকল।

বা-জান আমাকে ধমক দিল, 'মালকোঁচা মার। এখেনে বাবুগিরি করতে এয়েচ ? হাঁটুর ওপর কাপড় তোল্।'

মিনিট পনেরো পরে গঙ্গা নস্কর বা-জানের দিকে তাকাল। বা-জান আর্জি জানাল। গঙ্গা মিস্ত্রি রাজী হয়ে ভুলো মিস্ত্রির সঙ্গে আমাকে কাজে লাগার হুকুম দিল। কিন্তু সবটাই সে জানিয়ে দিল ঘাড় মুখ আর চোখের ভাবে—একটাও কথা খরচ না ক'রে।

কারখানায় বা-জান যে কী তা প্রথম দিনেই আমার জানা হয়ে গেল।

আমার কথা শুক্রবার

বাতাপি ভস্মের ব্যাপারে কী কুক্ষণেই অগস্ত্যমুনির কথাটা মনে হয়েছিল। এ যে দেখছি আমাদের হাঙ্গার-স্ট্রাইকটা একটা অগস্ত্য-যাত্রা হয়ে উঠল। এর কি শেষ নেই?

সকাল থেকে মেঘে মেঘে আকাশ ভার হয়ে আছে। সেইসঙ্গে একটা বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা হাওয়া। সবাই নিচে নেমে গেল স্নান করতে। আমার আজ ইচ্ছে করছে না। একে শীত, তার ওপর বৃষ্টি হতে পারে।

মুরারিবাবুর টুং-টাং শুনে হঠাৎ মেঘদূতের কথা মনে হল। আকাশে মেঘ করেছে বলে নয়, দিন যখন খটখটে থাকে তখনও মাঝে মাঝে ভেবেছি। বন্দী মুরারিবাবু হলেন অভিশপ্ত যক্ষ। দুজনেরই বাড়িতে নবোঢ়া স্ত্রী। মেঘ না হলেও চলে। আসল কথা এই বিচ্ছেদ। তাছাড়া সেই কবে কলেজে পড়েছি। মেঘদূতের কোনো শ্লোক দূরের কথা, গল্পটাও ভাল মনে নেই। যক্ষ নির্বাসিত হয়েছিল। কিন্তু তাকে কারাকক্ষে থাকতে হয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না।

শুধু একটা কথা মনে আছে। এন্-কে-বি মেঘদূত পড়াতে পড়াতে একদিন বলেছিলেন, 'হর্ম্য, কথাটা পরে এসেছে। আগে বলা হত 'ঘর্ম্য'। ঘর্ম থেকে ঘর্ম্য। ঘর্ম মানে গরম। 'ঘর্ম্য' ছিল প্রাচীন আর্যদের বাড়িঘরের কাঠজ্বালা উনুন। তাই থেকে হল আরামদায়ক ঘর—গরমের সঙ্গে আর কোনো যোগ রইল না। আরও এগোতে এগোতে

হল বড়লোকদের উঁচু উঁচু বাড়ি। ধ্বনির দিক থেকে 'ঘর্ম্য' কী ক'রে 'হর্ম্য' হয়ে গিয়েছিল তাও বলেছিলেন। মূলে ছিল 'ঘ'—তার মানে 'গ'-আর 'হ' জোড়া। কিন্তু পরে 'গ' খসে যাওয়ায় 'ঘর্ম্য' হয়ে গেল 'হর্ম্য'। কিন্তু বৈয়াকরণেরা ভারি গোঁড়া। তাঁদের কাছে কথার কোনো নড়চড় নেই। শব্দ অপরিবর্তনীয়। কাজেই ওসব ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার বৃত্তান্তে না ঢুকে তাঁরা ফতোয়া দিলেন 'হর্ম্য' মানে 'যা মন হরণ করে'। বড়লোকদের বড় বাড়ি দেখতে ভাল, সুতরাং 'হর্ম্য'।

এন্ কে-বির টিকি ছিল না। প্যান্টকোট পরতেন। যাকে বলে, খুব আধুনিক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করতেন না। আমাকে বলতেন খাওয়াটাই কি মানুষের সবচেয়ে বড় কথা? তোমাদের ঐ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আর ঐ ঠোকাঠুকি-করা বিদেশী বস্তুবাদ—ও আমার শুনলেই রাগ হয়।

আমার মুশকিল, আমি আদৌ তর্ক করতে পারি না। পরের পর যুক্তি দাঁড় করিয়ে কোনো জিনিস কাউকে বোঝাতে পারি না। আমি নিজেও কোনো জিনিস বুঝতে পারি না। কিন্তু কেমন যেন অনুভব করতে পারি।

লোকের মন কখন কোন্ দিকে ফিরছে, এটা আমি ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে, লোকের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে, গলির মধ্যে চায়ের দোকানে ব'সে তাদের চলাবলার ধরন থেকে কেমন যেন ধরতে পারি। আমার মধ্যে কখনও চাঙ্গা, কখনও মিয়োনো ভাব দেখে কোনো কোনো নেতা চটে যান। অথচ ওঁরা অনায়াসে আমাকে রাস্তার লোকের মনোভাবের পারদযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। কেন করেন না.

এন্-কে-বির ঐ শব্দতত্ত্বের মধ্যেও আমি সমাজের ছোটোয়-বড়োয়, গরিব-বড়লোকে ভাগ হওয়ার ছবি দেখতে পাই। সমাজ কথার মধ্যে আছে—সকলে এক হওয়া।

এখন হলে আমি এন্-কে-বির 'ঠোকাঠুকি' কথাটাকে ঠুকে দিতে পারতাম। জেলখানায় এদেশের প্রাচীন ইতিহাস পড়তে পড়তে

একটা শব্দ চোখে পড়ল। 'বিবেক'। সেকালের গ্রীসে যেমন চাপান-উতোর পদ্ধতিতে তর্ক হত, ঠিক তেমনি ছিল এই 'বিবেক'। ডায়ালেকটিক্স্-এর বাংলা দ্বন্দ্বমূলক কথাটাকে ভেঙিয়ে 'ঠোকাঠুকি-করা' না ব'লে ওঁর বলা উচিত ছিল—বিবেকী বস্তুবাদ। তাহলে আমাদের স্বদেশী আঁতে ঢের বেশি জোরে ঘা দিতে পারতেন।

এখন হলে বলতে পারতাম : 'স্যার, খাওয়া নিয়ে তো খুব আমাদের খোঁটা দেন। এই দেখুন, বাড়ি ব'সে রোজ দুবেলা আপনি চর্ব্যচোষ্য ক'রে খাচ্ছেন—আর আমরা না খেয়ে আছি। এ আপনার একেলা একাদশী ক'রে ওবেলা পেট পুরে ফলাহার করা নয়, অম্বুবাচীর উপোষ করা নয়। দুবেলাই কেবল জল। আর একটু নুন। আপনি যাচ্ছেন বোস্টনে, নাকি ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে ? যান শব্দরূপ ধাতুরূপ আউড়ে অনেক ডলার পাবেন। দুটো কথা আলাদা করলে হবে আত্মার উন্নতি, একসঙ্গে করলে আত্মোন্নতি। স্যার, দুটোতেই আপনার লাভ।'

আসলে আমার রাগ এন্-কে-বির ওপর নয়। দুনিয়ায় এখন যারা যারা খাচ্ছে তাদের সকলের ওপরই আমার রাগ। দাদুও কি আর আমার কথা ভেবে না খেয়ে আছেন ? চোখে জল, কিন্তু পাতে ভাত। দুনিয়ায় কেউ আমাদের দেখছে না। কেউ আমাদের কথা ভাবছে না।

সকলের ওপরই আমার এখন রাগ। একমাত্র কমরেড স্টালিন ছাড়া।

বাদ্শার কথা

বাবা, দাদা, আমি—আমরা এবার একই কারখানায়। প্রথম দিন কাজে যেতে সে কী আনন্দ! একসঙ্গে খাব, একসঙ্গে যাব,—একই কারখানায় এক বাড়ির লোক—ফিরবও সেই একসঙ্গে।

আমাকে দিয়েছে দাগ মারার কাজ। দাদা করে মেশিন শপে

বয়ের কাজ। সকালে তিনচার বার এসে আমাকে দেখে গেল। দশটা নাগাদ দাদা একবার আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে চা খাইয়ে গেল। মজুররা তিনচার জনের দল ক'রে চা চিনি দুধ চাঁদা দিয়ে এই সময় চা তৈরি ক'রে খায়। কখন যে বারোটার হুইসেল বেজে গেল বুঝতেই পারি নি।

দাগ মারার কাজ খুব ভাল লেগে গেল। আস্তে আস্তে নক্সা বুঝতে শিখলাম। কিন্তু আমাকে সেখানে রাখল না। ভুলো মিস্ত্রি ভারি কড়া লোক। বলত, কাজের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো খাতির নেই। যে সুতো ধরতে পারে না, পঞ্চ মারতে পারে না— তাকে ভুলো মিস্ত্রি কিছুতেই রাখবে না।

ঠিকেদার গঙ্গা নস্কর তখন আমাকে চালান করল তিনকড়ি মিস্ত্রির কাছে। আমাকে সে মানানের কাজে লাগিয়ে দিল। অসম্ভব খাটুনির কাজ। জাহাজের খোলের মধ্যে ভ্যাপ্‌সা গরমে—তাতা লোহার প্লেটের ওপর দাঁড়িয়ে—হাম্বর মারতে হবে। দুদিনেই আমার চেহারা পট্‌কে গেল।

তখন আমার বয়স পনেরো। হাম্বর মারতে মারতে আমার মন ভেঙে যেত। বোটের খোলের মধ্যে ব'সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। ভদু মিস্ত্রি, তিনকড়ি মিস্ত্রি কথায় কথায় গালাগাল দিত। আসলে সবাই চাইত ফাঁক পেলেই নিজেদের লোক ঢোকাতে। আমি ওদের লোক নই। তাই আমাকে ওরা চাইত পদে পদে হেনস্থা করতে। নইলে আগে মানানের কাজ শিখে তারপর দাগ মারার কাজে যাবে—এটা বলা নিছক একটা বাজে ওজর ছাড়া কিছু নয়। মনে মনে খালি ভাবতাম, এই রিবিটম্যানির বদলে যদি ডেলির কুলির কাজও একটা জুটত। কারণ, সরাসরি কোম্পানির অধীনে ব'লে ঠিকের কাজের চেয়ে ডেলির কাজের ইজ্জত বেশি ছিল।

খুব লজ্জা করত যখন কোনো কাজ নিয়ে বা-জানের ডিপার্টে যেতে হত। হয়ত করাতকলে কিছু কাটতে হবে—রিবিটম্যানির ঘর থেকে কাঁধ

মেরে লোহার পাটি নিয়ে যেতে হত বা-জানদের মেশিন শপে। অন্য ডিপার্টে মাল বইবার আলাদা কুলি আছে, আমাদের ঘরে যার যার মাল কাঁধে ক'রে নিজেদেরই বইতে হত। বা-জানের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে আরও যেন মরমে মরে যেতাম। ছোটবেলায় বা-জান কত বড়াই ক'রে পাঁচ জনকে বলত—মেজ ছেলেটা লেখাপড়া শিখছে। মানুষ হবে।

রাগে দুঃখে অভিমানে এমনভাবে ভেতরে ভেতরে ফুলছিলাম যে, একদিন আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারলাম না। তুচ্ছ একটা কারণে একেবারে ফেটে পড়লাম।

একদিন একটা হ্যাংলাইনে কাজ হচ্ছে। এমন সময় আমার হাতের রেঞ্চ হাত ফসকে প্রচণ্ড শব্দে পড়ে গেল। হ্যাংলাইনের একটা কোণ ধ'রে ছিল গঙ্গা নস্কর। আরেকটু হলেই রেঞ্চটা তার পায়ে পড়ত। পড়লে তার পা দুখানা হয়ে যেত। তাই গঙ্গা নস্কর আমাকে মা তুলে গাল দিল। হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ধাঁই ক'রে রেঞ্চটা ছুঁড়ে দিলাম। মাথা সরিয়ে নেওয়ায় রেঞ্চটা সজোরে পেছনে লোহার দেয়ালে লেগে ছিটকে গঙ্গা মিস্ত্রির কাঁধে এসে লাগল। আমি তার আগেই ছুট দিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান পেরিয়ে তারপর ছুটতে ছুটতে যখন গেটে দাদা যেখানে সাইকেল রাখত সেই পর্যন্ত পৌঁচেছি, তখন ধরা পড়ে গেলাম। তখন সে এক বিরাট হল্লা, গঙ্গা নস্কর আমাকে ধ'রে নিয়ে গেল বা-জানের কাছে।

বাড়ি ফিরে বা-জানকে বললাম—অন্য যে কোনো কাজ দাও করব। কিন্তু রিবিটম্যানির কাজ আর নয়। বা-জান রাজী হল না। পাঁচ ছ' দিন পরে সেই গঙ্গা নস্করকে ধ'রেই আবার আমাকে কাজে ভর্তি ক'রে দিল। তখন আমার রোজ ছিল পাঁচ আনা।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগত হীরু মিস্ত্রিকে। খুব মন দিয়ে আমাকে কাজ শেখাত। ক্লাস নাইন অবধি পড়া গরিবের ছেলে বীরেন সরকারও

আমার সঙ্গে কাজ শিখত। আর ছিল আব্বাস। রিবিটম্যান ঘরের অ্যাসিসটেন্ট ফোরম্যানের আপন ভাইয়ের ছেলে। আব্বাস ছিল বাঙাল। ত্রিপুরায় বাড়ি। দুখ্যু ক'রে বলত, 'হালায় আমার চাচা ফোরম্যান হইয়াও হ্যাশে কুত্তার কাজে ঢুকায়ে দিল্।' শুনে আমি সান্ত্বনা পেতাম।

এর মধ্যে একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কারখানার কাজের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন একটা নতুন ধরনের আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি মাথা তুলতে চায় এর সঙ্গে ওর হিংসাদ্বেষ খেয়োখেয়ি।

এমনিভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন আমাদের মাথায় হাত। কী সর্বনাশের কথা! গঙ্গা নস্কর ডুব মেরেছে।

ইদানীং বউ মরে যাওয়ার পর থেকেই গঙ্গা মিস্ত্রি মদ খাওয়ার মাত্রা তো বাড়িয়েছিলই, সেইসঙ্গে স্বভাবচরিত্রও খারাপ ক'রে ফেলেছিল। তার বদ্‌খেয়ালের টাকা যোগাতে গিয়ে এদিকে লোক-জনদের পাঁচ ছ' মাসের মাইনে বাকি ফেলে দিয়েছিল। তার ওপর এর ওর কাছ থেকে দু দশ টাকা ক'রে যা হাওলাত করেছিল, তার অঙ্কও কম নয়।

কাজেই গঙ্গা নস্কর নিজে ডুব মেরে সেইসঙ্গে অনেক লোককেই ডোবাল। দু একজন কারিগর মিলে বড় সাহেবের কাছে গেল। বড় সাহেব হাঁকিয়ে দিল। কাজ চাওয়া হল। তাও পাওয়া গেল না। উল্টে কারখানা থেকে আমাদের বার ক'রে দেওয়া হল।

তখন অনেকে মিলে বসা হল। কেউ বলল—চলো, দল বেঁধে কোর্টে যাই। কেউ বলল—চলো, গঙ্গা মিস্ত্রির বাড়িতে যাই।

গিয়ে দেখা গেল, বাড়ি ভোঁ ভাঁ। গঙ্গা মিস্ত্রির ছেলেটাও হাওয়া।

তারপর কোর্টে যেতে একজন উকিল বলল—এ তো কুলি মজুরদের ব্যাপার। তোমরা শ্রীনাথ বাগচীর কাছে যাও, সে এইসব মজুরটজুর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে।

ঠিক-দুপুরবেলায় ওঁর বাড়িতে যাওয়া হল। কিন্তু তখন উনি বাড়িতে নেই। ওঁর স্ত্রী বললেন—আচ্ছা, আমি সব ব'লে রাখব, কাল সকালে এসে ওঁর সঙ্গে তোমরা দেখা করবে।

আমার কথা

শনিবার

সকালে লক-আপ খোলার ঢের আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৃষ্টি হয়েছিল নামমাত্র। কিন্তু তাতেও কাল 'কারখানা'র ভিয়েনে গোড়াতেই খিঁচুড়ি চাপানোর লোকের অভাব হয় নি। খিঁচুড়ির যে এত বায়নাক্কা আছে, আমার জানা ছিল না। আমরা তো ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি 'একটু চালেডালে ক'রে নিলেই হবে'। দেখলাম তা তো নয়। বাপ্‌রে!

আমার ছোটমামা খুব খিঁচুড়ি খেতে ভালবাসত। আকাশে একটু মেঘ করলেই ছোটমামা চেঁচিয়ে উঠত, 'আজ খিঁচুড়ি'। আমি বুঝে গিয়েছিলাম ছোটমামা খিচুড়ি বললে খিঁচুড়ি সেদিন হবেই। গোড়ায় গোড়ায় সেই হিংসেতে আরও আগে উঠে চট্‌ ক'রে আমি একবার আকাশটা দেখে আসতাম। কিন্তু বাড়ির ভেতর ছ্যাতলা-পড়া কলতলায় ডাঁই করা বাসনের মধ্যে দাঁড়িয়ে উল্টোমুখ হয়ে পা পিছ্‌লে পড়ার সমূহ বিপদ ঘাড়ে নিয়ে আকাশ তল্লাশি করা যে কী কষ্টকর, তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খিঁচুড়ির লাইনটা ছোটমামার জন্যে খালি ক'রে দিলাম। তার ফল এই হল যে, ছোট-মামা বিলেত যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িতে খিঁচুড়ি রাঁধা বন্ধ হয়ে গেল।

মেমসাহেব মামী যে বিলেতে ব'সে ছোটমামাকে খিঁচুড়ি রেঁধে খাওয়ায়, এটা আমার বিশ্বাস হয় না।

ছোটমামা তার জীবন থেকে খিঁচুড়ি যদি বাদ দিয়ে থাকে, তাহলেও আমি বলব—ছোটমামা তার জীবনটাকেই খিঁচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে। আমি আম্মার মতো বলব না যে, ছোটমামা মারা গেছে—

কিন্তু ছোটমামা বেঁচে আছে, এটা বলবারও আমি ঠিক জোর পাই না। তবু আশা করার থাকত যদি বিয়ে ক'রে ছোটমামা দেশে ফিরতে পারত। তা পারবে না। মেম পুষবার মতো চাকরি ছোটমামা এখানে জোটাতে পারবে না। অনেকদিন অপেক্ষা ক'রেও পারা শক্ত। এক হতে পারে আমরা যদি এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ ক'রে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারি। তার মানে ছোটমামা বাঁচবে যদি এদেশে সমাজতন্ত্র হয়।

আমাদের এই হাঙ্গার-স্ট্রাইকও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের মধ্যেই পড়ে।

তার মানে, ছোটমামার ভবিষ্যৎ ভেবে আমাকে এ হাঙ্গার-স্ট্রাইক চালিয়ে যেতে হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার থেকে ছোটমামা চিৎকার করছে—বাক্ আপ, অরু! বাক্ আপ।

ছোটমামার ভালোর জন্যে আমাকে হাঙ্গার-স্ট্রাইক চালাতে হবে? যে ছোটমামা আম্মাকে বলতে গেলে—তা এক রকম খুন করেছে তো বটেই।

আসল মুশকিল তো ছোটমামাকে নিয়ে নয়। ছোটমামা মরুক বাঁচুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। মুশকিল হয়েছে দাদুকে নিয়ে।

দাদু বড় বড় কথা বলে। নিজে তো করত ইংরেজ সরকারের চাকরি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাদু কোনোদিন কড়ে আঙুলটা তুলবার সাহস দেখিয়েছে? আর কথায় কথায় বাঘা যতীনের দৃষ্টান্ত দেওয়া। ঐ হল। গল্প বলা মানেই দৃষ্টান্ত দেওয়া! আর ঐভাবে বলা—মরেছে তবু ধরা দেয় নি।

কিন্তু দাদু, তোমাকে আমি হাতেনাতে ধরে ফেলি নি কতদিন?

একবার, তখন আমি খুবই ছোট, তোমার হাত ধ'রে হাঁটছি। একজন ভিখিরি পয়সা চেয়েছিল। তুমি 'নেই, মাপ করো' বলতেই

আমি তোমার পকেটে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলাম, 'ব্যাগটা খোলো, ওতে পয়সা আছে।' 'নেই' বলতে তুমি তো 'ইচ্ছে নেই' নয়, তুমি বোঝাতে চেয়েছিলে 'পয়সা নেই'। আমি তোমাকে আদৌ মিথ্যেবাদী বলতে চাই নি। শিশুর সরলচিত্তে আমি শুধু 'আছে'কে 'নেই' বলার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

আরেকবার আমি তোমার উঁচু মাথা নিচু ক'রে দিয়েছিলাম যখন তুমি তোমার এক দুঃস্থ ভাইয়ের চাকরির জন্যে আগে থেকে তোমার এক বন্ধুর কাছ থেকে প্রশ্নপত্র আউট ক'রে এনে তোমার সেই ভাইকে উত্তর মুখস্থ করিয়েছিলে। সেই প্রশ্নপত্রটাকে তারপর পোড়ানো হচ্ছে দেখে আমি বুঝতে না পেরে বলেছিলাম—কোশ্চেন পুড়লে সোনা দাদু চাকরির পরীক্ষা দেবে কী ক'রে? তুমি ধমক দিয়ে উঠেছিলে বটে, কিন্তু তোমার মুখ কি রকম কালো হয়ে গিয়েছিল আমার মনে আছে।

আর সেই যখন বাইরের ঘরে সরকারী উকিল তারকবাবু ব'সে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ ব'লে যেতেন, হীরের টুকরো ছেলে ব'লে আহা-মরি করতেন —আমি তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব গিলতাম। একদিন তোমাকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'উনি এই বলছেন, কিন্তু উনিই তো ওদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করছেন।' দাদু, সেদিনও তুমি কোনো জবাব দিতে পারো নি।

আমি ধরা পড়ার পর একদিন হোম সেক্রেটারি তোমাকে 'আপনার নাতির জন্যে আপনার গর্ব হওয়া উচিত' ব'লে সেই যে তোমার বুক ফুলিয়ে দিয়েছিল, হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে সেই ফানুষ ফাটিয়ে দিতে চাই।

নিজের মুখোশ তো আমি খুলবই, সেইসঙ্গে টেনে টেনে প্রত্যেকের ছদ্মবেশ খসিয়ে দেব।

দাদু, এই তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, আজ যতদিনই হোক—কতদিন

হল সেসব গোনা আমি ছেড়ে দিয়েছি, কেননা ওসব গোনাগুনি ক'রে আর লাভ নেই—

আজ যতদিনই হোক, দাদু এই তোমাকে ব'লে দিচ্ছি—তা তুমি যাই মনে করো না কেন—

আমি আর তিন দিন দেখব।

তারপর হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙব—ভাঙব—ভাঙব।

বাংলার কথা

পরদিন সকালে আমরা দল বেঁধে আবার গেলাম শ্রমিকনেতা শ্রীনাথবাবুর বাড়ি। শ্রীনাথবাবু বেরিয়ে এসে বাকি সবাইকে বাইরে থাকতে ব'লে বীরেনকে আর আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সব শুনেটুনে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি সব আদায় ক'রে দেব। তবে প্রত্যেককে একটা ক'রে টাকা দিতে হবে।' বলতে সবাই রাজী হয়ে গেল। মামলা লড়তে খরচ তো কিছু আছেই।

তারপর দিন ঠিক ক'রে বীরেনকে, আমাকে আর সেই সঙ্গে, দুচারজন মিস্ত্রি কারিগরকে তিনি ওয়ার্কম্যান্‌স্‌ কম্পেন্সেশন কোর্টে নিয়ে গেলেন। আমরা বাইরে বেঞ্চিতে ব'সে থাকলাম। ঘণ্টা দুই কেটে যাবার পর ওঁর দেখা মিলল। বীরেনকে আর আমাকে পরদিন সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। আর যারা ছিল তাদেরও বললেন মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

যতবারই ওঁর কাছে যাই, উনি অন্য কথা বলেন। বলতেও পারেন বেশ শোনবার মতো ক'রে। কোনোদিন বলেন, 'দেখ, আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা নয়, ডিমের ওপর যেমন শক্ত খোল থাকে এও তেমনি,—আসলে চাই দেশের স্বাধীনতা, আমাদের লক্ষ্য মজুররাজ আনা।' কোনোদিন বলেন, 'তোমাদের দুজনকে আমি রাশিয়ায় নিয়ে যাব। আমি গিয়েছিলাম। গোপনে

নিয়ে যাব। কেউ জানতে পারবে না। স্বাধীনতা কী জিনিস দেখলে তখন বুঝবে।'

আর ওরই মধ্যে উনি খুঁটিয়ে জেনে নিলেন কারখানার পাকা কাজের লোকদের অভাব অভিযোগ সুবিধে অসুবিধের কথা। সেইসব খবরের জোরে গেট মিটিং ক'রে শ্রীনাথবাবু কোম্পানির মজুরদের বললেন ইউনিয়ন গড়বার কথা। এই ব'লে দুচারদিনের মধ্যে তুলে ফেললেন ছ' সাত শো টাকা। কিন্তু টাকাটা নিয়ে সেই যে পিঠটান দিলেন, আর তাঁর টিকি দেখা গেল না। ওদের ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপারটাও হাওয়া হয়েই থেকে গেল।

এদিকে গঙ্গা নস্কর উধাও হওয়ার কিছুদিন পরে বীরেন, আমি, আব্বাস—আমরা কোম্পানিতে ডেলির কাজ পেয়ে গেলাম। শ্রীনাথবাবু দেশের স্বাধীনতা আর মজুরদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, আমাদের মামলার ব্যাপারেও কিছু আর ক'রে উঠতে পারলেন না। আমরাও আমাদের ঐ একটা ক'রে টাকা আক্কেল সেলামি ব'লে ধ'রে নিয়ে হাঁটাহাঁটির পরিশ্রমটা বাঁচালাম।

তাছাড়া আমিও আবার দলছুট হয়ে চলে গেলাম অ্যাণ্ড্রুলে।

বরাবরই আমার ঝোঁক ছিল ঝালাইয়ের কাজে ওয়েল্ডার হওয়ার। ওয়েল্ডার হতে পারলে কারখানায় খাতির খুব। আমাদের পাড়ার বলাই বাগ কেমন সায়েবী পোশাকে কাজে যায়। অবশ্য এ কাজে নানারকম বিপদাপদের ভয় আছে। অনেক সময় চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ভেতরে গ্যাস চলে গিয়ে শরীরস্বাস্থ্য ভাঙে।

বেতোলের ফটিক কুণ্ডু ছিল অ্যাণ্ড্রুলের ওয়েল্ডার। পয়লা নম্বরের মদখোর আর বেশ্যাবাজ। বা-জানের সঙ্গে তার চেনাজানা ছিল। মদটদ খাইয়ে, দুচার টাকা ঘুষঘাষ দিয়ে বা-জান ওকে রাজী করাল ওদের কারখানায় আমাকে ঢোকাতে। ফটিক মিস্ত্রি আমাকে ঢুকিয়ে নিল, কিন্তু সায়েবকে কিছু না বলে। ব্যস, দিন দশেক পরে সায়েব আমাকে ধ'রে ফেলতেই সঙ্গে সঙ্গে কাজ চলে গেল। বা-জান

তখন বটু মিস্ত্রি আর শিবেন মিস্ত্রিকে ধ'রে, ওদের দিয়ে সায়েবকে রাজী করিয়ে আমার কাজের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিল।

এদিকে দাদা আর বা-জানকে দেখে আমারও তখন খানিকটা হুঁশ হয়েছে। গরিব মানুষের অত মানের বড়াই ক'রে সংসারে চলা যায় না।

খালুদের টুপির কারখানায় থাকার সময় দাদাকে কম নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছে? তারপর বেঁচে গেল বা-জানের কারখানায় এসে। কিন্তু সেও কী ধরনের বাঁচা?

দাদা শিখত ইলেক্‌ট্রিকের কাজ গণি মিস্ত্রির কাছে। হিন্দুস্থানী হলেও গণি বেশ বাংলা বলতে পারত। তার একটা কারণ, গণির দুটো বউয়ের মধ্যে একটা ছিল বাঙালী। বাঙালী বউ থাকত গঙ্গার এপারে। হিন্দুস্থানী বউ থাকত ওপারে। গণির এই দুটো সংসারেরই কাজ করতে হত দাদাকে। বাজার করা ছেলেমেয়েদের কাঁথা ধোয়া—সমস্তই করতে হত দাদাকে। তাতেও কি নিষ্কৃতি ছিল? এর ওপর কারখানার কাজে পান থেকে চুন খস্‌লে গণি মিস্ত্রির হাতে চড় খাওয়া ছিল নিত্যকার বরাদ্দ। মাকে এই নিয়ে ঠাট্টা ক'রে বলতাম—এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চড়। শুনে মা-র মুখ ভার হয়ে যেত।

একবার যখন গণি মিস্ত্রি দাদাকে লাফি মেরে কাঠের উঁচু সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দিল, তখন বা-জানের টনক নড়ল। বা-জান তখন একে ওকে ধ'রে দাদাকে নিজের কাছে মেশিন শপে নিয়ে এল।

আর মাকেই বা কী বলব? রোজ বা জানের আনা বলাই মিস্ত্রির তেলচিটে ময়লা জামাকাপড় কেচে কেচে মার নিজেরই হাড় কালি হয়ে গিয়েছিল না?

এই সব মনে ক'রে আমি এবার চোখকান বুঁজে শিবেন মিস্ত্রিকে খুশি করার কাজে লেগে গেলাম। হারাধন মিস্ত্রির টিফিন এনে দেওয়া ফাইফরমাশ খাটা—সমস্তই হাসি মুখে করতে লাগলাম। মিস্ত্রি লোক

ভাল ছিল। এক মাসের মধ্যেই আমার হাতে সে হোল্ডার দিয়ে দিল। আমি তরতর ক'রে কাজ শিখতে লাগলাম। ওদিকে শিবেন মিস্ত্রি দিল কাজ ছেড়ে।

তার মাস কয়েক পর টানার মোর্শনের ওয়েল্ডার, তারও নাম বলাই মিস্ত্রি, সে করল কি, যমুনা ব'লে একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে টাটানগরে কাজ নিল। শিবেন মিস্ত্রি বামুন ব'লে ওকে আমরা ডাকতাম 'ঠাকুরদা' ব'লে। একদিন শিবেন মিস্ত্রিকে গিয়ে বললাম, 'ঠাকুরদা, টানার মোর্শনে চেষ্টা করো না। খলিল সায়েবকে ধরলেই হয়।'

শিবেন মিস্ত্রি গাঁইগুঁই করছিল। শেষকালে আমিই জোর ক'রে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ট্রাই দিয়ে ওকে সায়েবের পছন্দ হয়ে গেল। অ্যাণ্ড্রুলে শিবেন মিস্ত্রি ঢুকেছিল বয় হয়ে। তাই মিস্ত্রি হয়েও তার রোজ এক টাকার ওপর ওঠে নি। কিন্তু টানার মোর্শনে কাজে ঢুকেই তার রোজ হল আড়াই টাকা।

শিবেন মিস্ত্রি কাজ পাওয়ায় আমারও মনে শান্তি হল।

আমার কথা রবিবার

আজ রুশ লোককথার বইটা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ দেখি একটা গল্পের নাম 'যে লোকটা ভয় কাকে বলে জানত না'। গল্পটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম।

এক রাজ্যে এক ছিল সওদাগরপুত্র। গায়ে যেমনি জোর তার মনে তেমনি সাহস। এইটুকু থেকে এতবড় হয়েছে—কোনোদিন ভয় কী জিনিস জানে না। ভয় পাওয়ার জন্যে সে তখন সঙ্গে একজন কাজের লোক নিয়ে গাড়িতে ক'রে দুনিয়া ঢুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল। তারপর যে-তে যে-তে যে-তে দেখে সামনে একটা বিরাট বন। আর হবি তো হ ঠিক সেইখানে ঝট্ ক'রে রাত নেমে এল। সওদাগরপুত্র তার সঙ্গের লোকটাকে বলল, 'গাড়ি জঙ্গলে নিয়ে চলো।'

লোকটা গাঁইগুঁই করতে লাগল। তার ভয়—জঙ্গলে বাঘভালুক আছে, ঠগীঠ্যাঙাড়ে আছে। কিন্তু সওদাগরপুত্র এক ধমক দিল, 'যা বলছি তাই করো।' জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা যেতে যেতে এক জায়গায় দেখে একটা গাছের ডালে মড়া ঝুলছে। কাজের লোকটার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা। সওদাগরপুত্র লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে মড়াটা পেড়ে এনে গাড়িতে চাপাল। তারপর গাড়িতে উঠে লোকটাকে বলল, 'চালাও'। কিছুটা এগিয়ে একটা বড় বাড়ি পাওয়া গেল, তার জানলায় আলো। সওদাগরপুত্র বলল, 'গাড়ি থামাও। রাতটা আমরা এখানেই কাটাব।' কিন্তু সেই লোকটা রাজী নয়। বলল, 'ওখানে নির্ঘাৎ ডাকাত থাকে। শেষটায় আমরা ওদের হাতে প'ড়ে ধনেপ্রাণে মরব।' সওদাগরপুত্র তার কথায় কান দিল না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল একদল ডাকাত কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে গোল হয়ে ব'সে খুব খানাপিনা করছে। সওদাগরপুত্র কোনো কেয়ার না ক'রে সোজা ওদের টেবিলে গিয়ে একটা মাছ তুলে নিয়ে মুখে দিল। তারপর নিজের লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'ভাল নয় মোটে। যা তো রে, গাড়ি থেকে আমাদের মহাশোলটা নিয়ে আয় তো।' মড়াটা নিয়ে এসে লোকটা টেবিলে রাখল। একটা ছুরি দিয়ে খানিকটা কেটে নাকের কাছে ধ'রে সওদাগরপুত্র বলল, 'উঁহু, এও সুবিধের নয়। যা তো রে, ঐ জ্যান্তগুলোকে ধ'রে আন—কেটে কেটে খাই।' ডাকাতগুলো এতক্ষণ লোকদুটোর আস্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষের কথাটা কানে যেতেই সবাই পড়িমরি ক'রে ছুটে পালাল। সওদাগরপুত্র বলল, 'দেখলি তো, এর মধ্যে ভয়ের কী আছে?'

সওদাগরপুত্র এরপর একটুও ভয় না পেয়ে জব্দ করল রাত্তিরে কবরখানার এক মামদো ভূতকে। সওদাগরপুত্রের জন্যে এক রাজকন্যা জুটিয়ে এনে দিয়ে তবে সেই ভূত রেহাই পেল। রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে কোথাও ভয় না পেয়ে শেষকালে সওদাগরপুত্র ঘরে ফিরল।

কিন্তু তার মাছ ধরার এমনি নেশা যে, দিনরাত সে নৌকোয় ক'রে নদীর বুকে ঘুরে বেড়ায়। এই নিয়ে ওর মা-র ভারি দুঃখ। শেষে একদিন জেলেদের ডেকে ওর মা বলল, 'দাও তো ওকে একদিন আচ্ছা ক'রে ভয় পাইয়ে।' তারপর যে কথা সেই কাজ।

একদিন সওদাগরপুত্র নৌকোর ওপর ঘুমিয়ে আছে। ওরা করল কি, কয়েকটা পাঁকাল মাছ ধ'রে সুযোগমতো ওর জামার মধ্যে ছেড়ে দিল। যেই ওরা বুকের মধ্যে কিলবিল ক'রে উঠেছে সওদাগরপুত্র বাপ-রে মা-রে ক'রে লাফ দিয়ে উঠে জলে পড়েছে। জেলেরা ওকে জল থেকে তক্ষুনি টেনে তুলেছিল বটে, কিন্তু ভয় কী জিনিস তা সওদাগরপুত্রের এই প্রথম মালুম হয়ে গেল।

তারপর পড়লাম এক বোকার গল্প :

রাজার পাইক ঢেঁড়ি পিটিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, রাজকন্যা যার হেঁয়ালির জবাব দিতে পারবে না, তাকে বিয়ে করবে। যার হেঁয়ালির জবাব দিতে পারবে, তার গর্দান যাবে। যখন অনেক বড় বড় মাথা কাটা পড়ে যাচ্ছে, তখন এক আহাম্মক তার বুড়ো বাপের বারণ না শুনে এই রকম একটা ঝুঁকির মধ্যে মাথা বাড়িয়ে দিল।

অথচ সে এমনই আহাম্মক, ঘরে ব'সে আগে থেকে কিছুই ভাবে নি। সে তার হেঁয়ালি বানাল রাস্তায় চলতে চলতে। চোখ কান বুঁজে অন্যমনস্ক হয়ে নয়। চারপাশে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এগোতে লাগল। এক জায়গায় দেখল একটা ফসলের ক্ষেত, আর সেই ক্ষেতের মধ্যে একটা ঘোড়া। হাতের চাবুকটা দিয়ে ঘোড়াটাকে সে পিটিয়ে ক্ষেত থেকে বার ক'রে দিল। তারপর মনে মনে বলল, 'একটা হেঁয়ালি পাওয়া গেল।' আর একটু এগিয়ে দেখল একটা সাপ ; বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে সাপটাকে মারল। তারপর মনে মনে বলল, 'আরও একটা পাওয়া গেল।'

তারপর এল রাজবাড়িতে। রাজকন্যা এসে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। ঠোঁটের কোণে বিজয়িনীর হাসি। বোকা দেখে চোখে

তাচ্ছিল্য। লোকটা আহাম্মক তো। ওর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সকলের সামনে রাজকন্যার দিকে হেঁয়ালি ছুঁড়ে দিল: 'আমি বোকা তুমি কন্যা চালাক। আসতে দেখি সুয়ের মধ্যে সু এক॥ সু-র মাঝে সেই সুকে দেখে সু নিয়ে যাই তেড়ে। তাড়া খেয়ে সু পালাল সুর মাঝে সু ছেড়ে॥'

রাজকন্যা এ-বই দেখে সে-বই দেখে, কিন্তু কোনো বইতেই আর সেই বোকার হেঁয়ালির জবাব পায় না। তখন সে বলল, 'আজ মাথাটা বড্ড ধরেছে, কাল এর জবাব দেব।' বোকা সে রাতে রাজার অতিথি হয়। ব'সে ব'সে আরাম ক'রে পাইপ টানে। রাত্তিরে রাজকন্যা তার কাছে ঘড়া ঘড়া মোহর সঙ্গে দিয়ে রূপবতী বিশ্বস্ত দাসীকে পাঠাল ঘুষ দিয়ে হেঁয়ালির জবাব আনতে। বোকা বলল, এসবে আমার কী হবে? রাজকন্যাকে বলো সারা রাত না ঘুমিয়ে আমার ঘরে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে আমার হেঁয়ালির জবাব পাবে। রাজকন্যা তাই করল। জবাবটা ছিল খুব সোজা—ফসলের ক্ষেত থেকে একটা ঘোড়া তাড়িয়েছি। পরদিন সভায় বোকার কাছ থেকে পাওয়া জবাবটা ব'লে দিয়ে রাজকন্যা মুখরক্ষা করল। তখন বোকা তার দ্বিতীয় হেঁয়ালি বলল, 'আমি আহাম্মক, তুমি সেয়ানা। কুয়ের চক্কর কুলোপানা॥ কু দিয়ে এক মারলাম বাড়ি: কু কে পাঠালাম যমের বাড়ি॥' সেদিনও রাজকন্যার আবার মাথা ধরল। সে রাত্তিরেও দাসী পাঠিয়ে টাকা দিয়ে বোকাকে বশ করা গেল না ব'লে সারা রাত্তির না ঘুমিয়ে বোকার ঘরে রাজকন্যাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হেঁয়ালির জবাব পেতে হল।

তিন দিনের দিন সভা লোকে লোকারণ্য। বোকা সেদিন একটা হেঁয়ালি বলল যার মধ্যে থাকল রাজকন্যার উত্তর দিতে না পেরে প্রথমে দাসীকে পাঠিয়ে ঘুষ দিয়ে, পরে বোকার ঘরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে থেকে হেঁয়ালির জবাব পাওয়ার ব্যাপারটা।

তিন দিনের দিনও রাজকন্যার মাথা ধরল। সেদিনও তাকে সারা

রাত জেগে দাঁড়িয়ে থাকতে হল, তারপর উত্তর পেল। কিন্তু রাজকন্যা পড়ে গেল বিষম মুশকিলে। নিজের কাণ্ডকারখানা সমস্তই তাহলে ফাঁস হয়ে যাবে। তখন সভায় দাঁড়িয়ে হার মেনে নিয়ে সেই বোকার গলায় সে তার বিয়ের বরমাল্য দিল।

প'ড়ে আমি আপন মনেই হেসে বাঁচি না।

বাংশার কথা

শিবেন মিস্ত্রি গেল টানার মোর্শনে। আমি থেকে গেলাম অ্যাণ্ড্রুলে।

অ্যাণ্ড্রুলে তখন ওয়েল্ডিঙের কাজে মিস্ত্রির টানাটানি যাচ্ছে। ধাক্কার মধ্যে চার আনা রোজের অ্যাপ্রেন্টিস আমি আর বয় গোবিন্দ।

ব্র্যাড্শ' সায়েব কার্তিকবাবুকে ডেকে বললেন, ঐ ছোকরাটা কাজ করতে পারবে? দেখুন তো একবার কথা ক'য়ে। শুনে আমি কার্তিকবাবুকে বললাম, পারব।

তো ব্র্যাড্শ' সায়েব আমাকে প্রথম দিনই পাঠাল পোর্ট শিপিং কোম্পানির একটা মোটর লঞ্চের তলার শু-প্লেট তালি লাগানোর কাজে। 'এটা পারলে কোম্পানি আমাকে রোজ ধ'রে দেবে। কাজটা শক্ত ছিল। কিন্তু পেরে গেলাম।

এরপর সায়েব আমাকে পাঠাল রাজগঞ্জে। টুকরো-টাকরা অনেক কাজ। দিন পনেরো লাগবে। ফূর্তির চোটে সেই কাজ আমি পাঁচ দিনে উঠিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

রাজগঞ্জ থেকে ফিরে আসতেই সায়েব বলল, তোমার সাত আনা রোজ ধরা হয়েছে; খুব ভাল ক'রে কাজ করো। সে সময়ে অনেক সুপারিশ টুপারিশের পর তবে রোজ হত। হাসেম-টাসেমের তখনও হয় নি। আমার রোজ ধরল আমার কাজ দেখে। একদিনও কামাই নেই। ভোঁ বাজতে না বাজতে কারখানায় ছুটতাম। আমার রোজ হয়েছে শুনে বা-জানের মুখে এক গাল হাসি।

সাত আনা রোজে ছ' সাত মাস কাজ করলাম। স্কটল্যাণ্ড জাহাজের বয়লার ঝালাই করলাম একা আমি আর গোবিন্দ। সায়েব খুশি হয়ে আমার রোজ দু আনা বাড়িয়ে দিল। গোবিন্দ পুরনো বয় ব'লে ওর ঝাঁ ক'রে হয়ে গেল এক টাকা।

ব্র্যাড্‌শ' সায়েব সবাইকে শালা বলত আর খুব সেলাম পছন্দ করত। আমার বাদ্‌শা নামের সঙ্গে তার নামের কিছুটা মিল ছিল ব'লে সায়েব আমাকে অনেক সময় 'দোস্ত' ব'লে ডাকত। ডকের একটা কাজে তিন লক্ষ টাকার হিসেব দিয়ে তা থেকে দেড় লক্ষ টাকা সরাবার মতলব করতে গিয়ে ধরা পড়ে শেষে সায়েবের চাকরি যায়। সে জায়গায় এল টং সায়েব। আসলে তার নাম ছিল 'রেগে'। টং নামটা আমরাই দিয়েছিলাম। একের নম্বরের হারামী। আমাদের এক মিনিট জিরোতে দিত না। একদিন চটাচটি ক'রে দুম ক'রে কাজ ছেড়ে দিলাম।

এই সময়ে টানার মোর্শনে আড়াই টাকা রোজের একটা কাজ খালি হল। খলিল সায়েবকে ধ'রে বা-জান আমাকে ঢোকানোর ব্যবস্থা করল। কয়েকদিন ট্রাই নিল। যা যা কাজ দিল সমস্তই ক'রে দিলাম। খলিল সায়েব বলল—ঠিক আছে লেগে যা, তোর একটা রোজ ঠিক ক'রে দেব। দিন দশ পনেরো পরে শুনলাম খলিল সায়েব আমার রোজ ঠিক করেছে এক টাকা।

শুনে খুব রাগ হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কী? এখন আর অ্যাণ্ড্রলেও ফেরা সম্ভব নয়। থুথু ফেলে থুথু চাটা যায় না। কাজেই হাফ-বয় হাফ-কারিগরের কাজেই বহাল থাকলাম। এদিকে খলিল সায়েবের ভাস্তা আব্বাসের রোজ ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়ছে। ওদিকে শালা আমার যা ছিল তাই থাকছে।

অথচ লড়াই লাগার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল হ্যারিসন লাইনের এক জাহাজ। 'হান্ট্‌স্‌ম্যান'। শরৎ বালা এক রাত্তিরে আমাকে গ্যাসের কাজ শিখিয়ে দিল। জাহাজ অত ভাল ঝালাই করলাম, নাম হল—

তবু রোজ সেই এক টাকা। সেখানে যারা কাঁচা কারিগর, তাদেরও রোজ ছিল বারো সিকে থেকে চোদ্দ সিকে।

আগে চীনে মিস্ত্রি আই চিন, তারপর মোনাম, ইনসান, বলাই মিস্ত্রি—এই বড় বড় মিস্ত্রিদের কাছে বড় বড় জাহাজে কাজ করার গল্প শুনতাম। একেকটা জাহাজের স্টার্নপোস্ট ঝালতেই তো নাকি একমাস লেগে যায়। শুপ্লেটেও তাই। এখন আর হাঁ ক'রে শুনি না। নিজে হাতে করি। মাকুদাপুর জাহাজে করেছি। এবারের কাজটা ছিল গঙ্গায় নোঙর করা বিআইএসেনের একটা বড় জাহাজে।

করতে করতে সেটা শেষ দিন। জাহাজের খোলের ভেতর যেখানে তলায় সাইড প্লেট আর বটম্ প্লেট ধ'রে রাখার জন্যে ব্রিজ ব্র্যাকেট থাকে—সেই ব্র্যাকেটের কাজ। কোথাও দাঁড়িয়ে কোথাও শুয়ে, কোথাও হামাগুড়ি দিয়ে, কোথাও কাত হয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

সারা দিন সারা রাত ধ'রে একা সাতখানা ব্র্যাকেট কেটে ভোর চারটে পাঁচটার সময় যখন ডেকের ওপরে উঠেছি, তখন বমি ক'রে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। বমির কারণ রঙের গ্যাস। সেই গ্যাস পেটে চলে গিয়েছিল।

এত করলাম তবু খলিল সায়েব আমার রোজ বাড়াল না।

টানার মোর্শনে কাজে ঢোকার পর থেকেই পাড়ায় আমার ইজ্জত বেড়ে গিয়েছিল। তার কারণ শুধু কারখানার নামের গুণ নয়। আসলে টাকা। রোজ আমার একটাকা হলেও, ওভারটাইম ক'রেও কিছু হচ্ছিল। তা কোনো কোনো মাসে সব মিলিয়ে তখন ষাট টাকাও হাতে এসেছে। কাজেই পাড়ায় যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বুলু ছিল, সে এবার হয়ে গেল খাতিরের বাদ্‌শা। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব জুটেছে। বাড়িতে কারিগররা আসাযাওয়া করছে।

আমার দুর্গতি দেখে একদিন কারখানায় মোনাম বলল, এখানে থাকিস্‌নে। বালির হাড়কলে আমার দোস্ত আছে আতর আলি, বড়

সাহেবের ড্রাইভার। তাকে আমি বলেছি, সে তোকে ওখানে বেশি রোদ্দে ঢুকিয়ে দেবে।

আজও বেশ ভোরে উঠেছিলাম। লক-আপ খোলার আগে। রাতের সেপাই একতলায় রঘুপতিরাঘব গোছের কোনো একটা গান গুনগুন ক'রে গাইছিল। দাদুর কথা মনে পড়ল। এক সময়ে আমাদের ছেলেবেলায় দাদু ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুখস্থ করাত জবাকুসুমসঙ্কাশং। তারপর দোহাবলী।

কিছু কিছু এখনও মনে পড়ে। পড়বার পর বাংলা ক'রে বোঝাত।

'আমি বলেছি, সমানে ব'লে চলেছি, ঢাক পিটিয়ে বলছি— ত্রিলোকের মধ্যে এমন যে অমূল্য নিশ্বাস তা শুধু শুধু বয়ে যাচ্ছে।' 'পথে চলতে গিয়ে যে পড়ে যায় তার দোষ নেই, যে ব'সে থাকে তার মাথায় চাপে কোটি ক্রোশ রাস্তা।' 'পণ্ডিত আর মশালচী, এই দুজন দেখতে পায় না। অন্যদের আলো দিয়ে এরা নিজেরা অন্ধকারে থাকে।' 'যেমন করকরে জিনিসের মধ্যে বালি, উজ্জ্বলের মধ্যে রোদ, তেমনি চুপ ক'রে থাকার চেয়ে মিষ্টি আর কিছু নয়।' 'ক্ষুধার কুকুর বিঘ্ন আনে, তাকে একটা টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধনা করো।' 'প্রাণ যাক প্রতিজ্ঞা থাক। যারা প্রাণ রেখে প্রতিজ্ঞা ছাড়ে, তাদের জীবনে ধিক।' 'সবার সঙ্গে মিলেজুলে সবাইকে জী আজ্ঞে ব'লে নিজের ঠাঁইতে ঠিক থাকো।' 'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। যে মনে মনে জপে তাকে বলিহারি যাই।'

শালা কথাটা দাদুর মুখে আর কখনও শুনতাম না। আমি তাই দুষ্টুমি ক'রে দাদুকে দিয়ে এই দোহাটা বলাবার জন্যে বায়না ধরতাম। বুঝে ফেলে দাদু পরের দিকে বলতে চাইত না।

এরপর ছোটমামাকে মুখস্থ করাত ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নাম।

পিতামহ রামানন্দ দেবশর্মণ। প্রপিতামহ ভবদেব। তাঁর পিতা রাজারাম। তাঁর পিতা সুদেব। তাঁর পিতা রামতারণ। তাঁর পিতা…।'

আমাকে পিতামহের বদলে মাতামহ ক'রে বলাতে চাইতেন। এইখানে এসে আমি বেঁকে বসতাম। ছোটমামার পিতামহ আর আমার পিতামহ এক না হওয়ায় অভিমান হত। আমি নিজের মনে বলতাম, 'আমার পিতা শিবকালী দেবশর্মণ। পিতামহ…আমার পিতামহের নাম কী দাছ? হ্যাঁ, গুরুদাস দেবশর্মণ। প্রপিতামহ… জানো না? কেন জানো না?' আমার মনে হত দাছ এক চোখো।

তারপর দাছর কথা ভুলে গিয়ে ধুলো ঝেড়ে এতদিন না পড়া একটা বই বার করলাম। ইংরিজিতে লাও ৎসু-র 'তাও তে চিং'। চীনা ভাষায় এর রচনা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ খুব মন ব'সে গেল। বইয়ের কখনও আগে কখনও পরে যখন যেটাতে চোখ প'ড়ে গিয়ে আমাকে টানছে তখনই সেটা পড়ছি।

'হ্যাঁ আর না-র মধ্যে কতটা তফাত? সু আর কু-র মধ্যে কতখানি দূরত্ব?'

'যে অন্যদের জানে সে চতুর, যে নিজেকে জানে সে চক্ষুষ্মান। যে অন্যদের পরাস্ত করে, তার জোর আছে। যে নিজেকে জয় করে সে শক্তিমান।'

'রাজদরবারে ঘুষের রাজত্ব, মাঠে মাঠে শরনলের জঙ্গল, মরাইগুলো শূন্য, তবু কাপ্তানের অভাব নেই, তারা কোমরে ঝোলাচ্ছে তলোয়ার, আকণ্ঠ খাচ্ছে আর গিলছে, তাদের উপ্‌চে পড়ছে পয়সা। একে বলে ডাকাতের সর্দারি।'

'জ্যান্ত থাকতে মানুষের থাকে নরম ঢিলে ভাব, মরে গেলে হয় শক্ত টান-টান। ঘাস আর গাছ জ্যান্ত অবস্থায় সহজে হেলে, সহজে ভাঙে—ঝরে গেলে শুকিয়ে পাকিয়ে যায়। এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গীসাথী

হচ্ছে শক্ত আর কড়া, জীবনের সঙ্গীসাথী হল নরম আর দুর্বল। কাজেই শক্ত হাতিয়ারে জেতা যায় না।'

'দুনিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল বশংবদ হল জল। কিন্তু তবু শক্ত আর কঠিনের ওপর চড়াও হওয়ার ব্যাপারে জলের জুড়ি নেই। তার কারণ, জলের জায়গা জুড়ে বসার কারো সাধ্য নেই।'

বাদ্‌শাকে ব'লে এলাম কাল থেকে ওর সঙ্গে সকালে বসব। দুপুরে এখন থেকে একটু ঘুমুনো দরকার।

বাদ্‌শার কথা

হাড়কলে কাজ নিলাম বটে, রোজও দেড়া হল। কিন্তু মাসের রোজগার হরেদরে প্রায় সমান। ওভারটাইম নেই। শুধু ঠিকের কাজে মাস গেলে পনেরো।

সকাল পৌনে আটটায় হাজরি। রাস্তা তো কম নয়। সাইকেলে ফেলে ছেড়ে দু ঘণ্টা। আতর আলিকে দিয়ে সায়েবকে বলিয়ে রেখে-ছিলাম আমার পৌঁছুতে ন'টা হবে। আমার মেরামতির কাজ। আর কাউকে আমার ওপর নির্ভর করতে হত না। কাজেই আমার এক ঘণ্টা লেট হত ব'লে কারো কাজ আটকে থাকত না। আমার যা কাজ, আমি সারা দিন খেটে তুলে দিতাম। ছুটি হত ছ'টায়। মাঝখানে বারোটায় ছিল টিফিন বাবদ এক ঘণ্টার জিরেন। নাইট ডিউটির সময় ছিল সন্ধ্যে ছ'টা থেকে এগারোটা আর ভোর চারটে থেকে আটটা।

হাড়কল। ভেতরে গেছেন কখনও ? ওঃ, সে কী জায়গা ! আপনারা যাকে নরক বলেন, মুসলমানরা যাকে বলে দোজখ—তার সঙ্গে সামান্যই ফারাক।

কারখানায় ঠিক মাঝবরাবর গেছে রেলের লাইন। সেই লাইনে ঝিক ঝিক করতে করতে এল ইঞ্জিন। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল ওয়াগন। আপনি তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়াগনের দরজা খুলতে

মালগাড়িতে লোক উঠে গেল। এবার যে কী হবে কিছুই আপনি টের পাচ্ছেন না।

তারপর দরজা যেই খুল্‌-ল…ওঃ!

সে যে ঐ সময় না থেকেছে তার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। ভক্‌ ক'রে একটা হাড়পচা ভ্যাপ্‌সানো ঝাঁঝালো গন্ধ এমনভাবে আপনার নাকে মুখে এসে ধাক্কা দেবে যে প্রথমবার আপনার মনে হবে আপনি যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন।

অবশ্য সব জিনিসেরই মতো আস্তে আস্তে সয়ে যায়। তবে ঐ গন্ধে অনেক কুলিকামিনও যে ভিরমি খেয়ে উল্টে পড়েছে, সে গল্প হাড়কলে থাকতে অনেক শুনেছি।

এইসব ওয়াগনে ক'রে ছোটনাগপুর, হাজারীবাগের জঙ্গল থেকে আসত হাড়। মানুষ, ঘোড়া, মোষ, গরু, ছাগল, ভেড়া—কোনো বাছাবাছি নেই। হাড় আছে এমন কিছু একটা হলেই হল। সব সময় শুধু হাড় নয়। একেবারে ছালমাংসসুদ্ধ আস্ত জানোয়ারও তাতে ঢোকানো থাকত। সেই সব মাংস পচে গলে এমন ফুলে উঠত যে তার গন্ধে আমাদের তখন কারখানা ছেড়ে পালাবার অবস্থা হত।

শুধু কি গন্ধ? ওয়াগনের ভেতরে বাসা বেঁধে থাকত এক হাত লম্বা লাল লাল তেঁতুলে বিছে। শুনেছি আগে কখনও কখনও নাকি হাড়কঙ্কালের সঙ্গে বিষধর সাপও এসে ওয়াগন থেকে নেমেছে। কিন্তু বিষের জন্যে বিছে বা সাপের দরকার নেই। সেদিক থেকে ঐ হাড়-গুলোই যথেষ্ট। কেননা যদি দৈবাৎ কারো গায়ে কোথাও ঐ হাড়ের খোঁচা লাগে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই জায়গাটা বিষিয়ে যাবে। সেপ্টিক হয়ে আগে আগে কুলিকামিনেরা মারাও যেত অনেকে। এখন অবশ্য হাড়কলে খোঁচা লাগলে অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেও তো খুব বেশিদিন আগে নয়।

ডিপার্টে ডিপার্টে ভাগ হয়ে হাড়কলে কাজ হয়। প্রথম তো ওয়াগন এলে সেই ওয়াগন থেকে মাল খালাস করা। তারপর হাড়

ভাঙা। যো সো ক'রে ধরেই কোপ দিলাম তা নয়। দেখে শুনে জায়গামাফিক সাইজ ক'রে ভেঙে তারপর কলে গুঁড়ো করা হবে। ভাঙা হাড় বস্তাবন্দী হবে। মাংসের নিচে হাড়ের গায়ে থাকে একটা পাতলা চামড়ার পর্দা। হাড় ভাঙলে সেই চামড়া আলাদা হয়ে যাবে। পাতলা চামড়াগুলো তারপর প্যাকিং হবে। ঐ চামড়া নাকি নোটের কাগজ তৈরির জন্যে লাগে। আর আছে মেরামতি ডিপার্ট। মিস্ত্রি ডিপার্ট।

নাইট ডিউটিতে হবে অন্য অন্য কাজ। এক জায়গায় হয় দাঁতের হাড় ভাঙা। এলিভেটারে ক'রে মাল নিয়ে ফেলতে হবে গোল চালনায়। যেসব পার্ট্স্ খোলা যায় না, সেগুলো ঝালাই মেরামতির কাজ নাইট ডিউটির মিস্ত্রিরা করে। খারাপ শ্যাফ্ট্, গোলচালনার রড—সাধারণ বিলাসপুরী কুলিরাই দরকার হলে ওসব অদলবদল ক'রে নেয়। কিংবা যে জায়গায় মেরামতি দরকার সেখানে খড়ি দিয়ে দাগ দিয়ে মেশিন ঘরে রেখে আসে যাতে দিনের বেলার মিস্ত্রিরা সেরে রাখতে পারে। মেশিনের যে যে জায়গায় হাড় জমে জমে জাম হয়ে যায় সেগুলো পরিষ্কার করা, মেশিন ঝাড়পুঁছ করা—এসব কাজ বিলাস-পুরীরাই ক'রে থাকে।

হাড়কলের ম্যানেজার পাঞ্জাবী। কিন্তু মালিক ইহুদী। তার আরও একটা মিল ছিল বেলেঘাটায়। সেখানে চামড়া সেদ্ধ ক'রে তারপর রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করা হত কিংবা আগুনে ভেজে নিয়ে তারপর গুঁড়ো করা হত। ওয়েল্ডিঙের কাজে বেলেঘাটাতেও মাঝে মাঝে আমাকে ছুটতে হত।

আমি যখন হাড়কলে কাজ করছি তখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ফ্রান্স যায় যায়। ক্যালে বন্দর হাতছাড়া। প্যারিসের পতন হয়েছে। আমাদের হাড়ের বড় খদ্দের ছিল বেলজিয়াম। নাৎসী জার্মানি তাকে গিলে খাওয়ায় হাড়ের চালান গেল বন্ধ হয়ে। তাছাড়া কোনো দরিয়ার অবস্থাই তো তখন ভাল নয়। কাজেই আমাদের হাড়কলের তখন খাবি খাওয়ার অবস্থা হল।

ফলে হপ্তায় কাজের দিন কমে গিয়ে তিনচার দিনে এসে ঠেকল। এই সময় প্রধানত হত মেরামতির কাজ। কারখানার মজুরদের বেশির ভাগ ছিল বিলাসপুরী, হিন্দুস্থানী চামার আর গাড়োয়ালী। একে কাজ নেই, তার ওপর বোমা পড়ার ভয়—কাজেই তারা অনেকেই যার যার দেহাতে চলে গেল।

তখন অনেকগুলো কারণে আমার মন খুব খারাপ যাচ্ছিল।

আমার বাড়িতে এই সময় খুব বিপদ ঘটে। আমার এক ছোট ভাই আর এক ছোট বোন টাইফয়েডে সাতদিন আগে পরে মারা গেল। আমি ওদের যে কী ভালবাসতাম বলার নয়। বিশেষ ক'রে, ছোট বোনটাকে।

আর ক'বছর যদি দেরি করত তাহলে ক্লোরোমাইসেটিন বেরিয়ে যেত। তাহলে মরত না। একেবারে অব্যর্থ ওষুধ। না কী বলেন?

কারখানায় ঘটল আরেকটা ব্যাপার। জল নামার পাইপটা আগের দিন ঝেলে রেখে এসেছিলাম। কেউ নিশ্চয় টান দিয়ে ভেঙে ফেলেছিল। কিন্তু কাউকে জিগ্যেস ক'রে তো লাভ নেই। যে ভেঙেছে সে কি আর কবুল করবে? পরদিন যেতেই ম্যানেজার আমাকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল। আমারও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিলাম—কাজ করব না। মাইনে মিটিয়ে দাও আর সার্টিফিকেট দিয়ে দাও।

মাইনে মিটিয়ে দিল। কিন্তু সার্টিফিকেট দিল না।

বাড়িতে ফিরে সব বললাম। বা-জান বলল কারখানার কাজে ওরকম হয়েই থাকে। যা, সায়েবকে গিয়ে ধর গে যা—সায়েব ঠিক মাপ ক'রে দেবে।

আমি রাজী হলাম না। কী হবে? কারখানা যে চলছে তাও আধাআধি। বাকি অর্ধেক তৈরির কাজ তখনও শেষ হয় নি। ওদের যে ওয়েল্ডার কালিপদ, সে কারখানার গোড়াপত্তন থেকেই ছিল।

জয়েস্ট বীম গার্ডার—এসব কাটাকুটির ব্যাপারে কালিপদ

কোম্পানির কাছ থেকে মোটা টাকার কন্ট্রাক্ট বাগিয়েছিল। তাতে যেমন ও রোজগার করছিল, তেমনি ওড়াচ্ছিলও দুহাতে। শুধু মদ নয়। সেইসঙ্গে ছিল ওর মেয়েমানুষের নেশা।

এইসব নানা কারণে ওখানে আমার কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বরং ভালই হল, ছাড়বার একটা ছুতো জুটে গেল। তাছাড়া পেছনেও বোধহয় কেউ লেগেছিল।

আর তাছাড়া—

না, থাক। সোনারেনের কথাটা আপনাকে কাল বলব।

আমার কথা — মঙ্গলবার

কাল বাদ্‌শার শেষ বাক্যটা ছিল বেশ নাটকীয়। আজ সকালে সোনারেনের কথাটা বলবে। ওর এই সোনারেন মেয়ে না হয়ে যায় না। নামটা অবশ্য আ-কারান্ত বা ঈ-কারান্ত নয়। আর হলেই বা কী হত! তাতেই কি সব আজকাল ছাই বোঝা যায়! লক্ষ্মী, চপলা, রমা, তারা, সাবিত্রী—এইসব নাম পেছনের চরণ, প্রসাদ, কান্ত, দাস, প্রসন্ন থেকে ছুটে গিয়ে যখন শুধু ইঞ্জিনটা হুস্‌ হুস্‌ করতে করতে সামনে আসে, তখন মানুষগুলোর অসাক্ষাতে স্ত্রীপুরুষ নির্ণয় করা কঠিন হয়। কিছু নামে তক্ষুনি ধরা যায়। নরেন, সতীশ, ব্রজ এমন কি মোহিনী, রমণী পর্যন্ত। মেয়েদেরও কিছু কিছু নামে অনেক সময় হদিশ পাওয়া যায়। যেমন গীতা, ছায়া, আরতি, মমতা—এখনও এসব মোটামুটি মেয়েদের খাস তালুকে। তবে থেকে থেকে সেখানেও নানাভাবে হাত পড়েছে। বিশেষ ক'রে, বাংলার বাইরে। এই বিভ্রাটে 'হাসি', 'বুলা', 'ছবি' নামে কত সময় যে আমার কত মধুর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেছে আবার ক্বচিৎ কদাচিৎ সশরীরে এসে রোমাঞ্চকরভাবে চমকে দিয়েছে 'মন্টু', 'কমল', 'নীলু'।

অবশ্য জাতিভেদে ধর্মভেদে শ্রেণীভেদে নামভেদ হয়। অনভ্যস্ত কানে শুধু নাম শুনে সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু বক্তার পরিচিত-

দের নামের উচ্চারণে গলার স্বরে বোঝা যায় কোন্ নামটা পুরুষালী হলেও তাতে একটু কোমলতা ছোঁয়ানো হচ্ছে কিংবা কোন্‌টা মেয়েলী শোনালেও তার মধ্যে একটু কাঠখোট্টা ভাব থাকছে।

সোনারেন নামটা আমি এই প্রথম শুনছি। কিন্তু নামটার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে। অন্তত বাদ্‌শার উচ্চারণের মধ্যে একটা মিষ্টি ভাব ছিল।

বাদ্‌শার সঙ্গে ব'সে ওর জীবনের এই যে নোট নিচ্ছি, তার পেছনে সময় কাটানো ছাড়াও আমার অন্য একটা অভিপ্রায় আছে। প্রথমে লিখতে যাচ্ছিলাম 'অভিপ্রায় ছিল'। 'ছিল' লিখব, না 'আছে' লিখব —গোড়ায় এই নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। পরে দেখলাম 'ছিল' বললে বড় বেশি হাল ছাড়ার ভাব এসে যায়। তাই আশাটা টিকিয়ে রাখার জন্যে শেষ পর্যন্ত লিখেছি 'অভিপ্রায় আছে'।

আমার অনেক দিনের শখ একটা উপন্যাস লেখার। কিন্তু আমি মনে মনে জানি, আমাকে দিয়ে হবে না। আসলে আমি হচ্ছি হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক। এর ওর কাছ থেকে ঘটনা, যাকে আমরা সাংবাদিকের ভাষায় বলি 'স্টোরি' বা গল্প, জেনে নিয়ে সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আমি লিখতে পারি। কিন্তু কোনো গল্প মাথা খাটিয়ে বানানোর কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মুশকিল, কেউ কাঁচামাল না যোগালে আমি কিছু তৈরি করতে পারি না। টাটা কোম্পানির যে সুবিধে—ওদের খনিও আছে আবার কারখানাও আছে।

সত্যি বলতে কি শুধু কাগজে লিখি ব'লেই লোকে আমাকে লেখক বলে। তাছাড়া লেখার লাইনে আসবারও আমার কোনো বাসনা ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিকে যেই না বাংলায় লেটার পাওয়া অমনি আমি ঘরে বাইরে সবার দৃষ্টিতেই অন্য সব কাজের বার হয়ে গেলাম। তার ওপর অঙ্কে ভাল করতে পারি নি। সুতরাং আর্ট্‌স্-এর লাইনে আমাকে ঠেলে দেওয়া হল। আমার কী ইচ্ছে, তার

খোঁজ নেওয়ারও কারো কোনো দরকার পড়ল না। কেননা সবাই জানে, বাংলা ভাষা একমাত্র কাগজে ইনিয়ে বিনিয়ে লেখা ছাড়া জীবনে আর কোনোই কাজে লাগে না। কাজেই কলেজে বাংলা নিতে হল। আমার সামনে লেখা ছাড়া অন্য সব রাস্তাই বন্ধ ক'রে দিল ঐ একটি লেটার। আমাদের সময় বাংলায় লেটার ছিল মানে 'V' পাওয়া। আমার মনে হত, আমার উদ্যত তীক্ষ্ণমুখ আশার ফলকটা যেন উল্টে গিয়ে মুখ ভোঁতা ক'রে আছে। পরে অবশ্য চার্চিল প্রচুর জয়জোকার দিয়ে ঐ অক্ষরটাকে ঠেলে তুললেন, কিন্তু তাতেও আমার পরাজয়ের ভাব গেল না।

বাংলায় লেটার পেয়েছিলাম ব'লে পার্টি আমাকে কাগজে লেখার কাজ দিল। বাংলায় লেটার পাওয়ার দরুন বিয়ের পদ্য, সরস্বতী পুজোর নিমন্ত্রণপত্র, ছেলেমেয়ের নাম দেওয়া, ফেয়ারওয়েল বা সম্বর্ধনার মানপত্র—বাংলা ভাষায় বাঙালীর এই একমাত্র নিত্যকর্ম-গুলোর জন্যে বাড়িতে অনেকেই আমার কাছে আসত। কাগজের কাজ পেয়ে, বলতে নেই, এইসব আপদের হাত থেকে বাঁচলাম।

ক্রমে আমি রিপোর্টাজ লিখতে পারছি দেখে বন্ধুদের কেউ কেউ বলল, 'এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও'। এখন ভাবি, এমনও হতে পারে যে, সত্যি গল্পগুলোকে ওরা মনে করেছিল আসলে আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখছি। তাই ওর পেছনে শুধু যে উৎসাহ দেওয়ার ভাব ছিল তাই নয়, বোধহয় খানিকটা খোঁচাও ছিল। বরং যারা আমাকে নিরুৎসাহ করত, তাদের কথাই এখন আমার ঠিক ব'লে মনে হয়। তারা অনেকগুলো যুক্তি দেখাত—প্রথমত, 'তুমি তো লেখো না—তুমি দেখে দেখে টুকলিফাই করো'। এই টুকলিফাই কথাটা আমার খুব আঁতে বিঁধত। কিন্তু অস্বীকার করতে পারি নি। শুধু তখন নয়, এখনও। দ্বিতীয়ত, 'তুমি মেয়েমানুষ কী জানলে না। প্রেম করো নি। খারাপ পাড়ায় যাও নি। তার মানে, মানুষ জাতের অর্ধেক যে স্ত্রীলোক এবং মনুষ্যজীবনের অর্ধেক যে দেহমনের মিলন,

তার তুমি খবর রাখো না। মানুষের তুমি যেটা জানো, সেটা অর্ধ সত্য। কিন্তু উপন্যাসে চাই গোটা সত্য—কেননা অর্ধসত্য জিনিসটা আসলে মিথ্যেরই কারসাজি।' বেশ। আর তৃতীয়ত? তৃতীয়ত, 'ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, পার্টি, গণসংগঠন ইত্যাদি তোমাদের যা যা আছে, সব জায়গাতেই লোকে দেখায় তাদের একটা দিক। তাদের ভালোর দিক। দেখায় শুধু সেইদিক যেদিকটা দেখালে তাদের ভাল হয়।' আর চতুর্থত, 'তোমার ঐ বাংলার লেটার। তুমি সুন্দর সুন্দর কথা বসাতে পারো। কিন্তু ডানাকাটা পরী দিয়ে উপন্যাসের হেঁশেল ঠেলা, ছেলেমেয়েদের গুমুত্ পরিষ্কার করা, বদ্ লোকদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগানো এসব করা যায় না। পঞ্চমত, …কিন্তু না, ও পর্যন্ত আর পৌঁছুতে হয় নি। তার আগেই আমার উপন্যাস লেখার বাসনাটা পঞ্চত্ব পেয়েছিল।

বাদ্শার জীবনের ঘটনাগুলো টুকতে টুকতে সেই উপন্যাসের ইচ্ছেটা মনের মধ্যে আবার জেগে উঠছিল। অবশ্য উপন্যাস করতে গেলে অনেক কিছু যোগবিয়োগ করা দরকার। এমনভাবে সমস্ত কিছু ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে এটা আসলে বাদ্শার জীবন। নামধামগুলো বদ্লাতে হবে। মুসলমান আত্মীয় সম্পর্ক, মুসলমান নাম, ওদের ধর্মকর্ম, এ নিয়ে, বেশ বুঝতে পারছি, খুব মুশকিলে পড়ে যাব। মুসলমানের ছদ্মবেশে—উপন্যাসে যদি হিন্দুর দল ঢুকে পড়ে তাহলেই তো চিত্তির। দুদিক থেকেই ঢিল খেতে হবে।

আমার ভুল হয়েছে বাদ্শাকে বেছে। তার ওপর ও হল মজুরের ছেলে। যে জীবন সম্পর্কে আমি, মধ্যবিত্তের ছেলে, কিছুই জানি না। তার চেয়ে মোয়াজ্জেম কাকা, আহ্মেদ কাকা—যাঁরা ছিলেন দাদুর বন্ধু, ছোটমামার দেখাদেখি যাঁদের আমি কাকা বলতাম—তবু ওঁদের নিয়ে লিখলেও কথা ছিল। কিন্তু ওঁরাও পেটিবুর্জোয়া। তাছাড়া হাঙ্গার-স্ট্রাইকে ওঁদের পাব কোথায়? সেক্ষেত্রে আমার উচিত ছিল

গৌরহরিকে ধরা। চাষী হলেও, গৌরহরি হিন্দু। অনেক ব্যাপারে মিল হত।

কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই। ধরেছি যখন বাদ্‌শাকে আমায় শেষ করতেই হবে। ও যেন আমার এই দ্বিধার কথা জানতে না পারে। তাহলে ওর সমস্ত উৎসাহ জল হয়ে যাবে। আমি জানি, ও ভাবছে এই যে আমি ওর জীবনী লিখছি, হুবহু এটা এইভাবেই আমি ছেপে বই বার করব। ও তো জানে না, যদি আমি কোনোদিন ওকে নিয়ে উপন্যাস লিখি তাহলেও এর খোলনলচে সমস্তই আমাকে বদ্‌লাতে হবে। সেটা প'ড়ে বাদ্‌শা নিজেকে নিজে চিনতে তো পারবেই না, এমন কি অন্য কেউও যাতে সন্দেহ না করে, আমাকে তার জন্যে নানা রকম কলকৌশল করতে হবে। হ্যাঁ, আর তার আগে আমাকে উপন্যাস লেখার কায়দাকানুনগুলো শিখে নিতে হবে।

আর তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, আমি যদি বাদ্‌শার কথাগুলো অবিকল সাজিয়ে উপন্যাস করি, তাহলে সেটা হবে আত্মজীবনী। তাহলে তার লেখক হিসেবে থাকবে বাদ্‌শার নাম। গণেশ ঠাকুরের মতো আমার নামটা তার নিচে থাকতে পারে নিছক অনুলিপিকার হিসেবে।

কিন্তু কেন এত ভাবছি? এ পর্যন্ত বাদ্‌শা এমন কিছু বলে নি, যাতে, আমার বন্ধুদের প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায়—বাদ্‌শা অর্ধসত্যের বেশি কিছু বলেছে। মেয়েমানুষ একদম বাদ। কখনও কখনও মনে হয়েছে জিগ্যেস করি। যদি থাকেও ও কেন আমাকে বলতে যাবে? আমি ওর এমন কিছু প্রাণের বন্ধু নই। তার ওপর আগে হলেও কথা ছিল। বাদ্‌শা এখন নেতা। যারা নেতা হয়, তারা কক্ষনো নিজেদের দোষদুর্বলতার কথা বলে না। বারে কিংবা শুঁড়িখানায় যায় না। খারাপ জায়গায় যেতে পারে না। তাতে লোকের চোখে, শুধু নিজেরা নয়, পার্টিকেও ছোট হতে হয়।

আমাদের পার্টিতে যারা গল্প কবিতা লেখে, তাদেরও তাই ঘাড়

খুঁজে লিখে যেতে হয় কেবল বীর বিপ্লবী আর সাধুসচ্চরিত্রদের কথা। যারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা বুর্জোয়া, যারা মাতাল, যারা পুলিশে কাজ করে, এমন কি যারা অন্য পার্টির লোক—তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুধু নিন্দনীয় হলে কথা ছিল। সেটা হবে সন্দেহজনক। নেতাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বিয়ে করা দূরে থাক, মনুষ্যজাতের পুরুষেতর অংশকে সর্বতোভাবে নরকের দ্বার ব'লে মনে করে।

এইসব নানা কারণে, যদি আমি চেষ্টা করি তাহলেও, বাদ্‌শাকে নিয়ে উপন্যাস বানাতে পারব না। হয়ত হত, যদি কোনো মজুরের ছেলে কলম ধরতে পারত।

কিন্তু যাই বলি না কেন, ঐ সোনারেনকে মেয়ে কল্পনা ক'রে নিয়ে কাল রাত্তিরে আমি অনেক কথা ভেবেছি। সোনারেন যদি তেমন জুতসই হয়, তাহলে বাদ্‌শাকে নিয়ে পরে একটা উপন্যাস লেখার কথা ভাবা যেতে পারে।

আর আমাকে আমার ঘাটতির জন্যে কিছু বন্ধু যে খোঁটাগুলো দিয়েছে, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সেই ঘাটতিগুলো পূরণ করারও চেষ্টা করব। সেটা করব আমাকে উপন্যাস লিখতে হবে ব'লে। আমি যে পারব তার কারণ এখনও আমার বেলা বয়ে যায় নি। তিরিশ বছর বয়স যার এখনও পুরো হয় নি, তার পক্ষে এ দেরিটা দেরিই নয়।

কিন্তু সকালে উঠে বাদ্‌শা জানিয়ে গেল, জামাল সায়েবের ঘরে ওর ডাক পড়েছে। কাজেই আমরা দুপুরে বসব।

ডাক বলতেই তো ওদের শলাপরামর্শ। সেটা হাঙ্গার-স্ট্রাইক ছাড়া আর কী বিষয় নিয়ে হতে পারে? সরকারের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনার ব্যাপার নিশ্চয় নয়?

তা যদি হত, তাহলে জেলগেটে কি আর গাড়ির হর্ন শোনা যেত না?

সেই যখন হাড়কলে কাজ করছিলাম, সেই সময়কার কিছু কিছু গল্পগুজবের কথা আগে ব'লে নিই। না কী বলেন ?

আমাদের কারখানার যে গেট, তার ঠিক সামনেই ছিল কুলি লাইন। গলিতে পা দেওয়া যায় না এমন নোংরা। কী বর্ষা কী শীত। হয় কাদা নয় জঞ্জাল। গলির মধ্যে বাতিগুলো ভাশুর-ভাদ্রবৌয়ের মতো একটা থেকে আরেকটা এত তফাতে তফাতে থাকত যে, সন্ধ্যে-বেলা আলো জ্বললেও অন্ধকার যেত না।

ঘরগুলোর ছিল টালির ছাদ। মাটির মেঝেগুলোতে সিমেন্ট দেওয়ার কাজ তখন সবে শুরু হয়েছে। ফলে, ধুলোবালি নিয়ে গলিটাতে তখনও সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

ঘরের সামনে ছোট্ট একটু দাওয়া। তার এক কোণে উনুন ক'রে রান্নার জায়গা। বাড়ি বলতে একটাই ঘর। সেই একটা ঘরে পরিবার-সুদ্ধ মানুষ।

হাড়কলে থাকতে মাঝে মাঝে আমার নাইট ডিউটি পড়ত, আগে কি বলেছি ? হ্যাঁ, আমাকে মাঝে মাঝে নাইট ডিউটিতে যেতে হত। সেই সময় আমার সঙ্গে ছেদিলালের আলাপ।

ছেদিলাল ছিল বিলাসপুরীদের গোঁসাই। কারখানায় সে ছিল লাইনের মিস্ত্রি। ঢুকেছিল কুলি হয়ে। কারো সুপারিশে নয়, নিজের কব্জির জোরে মিস্ত্রি হয়েছে। দেহাতে করত ক্ষেতিখাড়ির কাজ। এমনিতেই দিন গুজরান করা শক্ত, তার ওপর দিতে হত মালগুজারির টাকা। একে অভাব, তার ওপর জমিদারের জুলুম। সহ্য করতে না পেরে এই বিদেশ বিভুঁইতে চলে আসতে হল। দেহাতে আছে দুই ভাই আর বাপ মা।

হাড়কলে মেয়েদের মাইনে ছিল মাসে গড়ে এগারো টাকা। পুরুষদের তেরো। ছেদিলাল মিস্ত্রি ব'লে কিছু বেশি পেত।

তখন লড়াই সবে লেগেছে। তখনও ছিল শস্তাগণ্ডার বাজার। ছেদিলালের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি ওরা খায় নুন দিয়ে ফ্যানেভাত। কোনো কোনো দিন শখ ক'রে ডাল। ব্যস্। দেড় টাকা ঘরভাড়া। মাসে পাঁচ টাকা খোরাকি। বছরে দুখানা কাপড়, দুখানা গেঞ্জি। ছেদিলালকে মাস গেলে চার পাঁচ টাকা দেশে পাঠাতে হয়।

ছেদিলালের দুই বউ। প্রথম বউয়ের ছেলেপুলে হল না ব'লেই দ্বিতীয় বিয়েটা ওকে করতে হল। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বউয়েরও ছেলেপুলে হয় নি। ওরা তিন জনেই হাড়কলে কাজ করে। তিন জনের রোজগারে কোনো রকমে সংসার চলে যায়। তিন জন একসঙ্গে থাকায় খোরাকি খরচটা কম পড়ে। তার ফলে, কিছু টাকা বাঁচিয়ে বাপমা ভাইদের জন্যে ছেদিলাল পাঠাতে পারে।

শীতকালে হাড়কলে যেদিন রাতে ডিউটি থাকত, সেদিনটা আমি জানতাম বেশ মজায় কাটবে। হাতের কাজ সারা হলে কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন দেওয়া হত। বিলাসপুরী কুলিকামিনদের নিয়ে সেই আগুনের চারধারে গোল হয়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে আরাম ক'রে আমরা আগুন পোয়াতাম। কাজের বেশি চাপ থাকত না। সায়েব রাত্তিরে আসত না। মিস্ত্রিরাই যা করার করত।

বিলাসপুরীদের গোঁসাই, মানে ছেদিলাল, তখন আমাদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনাত।

গল্পগুলো বলত ওর নিজের মতো ক'রে। প্রায় সময়ই উদোর ঘাড়ে বুধোর পিণ্ডি হয়ে যেত। উল্টোপাল্টা হলেও ছেদিলালের বলার ঢংটা ছিল বড় সুন্দর। মাঝে মাঝে আমি নিজেকে একটু জাহির না ক'রে পারতাম না। আমি যে লেখাপড়া জানি, গরিব হলেও, যাকে ছোটলোক বলে তা নই, এটা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছে হত। কাজেই ছেদিলাল যখন চিত্রাঙ্গদার বদলে প্রমীলাকে অর্জুনের স্ত্রী

বলছে, তখন আমি হয়ত একেকদিন ওর ভুল ধ'রে দিতাম। এমনিতে রোজ ও যা বলছে আমি শুনে যেতাম। ভুল বললেও কিছু উচ্চবাচ্য করতাম না। চারপাশে যারা থাকত, তাদের চোখে নিজেকে একটু তুলবার জন্যে মাঝে মাঝে ওটার দরকার হত।

আমি ধরতে পারতাম, কেননা আমার ওসব কিছুটা জানাশুনো ছিল। শিবপুরের ইস্কুলে পড়ার সময় কিছুটা পড়েছি, বড় বুবুর মুখে কিছু কিছু শুনেছি আর বাকিটা শুনেছি চায়ের দোকানে যাত্রার দলের মোশানমাস্টার ভূপতিবাবুর কাছ থেকে।

আমি মুসলমান। সেদিক দিয়ে আমাকে দেখতে না পারাটাই বিলাসপুরীদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যে মুসলমান রামায়ণ মহাভারতের গল্প জানে তাকে বোধহয় ঠিক ষোল আনা মুসলমান ব'লে মানতে ওদের মন চায় নি। আমার ভাবনাটা ছিল অন্য। তাতে ধর্মের ব্যাপারটা ছিল না। ছোট কাজ করলেই ছোটলোক হয় না, গোমুখ্যু হয় না—এইভাবে নিজেকে দেখানো। কিন্তু যেদিক দিয়েই হোক আমি ওদের কাছে উঁচু মার্কা পেয়ে ক্লাস প্রমোশন পেলাম। আর ওরাও যেন আমাকে নিজের করতে পেরে বাঁচল। আসলে কি জানেন, ওরা চামার ব'লে—কী হিন্দু আর কী হিন্দুস্থানী মুসলমান—সবাই ওদের ঘেন্না করত।

পরস্পরকে জানলে বুঝলে কত তাড়াতাড়ি কত বেশি ভাবভালবাসা হয় তাহলে দেখুন। না কী বলেন, হয় না?

হাড়কলে পান, বিড়ি, মদ সবাই খায়। তা সে কী ছেলে কী মেয়ে, কী জোয়ান কী মদ্দ। আমি ওর একটাও খেতাম না। তাতে ওদের কাছে আমার খাতির আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আপনাকে সত্যি বলছি, ওরা যে খেত—তাতে ওদের আমার একটুও খারাপ মনে হত না। হাড়ের গুঁড়ো প্যাক হয়ে চা-বাগানে যেত—ওতে হয় ওদের বাগানের সার। কারখানার মধ্যে গেলে দেখবেন মনে হবে সব সময় ধুলোর ঝড় বইছে। আসলে ধুলো নয়।

হাড়ের গুঁড়ো। হাড়কলের ত্রিসীমানায় যে যাবে ঐ হাড়ের গুঁড়ো তার পেটে সিঁধোবে। ওতে ভীষণভাবে পেট এঁটে যায় আর তার ফলে ক্ষিধে মরে যায়। এর একমাত্র ওষুধ হল ধানী মদ।

আপনিও নিশ্চয় মদ খাওয়া পছন্দ করেন না। বিশেষ ক'রে, মেয়েদের মদ খাওয়া। কিন্তু কমরেড, ওটা তো ওদের কাছে ওষুধ। মদ ওরা খায় না। ওদের গিলতে হয়।

হাড়কলের বৃত্তান্তটা শেষ করবার আগে, এবার আপনাকে সোনারেনের কথাটা বলি।

ছেদিলালদের লাইনে একটি মেয়ে ছিল। তার নাম সোনারেন। সবাই বলত, লাইনের সেরা সুন্দরী, আপনি দেখলে আপনিও তাই বলতেন। ঐ রকম ঘরে কী ক'রে যে ঐ রকম মেয়ে হয়, সেটাই আশ্চর্য। আপনারও কি তাই মনে হয় না?

ওর এক ভগ্নীপতির সঙ্গে দেশ থেকে সোনারেন চলে এসেছিল। ওর মা বাপ ভাই কেউ ছিল না। ওর ভগ্নীপতিটা একটা হারামজাদা। ওকে একা ফেলে রেখে পালায়।

সোনারেন থাকত একা একটা ঘরে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন, ওর ওপর অনেকেরই নজর ছিল। আরও এটা বেশি ছিল সোনারেন ডাকসাইটে সুন্দরী ছিল ব'লে।

ওর ছিল অনেক খেঁড়ু। ধনপত, ভিখুয়া, মাংলু, ওয়ালী খাঁ—এইরকম অনেক। সবাই লাইন লাগিয়েছিল ওকে সাদি করবে ব'লে। ওকে সাদি করবার কথা সবচেয়ে বেশি বলত মাংলু। প্রত্যেকেই খুব গুমর ক'রে বেড়াত তার সঙ্গে নাকি সোনারেনের লটঘট।

আমি তখন বেশ সেয়ানা হয়ে উঠেছি। কাজ বাগাবার জন্যে কাকে কখন কী বলতে হবে জেনে বুঝে গিয়েছি।

একবার আমার খুব টাকার টানাটানি যাচ্ছে। কাকে বলি কাকে বলি করতে করতে মাংলুকে ধরলাম। মাংলু বলল ওরও টাইট অবস্থা। কী করবে কা করবে ভাবছে, তখন আমি বললাম, 'ঠিক

আছে, ঠিক আছে, আমি ওয়ালী খাঁকে গিয়েই ধরি।' সঙ্গে সঙ্গে মাংলু বলল, 'ও ব্যাটার কাছে কেন ছোট হতে যাবে? আচ্ছা, একটা দিন সবুর করো। কাল দেখি কী করা যায়।' মাংলুর ছেলের খুব অসুখ। তা সত্ত্বেও ওর বউয়ের রুপোর মল বাঁধা দিয়ে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রে এনে পরের দিনই আমাকে দিল। সব শুনে টুনে আমার কী লজ্জা হল কী বলব।

ওয়ালী খাঁ করত বাইস্ম্যানির কাজ। মহরমের দিন নাকি সোনারেনকে ওয়ালী খাঁর সঙ্গে বেড়াতে দেখা গেছে। এই নিয়ে কারখানায় খুব ক'দিন গুজগুজ ফুসফুস চলল।

আমি অনেক দিন থেকেই সোনারেনের সঙ্গে ভাব করবার তাল খুঁজছিলাম। একদিন সোনারেনকে পুকুরের ধারে ধ'রে ফেললাম। কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি কা বেআক্কেলের মতো ওয়ালী খাঁর কথা পাড়লাম। তখন সোনারেনকে দেখতে হয়। এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রেগে মুখ ঘুরিয়ে সে যা তার চলে যাওয়া যদি দেখতেন! না সত্যি, সোনারেনকে যে দেখেছে তারই বুকের মধ্যেটা কি রকম যেন ক'রে উঠত।

এদিকে ছেদিলাল তার এক শালীকে আনিয়েছিল। ওর ছোট বউয়ের ছোট বোন। ছোট বউয়ের খুব ইচ্ছে ছিল ওর বোনকে আমি রাখি। ছোট বউ বলত, ক্ষিধের সময় খাওয়া উচিত—পরে ক্ষিধে মরে গেলে সাদি করবে?

বলতাম, আমি তো মুসলমান। তোমাদের সমাজে তো মুশকিল হবে। খুব সহজভাবেই ছোট বউ বলত, কী আর মুশকিল? জরিমানার টাকাটা তুই দিয়ে দিস। তাহলেই তো হল।

বিলাসপুরীদের লাইনে হোলির বিশ পঁচিশ দিন আগে থেকেই বার হয় জুগিড়ার দল। একেক দলে থাকে পনেরো বিশ জন। মেয়েদেরও দল বেরোয়। পুরুষরা মেয়ে সাজে আর মেয়েরা সাজে পুরুষ। ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তোলে, নাচে গায়। থেকে থেকে গানের মাঝখানে

আওয়াজ দেয়—ছা-রা-রা-রা-রা-রা! সঙ্গে থাকে ঢোলক। সঙ্গে থাকে সারেঙ্গী। কোম্পানি হোলির বখশিস দেয় কুলিদের ছু টাকা ক'রে, মিস্ত্রিদের তিন থেকে চার টাকা।

হোলির সময় ছুদিন কারখানা বন্ধ। ঐ ছুদিন বস্তিতে ছিলাম। ছাড়ে নি। সারাদিন তো হোলি। সে তাণ্ডব ব্যাপার। রং দিয়ে শুরু। রং যখন ফুরোয় তখন নর্দমার কাদা। রাতভর ছিলাম। সারাদিন মদভাঙ আর হুল্লোড়। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া। লিট্টি, ভাঙ আর লাড্ডু।

ওদের সঙ্গে রাত্তির কাটানোর ফলে সায়েবের ড্রাইভার আতর আলি চটে গেল। মুসলমানের ছেলে হয়ে চামারদের সঙ্গে এত গা ঘষাঘষি কেন? আরও অনেকে বদ্‌নাম দিল।

এদিকে, আমার যে কুলির কাজ করত ভিখুয়া। গোল ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা। তার সঙ্গে সোনারেনের ভাবভালবাসা চলছিল। এর মধ্যে এসে গেল ভিখুয়ার চেয়ে বয়স কম কিন্তু খুব ভাল দেখতে এক সর্দার। কৈলু। ছুরি চলল। মারামারি হল। ছুজনেরই জবাব হয়ে গেল। আর ঠিক তার পরই সোনারেন আর কৈলু ছুজনেই ও প্লাট ছেড়ে হাওয়া।

বাদশার কথা বুধবার

ম্যানেজারের সঙ্গে খিটিমিটি হওয়ায় যেদিন হাড়কলের কাজ ছাড়লাম, সেইদিনই গিয়ে কাজে ভর্তি হয়ে গেলাম কোন্নগরের লক্ষ্মী-নারায়ণ জুট মিলে। পরে যখন কত হপ্তা দেবে বললে, তখন ভেবে দেখলাম—রোজ সাইকেলে ঠেঙিয়ে যেতে হবে সেই শিবপুরের বাগান থেকে কোন্নগর—ধ্যুৎ! কী হবে ওখানে ন' টাকা হপ্তায় কাজ ক'রে।

রাগ ক'রে পাঁচ ছ'দিন বাড়িতে গাঁট হয়ে ব'সে থাকলাম। এর মধ্যে কে যে ভাল এসে বললে, সেই যে মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে টাটানগরে চলে গিয়েছিল শিবে মিস্ত্রি, সে নাকি আবার ফিরে এসেছে। তাকে ধ'রে আবার অ্যাঙ্গুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। দেড় টাকা রোজ।

তখন লড়াইয়ের ব্যাপারে তৈরি হচ্ছিল পোর্টেব্‌ল্‌ হাট্‌। যখন ইচ্ছে চটপট তুলে ফেলে সেগুলো যেখানে ইচ্ছে চট্‌ ক'রে আবার বসিয়ে নেওয়া যায়। তার মধ্যে মেরামতি কারখানা, স্টোর, হাস-পাতাল, থাকবার ঘর—সব রকমের সুন্দর ব্যবস্থা। সে কাজ তো ছ' আট মাস ধ'রে করলাম।

এদিকে টানার মোর্শনে ওয়েল্ডার হয়েছে তখন আজাদ। আমি যখন ওখানে রিবিটম্যানির কাজ করি, আজাদ তখন করত প্যাটার্ন-মেকারের, মানে, ছুতোরের কাজ। তখন থেকেই আমাদের খুব ভাব হয়। আমাদের প্রথম আলাপ বেতাইতলার নাইট ইস্কুলে। আমি যখন অ্যাণ্ড্রুলে বয়ের কাজ করি, ও তখন কারিগর হয়ে টর্ন অ্যাণ্ড ফিটিং শপে বাইসম্যানির ঘরে কাজ নেয়। ওখান থেকে কাজ ছেড়ে দিলে খলিল সায়েব ওকে শালিমারে ঢোকায়।

আজাদের সঙ্গে ভাব থাকায় অ্যাণ্ড্রুল ছেড়ে আবার আমি চলে এলাম টানার মোর্শনে। আমাকে ট্রাই ক'রে নিল তামাসা সায়েব। আসল নাম টমাস। বাংলায় গালাগাল দিত। তাতে সবাই খুব তামাসা পেত। ফলে, মজুররা নিজেদের মধ্যে বলত, তামাসা সায়েব আজ এই বলেছে, তামাসা সায়েব আজ সেই বলেছে। যতসব খিস্তি-খাস্তার কথা।

আড়াই টাকা রোজ হল। ডে নাইট কাজ হত। ওভারটাইম প্রচুর পেতাম। সব মিলিয়ে হাতে পাচ্ছি প্রায় মাসেই দেড়শো টাকা। অবশ্য খাটুনিও খুব। সোমবার সকালে কাজে গিয়ে একটানা খেটে ফিরতাম সেই বিষ্যুৎবার। দিনে এক ছ ঘণ্টা শুধু চোখ বুঁজে নিতাম।

অবস্থা বেশ একটু ফিরে গেল। পাড়ায় খাতির হল। অনেকে সমীহ ক'রে বাদ্‌শাবাবু ব'লে ডাকতে লাগল। বাড়ির যার সঙ্গেই পাড়ার যার খটাখটি থাক, আমার সঙ্গে কারো ঝগড়াঝাঁটি ছিল না ব'লে সকলেই আমাকে ভালবাসত। বাড়িতেও আমার ওপর বা-জানের টানটা একটু বাড়ল। ভাইরা আমার মন রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুটা পয়সার মুখ দেখায় বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি কমে এল। বা-জান নানারকম প্ল্যান আঁটতে লাগল। এবার এই করব, সেই করব। ঘর তুলতে হবে। ছেলে দুটোর বিয়ে দিতে হবে।

কারখানায় ভর্তি হয়ে গোড়ায় গোড়ায় খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। বড় বড় মিস্ত্রি। কেউ ফিরিঙ্গি, কেউ চীনে সায়েব। কাজের একটু গলতি দেখলেই চাকরি খেয়ে নেবে। পুরনো পুরনো মিস্ত্রিরা একদিন ওভারটাইম ক'রে পরের দিন বলতে পারত, আজ পারব না। আমি নতুন ব'লে এক নাগাড়ে রাতের পর রাত মুখ বুঁজে কাজ ক'রে যেতাম। 'না' বলবার সাহস হত না।

কারখানায় অনেকেই ওয়েল্ডিঙের কাজ শিখতে আসত। বয় হিসেবে। অনেকে আমাকে বারণ করত। বলত, অত সহজে কাজ শেখাবে না। তাহলে ওয়েল্ডিঙের কাজের ইজ্জত থাকবে না। কিন্তু আমি সবাইকেই শেখাতাম। যদি গরিবের ছেলে হত, মুখটা করুণ করুণ দেখতাম—তাহলে তো কথাই নেই। আমাকে খাওয়ানো, আমার ফাইফরমাস খাটা—আমার দিক থেকে এসব উপদ্রব তো ছিলই না, বরং আমিই তাদের অনেককে নিজে পয়সা খরচ ক'রে টিফিন খাওয়াতাম।

আমার কথা

হাড়কলের জায়গাটায় এসে, যখন আমি উপন্যাস লিখব, আমাকে ভাল ক'রে মাথা খেলাতে হবে।

নাম শুনে সোনারেনকে মেয়ে মনে করাটা আমার ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বাদ্‌শা যা বলবে আশা করেছিলাম, মানে যা বললে আমার উপন্যাসটা জমতে পারত, বাদ্‌শা তা বলে নি। তাছাড়া জেলে এসে আলাপ, তার কাছে মন খুলে সব বলা সম্ভবও নয়।

বরং যেটুকু বলেছে তার জন্যেই ওকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমার যদি মুখ নিচু ক'রে লেখার ব্যাপার না হত, সামনা-

সামনি আমার দিকে যদি ওকে বলতে হত, তাহলে অতটাও বলতে পারত কিনা আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু আমার কল্পনাকে দৌড় করাবার মতো সুযোগ অনেক জায়গাতেই ও ক'রে দিয়েছে। যেমন, নাইট ডিউটি। এক জায়গায় একসঙ্গে ব'সে আগুন পোয়ানো। সোনারেনের একা একটা ঘরে থাকা। সবচেয়ে বড় কথা, হোলির দুটো দিন বাদশার সারাদিন সারারাত লাইনে কাটানো। সুতরাং আমি কিভাবে ফাঁকগুলো ভরতে পারব, তার ওপরই আমার উপন্যাসটার ভালমন্দ নির্ভর করবে। অর্থাৎ আমার হাতযশ।

যারা রিপোর্টাজ লেখে, তাদের নিয়ে এই এক মুশকিল। তারা বড় বেশি পরমুখাপেক্ষী হয়। তারা চলে ঘটনার গোড়ে গোড় দিয়ে। যেটা যেমন সেটা তেমন। যেটা যতটুকু দেখে যতটুকু শোনে ততটুকুই লেখে। মানে, সে যদি সত্যিকার রিপোর্টাজ লেখক হয়।

এরপর আমার ভূমিকা যদি সত্যিই বদলায়, তাহলে আমাকে বানাবার কায়দাটা শিখতে হবে। আমার অনেক বন্ধু বলে আমি পারব না। শেষকালে নাকি শিব গড়তে বাঁদর হয়ে যাবে।

আবার আমার আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার উপন্যাস লেখার বাসনার কথা শুনে বলেছিল, কত বয়স হল তোমার? সাতাশ? আমি তোমাকে ভাল কথা বলছি—চল্লিশের আগে, খবর্দার! উপন্যাসে হাতই দেবে না।

সুতরাং হাতে এখনও দশ এগারো বছর পাচ্ছি।

বাদশার কথা বৃহস্পতিবার

অনেক বয় আমাদের কারখানায় কারিগর হয়ে ওঠায় তখন মিস্ত্রির দরকার হল।

কে মিস্ত্রি হবে?

এই নিয়ে বলাইতে আর সনাতনে জোর যেখে গেল। সে একেবারে

কুরুক্ষেত্র। আসলে এখানে বলাই ছিল শিখণ্ডী। তার পেছনে দাঁড়িয়ে যে লড়াই চালাচ্ছিল সে হল গোপাল দাস।

এই গোপাল খুব খলিফা লোক। আগে ছিল এই কারখানারই একজন ওয়েল্ডার। নতুন হাওড়া পুলের কাজ যখন অর্ধেক শেষ, গোপাল তখন সনাতনের সঙ্গে ঝগড়াকোঁদল ক'রে এ কারখানা ছেড়ে দিয়ে বিবিজে কোম্পানিতে কাজ নেয়। পুল বানানো শেষ হয়ে গেলে বিবিজে তখন বাড়তি মালপত্র জলের দরে বেচে দিতে থাকে। গোপাল তখন বউয়ের গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে সায়েবকে পটিয়ে-পাটিয়ে মাত্র কয়েক শো টাকায় একটা মোটা ওয়্যার রোপ, যেটা মাল তোলার কাজে লাগে আর সেই সঙ্গে একটা ওয়েল্ডিং মেশিন কিনে নেয়। নামমাত্র টাকায় কিনে পরে এই মেশিনটা সে বিক্রি করে তিন হাজার টাকায়।

গোপালের বাপের ছিল লোহালক্কড়ের ছোট্ট একটা দোকান। এই দোকান যখন ফেল পড়ার উপক্রম হয়, গোপাল তখন বাপকে সরিয়ে দিয়ে দোকানটা নিজের হাতে নেয়।

লড়াই লাগার পর যখন পেরেকের খুব অভাব হল, গোপাল তখন একটা মেশিন কিনল। তারপর বাজার থেকে কট্‌পিস্, মানে ছাঁট লোহা, কিনে জুতোয় হাফসোল লাগাবার শেয়ালকাঁটা তৈরি করতে লেগে গেল। এই কাঁটা বাজারে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ধ'রে গেল। দুচার মাসের মধ্যে গোপাল আর দাস থাকল না, লাল হয়ে গেল। যুদ্ধের পর এখন তার এখানে বাড়ি, সেখানে বাড়ি, নিজের মোটরে ছাড়া চড়ে না। সে এখন লাখ লাখ টাকার মালিক।

আমি যখনকার কথা বলছি, গোপাল তখনও অত বড় হয় নি। সিঁড়ি ভেঙে সবে উঠছে।

এই গোপাল ছিল সনাতনের একের নম্বরের শত্রু। বলাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে সে-ই সব কলকাঠি নাড়ছিল।

কারখানায় এই নিয়ে দুটো দল হয়ে গেল। অর্ধেক লোক বলাইয়ের পক্ষে, বাকি অর্ধেক সনাতনের পক্ষে। আমরা পাঁচজন

ছিলাম না এ-পক্ষে, না ও-পক্ষে। যে যখন জুলুম করত, আমরা ছিলাম তার বিরুদ্ধে।

বলাইয়ের পয়সাকড়ি ছিল। নিজে ষণ্ডামার্কা। তাছাড়া পেছনে গোপাল থাকায়, সনাতনের পেছনে গুণ্ডা লাগাতে তার পয়সার অভাব হয় নি। বলাইয়ের দল চেষ্টা করছিল সনাতনকে গুম করতে।

সনাতনের বাড়িতে অনেক ক'টি আণ্ডাবাচ্চা। তার টানাটানিতে চলত। কিন্তু গুম হওয়ার ভয়ে এক বছর ওভারটাইম খোয়ানো সত্ত্বেও রাত কাজে আসে নি। আর না পেরে শেষ দিকে আবার আসতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাও খুব সাবধানে যেত আসত।

একদিন বলাইয়ের দল সনাতনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাগীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মদের সঙ্গে সিগারেটের ছাই মিশিয়ে ওকে বেহুঁশ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেইদিন ঐ বাড়ির ছাদে একটা খুন হওয়া উপলক্ষে পুলিশ এসে পড়ে। ফলে, সনাতনকে ওরা গুম করতে পারে নি।

এ লড়াইতে কোন্ দল জিতবে, সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছিল আমাদের পাঁচজনের ওপর। যাদের পাণ্ডা ছিলাম আমি। গুণ্ডাদের ওপর আমাদের প্রভাব ছিল। তাছাড়া মারামারির ব্যাপারেও আমাদের নামডাক ছিল।

একদিন কী একটা কারণে আমি সনাতনের ওপর খুব খচে গিয়েছিলাম। বলাই ঠিক সেটা লক্ষ্য করেছে। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বোটের তলায়। তারপর ওদের প্ল্যানের কথা বলল। সেদিন সনাতন যখন রাত কাজে আসবে তখন মেথর পাড়ায় সনাতনকে ওরা ধ'রে খুন ক'রে তার লাশ ময়লা ফেলার খালে ফেলে দেবে। জল সেখানে এত ভারী যে, সহজে ধরা পড়ার ভয় নেই।

বিকেলের দিকে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। গল্প করতে করতে সনাতনকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বললাম, আজ আর রাত কাজে আসবেন না। ক্ষতি হতে পারে। এর বেশি কিছু বলব না।

সনাতন আমার হাতদুটো ধ'রে বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলল।

পরদিন আমার দলের পাঁচজনের মধ্যে একজনকে ডেকে বললাম, আজ থেকে আমরা সনাতনের দিকে। শুনে দলের পাঁচজনই রাজী হয়ে গেল।

কোম্পানিকে জানিয়ে দিলাম, সনাতনকে আমরা মিস্ত্রি ব'লে মানছি। কোম্পানি রাজী হয়ে গেল, সনাতন হল মিস্ত্রি। বলাইয়ের দল চটল। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারল না।

তারপর একটানা দু বছর ধ'রে আমরা পালা ক'রে সাইকেলের পেছনে কিংবা সামনে রডে বসিয়ে সঙ্গে ছুরি নিয়ে সনাতন মিস্ত্রিকে রাত কাজে কারখানায় পৌঁছে দিয়েছি। সনাতনকে আমরা বলতাম কাকা। আর হরি মিস্ত্রিকে বলতাম জ্যাঠা।

বলাইয়ের দল তার জন্যে আমাদের নাম দিয়েছিল 'মিস্ত্রিদের ধেলোধরা'।

আমার কথা

আচ্ছা, এই দেবীবাবুটি কে? আজকাল এ-কাগজে সে-কাগজে দেখছি বস্তুবাদ ভাববাদ নিয়ে খুব লিখছেন? কয়েকজন বলছিল উনি নাকি পার্টির লোক। পার্টির লোক? কই পার্টি আপিসে তো কখনও আসতে দেখি নি! তা ভদ্রলোকের এলেম আছে। ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ দলটার হয়ে জবর লড়ে যাচ্ছেন। কী যেন ভাল আরেকটা বই লিখেছেন, সেটা নিয়ে আমাদের কাগজে গালমন্দ করেছিল, কিন্তু ভদ্রলোককে সাবাস দিতে হয়। নিজের ভুলটা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, ভদ্রলোক যেসব জিনিসে ঘা দিচ্ছেন সে সব জিনিসের দিকে আমরা মার্ক্সবাদীরা আগে কখনও তাকিয়েও দেখতাম না। যেমন, স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের

কুকুর নিয়েও বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারটা। আবার অন্যদিকে এতদিন পরে এমন কি আমাদের দেশ কালের পেছনের ইতিহাসটা নিয়েও টান পাড়াপাড়ি শুরু হয়েছে। 'পার্টির কে কী করছে—তা সে শ্রমিক কৃষক ফ্রন্টেই হোক আর সংস্কৃতি ফ্রন্টেই হোক—পার্টি সেদিকে কড়া নজর রাখছে। আমাদের কাগজে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বড় সুন্দর ক'রে একটা কথা বলা হয়েছে—তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর তাঁবুতে পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু মাথাগুলো রেখে এসেছেন বুর্জোয়াদের তাঁবুতে। খুব ঠিক কথা। তবে আমার আশা আছে, মাথা কাটা যাবার আগে নিশ্চয়ই তাঁরা মাথাগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। একেই বলে একাধারে শ্রমিক শ্রেণী এবং পার্টির নেতৃত্ব।

এই যে আমরা এতদিন পরে নিজেদের নিয়ে পড়েছি, এবারকার পার্টি লাইনের এটাই বিশেষত্ব। তার জন্যে অমন যে বড় নেতা মাও সে তুং, তাঁকেও আমাদের পার্টি রেয়াত করে নি। এদেশের অবস্থাটা কী সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। তারপর সেইমতো ব্যবস্থা। আমাদের যে বুর্জোয়া, তারা যেমন জোরদার তেমনি টেঁটিয়া। জমিদারদের দলে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটা বাগিয়ে ব'সে আছে। আসলে এরা সাদা সায়েবদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতার ভেখ প'রে হয়েছে কালো সাহেব। এই পচাগলা সরকারকে জোরসে একটা ঠেলা লাগাও। 'জেলের ভেতর থেকেও, কমরেড, আসুন আমরা সেই ঠেলা লাগাই'—বড় কম্বলের দিন একথা বলেছিলেন ছ' নম্বরের তপন সান্যাল।

তপুবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব। ওঁর ক্লাসেই আমি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ পড়ি। উনি খুব মজা ক'রে কথা বলেন। বলেন 'মার্কোস সায়েব' 'লেনিন সায়েব'। ক্লাসে ওঁর সঙ্গে খুব বেধে যায় বারুইপুরের 'পাগলা দাশু'র। ওর নাম দাশরথী। বেজায় ক্ষ্যাপাটে। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। জেলে এসেও বুট পায়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে খেলে। মাঠে ওকে আমি ভয় করি। ভীষণ মেরে খেলে। কী মাঠে

কী ক্লাসে সব সময় রোখা ভাব। জো পেলেই লেঙ্গি মারে। খেলত অত ভাল। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে এখন শুধু কৃষক আন্দোলন করে। তপুবাবুর সঙ্গে পাগলা দাশুর লাগত গ্রামের সমস্যা নিয়ে। মাঝারি চাষীর ভূমিকা কী হবে। বিপ্লবে তাকে সঙ্গে পাওয়া যাবে, না তাকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখতে হবে। ধনী চাষীর সামন্ততান্ত্রিক ল্যাজ বলতে কী? ক্ষেতমজুরের আলাদা সংগঠন হবে কিনা। এই নিয়ে মাস্টারে ছাত্রতে লাগত। তপুবাবু কখনও রাগতেন না। রসিয়ে রসিয়ে জবাব দিতেন।

তপুবাবুর একটা বড় পাইপ আছে। ছোটখাটো মানুষ। চোখ-দুটো সব সময় গুলিভাঁটার মতো। মুখটা ছোট, গালভাঙা। আমরা বলি তপুবাবুর ছোট মুখে বড় পাইপ। ওঁর কাছে শিখেছি পাইপের তামাক কিভাবে বাঁচাতে হয়। পাইপ যখন খাওয়া হয়ে গেল তপুবাবু তখন ছাইসুদ্ধ পোড়া তামাকটা একটা খালি টিনের ঢাকনায় রাখলেন। দেখা যাবে তখনও না-পোড়া আর আধপোড়া তামাক ঐগুলের মধ্যে রয়ে গেছে। সেইগুলো রাখার জন্যে তপুবাবুর আলাদা খালি টিন আছে। ঐগুলো জমলে তখন তাই দিয়ে তামাক সাজা হবে। একে বলে, কমরেড, তামাক বাঁচানো।

তপুবাবু বড় সুন্দর বাহে ভাষা বলতে পারেন। ওঁর ঘরে গেলে বলেন তেভাগার সময়কার বোদা-পচাগড়ের চাষীদের গল্প। বলেন একেবারে চাষীদের ভাষায়। তাঁর একেকটি বাক্যে একেকজন চাষী মাঠের কাদা পায়ে গোটা শরীরে ক্ষিধে, রাগ, ব্যথা, সাহস নিয়ে আমার সামনে উঠে আসত। অথচ তপুবাবুদের অবস্থা খুবই ভাল। বাবার জমিজায়গা, চা-বাগানে মোটা শেয়ার—সবই আছে। অবস্থা ভাল ব'লে মোটা অঙ্কের পারিবারিক ভাতা পান। তাঁর বাড়ি থেকে বাবা মাসে মাসে হাতখরচের টাকা পাঠান। তপুবাবুর হাঁটার ধরনটাও অদ্ভুত। পাখির মতো তাঁর ঘাড় প্রতি পদে একবার এদিক একবার ওদিক হয়। রোগা তপুবাবুর জন্যে মনটা খারাপ লাগছে। এই

শরীরে এত দিনের হাঙ্গার-স্ট্রাইক চালাতে গিয়ে ওঁর কোনো বিপদাপদ না হয়।

ন' নম্বরে আছেন মাথাঠাণ্ডা সুবিমলবাবু। মাথায় টাক। দেখে মনে হয় এক সময়ে দেখতে খুবই ভাল ছিলেন। দীর্ঘদিন ছিলেন জেলা পার্টির সম্পাদক। পরে এসেছিলেন আমাদের কাগজে। লেখা-পড়ার মাথাটা খুব ভাল। আমি, সুবিমলবাবু, বংশী আর বিষ্টুবাবু —আমরা চার জনে দল ক'রে ইদানীং ক্যাপিটাল পড়ছিলাম। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ ক'রে সবে আমরা তৃতীয় খণ্ড শুরু করেছিলান। দেখেছি আমি যেমন দলের মধ্যে সবচেয়ে দেরিতে বুঝি, তেমনি উনি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেন। ওঁর কাছে এমন কি বংশীও হার মেনে যেত। এ নিশ্চয় ওঁর ঐ অনেকদিন ধ'রে শ্রমিক আন্দোলন গুলে খাওয়ার ফল। বংশীরও তাই হবে। ফিরে গিয়ে ও নিশ্চয় আবার ট্রেড ইউনিয়নেই লাগবে!

কিন্তু সুবিমলবাবুর মাথার কাজ এবার খেলার মাঠে যা দেখলাম তার তুলনা হয় না। খেলা হচ্ছিল বলাইদার দলের সঙ্গে খাঁ সাহেবের দলের। লোক কম পড়ে গিয়েছিল ব'লে সুবিমলবাবু সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে রাজী হলেন। আমাদের তো প্যাণ্ট। তার ওপর পাগলা দাশুর বুট। সুবিমলবাবু খেললেন ধুতিটাকে মালকোঁচা ক'রে নিয়ে। অদ্ভুত ড্রিবলিং। টাক মাথায় অমন হেড করা যায় জানা ছিল না। সারা মাঠ অবাক হয়ে দেখল ওঁর মাথার কাজ।

সুবিমলবাবু দোহারা আছেন। ওঁর জন্যে ভাবনা নেই।

কিন্তু ডোবাল চার নম্বরের দুজন ক্ষেতমজুর আর ছ' নম্বরের একজন বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীদের কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তোরা বাইরে লড়াই ক'রে এসেছিস, চার নম্বরেও ঐ রকম লড়াইটা লড়লি—তারপরও! ছি ছি।

পাড়ার লোকের চোখে একবার যেই উঁচুতে উঠে গেলাম, ব্যস্। তখন সব ব্যাপারে আমাকে তারা ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল। ফুটবল টিম হবে। বাদ্‌শা। ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি হবে। বাদ্‌শা। যাত্রার দল হবে। তাও বাদ্‌শাকেই করতে হবে। আমি দেখলাম উন্নতি হ'য়ে তো ভ্যালা মুশকিলেই পড়া গেল।

আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ভজুর চায়ের দোকান। ভজুর পক্ষাঘাত রোগ। হাতপা কাঁপে। যখন উপায় করতাম না, ভজু তখন তার দোকানের কাছে গেলে দূর্ দূর্ ক'রে তাড়াত। আমাকে সেই ভজুর এখন কী খাতির! বাদ্‌শাবাবু বাদ্‌শাবাবু ব'লে অজ্ঞান।

বরকত প্রায়ই ভজুর দোকানে এসে অ্যাক্টিং করত। ওর ছিল খুব যাত্রার নেশা। একদিন আমাকে ধ'রে বলল থানামাকুয়ার বাগদীপাড়ায় যতীনের যে ক্লাব আছে, সেখানে একবার যেতে হবে। যতীনের সঙ্গে ওর ঝগড়া হওয়ায় একেবারে শেষ মুখে এসে যতীন বলছে এবারের যাত্রায় বরকতকে শত্রুজিতের পার্টে নামাবে না। বই হচ্ছিল 'নবরাত্র'। গেলাম। মোশান মাস্টার ভূপতিবাবু অরাজী ছিলেন না। আমি বলায় যতীনও রাজী হল।

আগে আমার যাত্রায় কোনো টান ছিল না। যতীনদের ক্লাবে গিয়ে রিহার্সাল শুনে আর সখীর দলের নাচ দেখে যাত্রায় আমার ঝোঁক লেগে গেল। পাড়ার ছেলেরা ধ'রে বসল পাড়ায় একটা যাত্রার ক্লাব চাই। ভূপতি মাস্টারের কাছ থেকে ভরসা পাওয়া গেল। তখন ক্লাব তৈরির কাজ নিয়ে পড়লাম।

ভজুর দোকানের অর্ধেকটা নেওয়া হল। সেখানে দেয়াল তুলে জানলা ফুটিয়ে হল আমাদের ক্লাবঘর। আমাকে বলল পার্ট নিতে। আমি কিছুতেই রাজী নই। হাড় বার করা চোয়াল, এই রকম চেহারা।

এসব ব'লেও ওদের কাছ থেকে রেহাই পেলাম না। ওরা বলল, মেক-আপ করলে ওসব ঠিক হয়ে যাবে। নিমরাজী হয়ে গেলাম! মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছিল। আবার লজ্জাও করছিল। লজ্জার চেয়ে বেশি ভয়।

শেষে তো বই ঠিক হল 'বঙ্গবীর'। আমাকে ওরা ক্লাবের ম্যানেজার ক'রে দিল। ভজুর দোকান যেখানে, সেই বাজারের আবহাওয়া বদ্‌লে গেল। দলে দলে লোক আসছে মহলা দেখতে। ক্লাবঘর সরগরম হয়ে উঠল।

পাড়ায় হল প্রথম রাত্তিরের অভিনয়। স্টেজ বাঁধতে পর্দা খাটাতে, আলোবাতি আনতে খরচ হল ষাট টাকা। এর পেছনে যাদের ট্যাঁক থেকে বেশ কিছু খসল তার মধ্যে ছিল কেষ্টধন বাঁড়ুজ্যে।

কেষ্টধনের বাবা ছিল বার্নের ক্যাশবাবু। অবস্থা মাঝামাঝি। কেষ্ট পড়াশুনো না ক'রে ছেলেবেলাতেই বখে যাওয়ায় ওর বাবা ওকে ওয়েল্ডারের কাজে লাগিয়ে দেয়। পরে কেষ্টধনের বাবা কোম্পানির সত্তর আশি হাজার টাকার তহবিল তছরুপের দায়ে ধরা পড়ে। দুজনেরই চাকরি যায়। পরে সে কারখানায় কিছু কিছু কাজ পেত।

কেষ্ট বিয়ের রাত্তিরেই বিধবা বড় শালীর প্রেমে পড়ে যায়। এদিকে কিছুদিন বাদে শ্বশুর মারা যাওয়ায় শ্বশুরের বিরাট গুষ্টি তার ঘাড়ে এসে পড়ে। ওয়েল্ডিঙের কাজে যা হয়ে থাকে, কেষ্টর চোখের দোষ হল। ভাল দেখতে পায় না। বাড়িতে ভরপেট খাওয়া জোটে না। বলাই আর রব্বানি, এই দুই মিস্ত্রি, কেষ্টর অভাবের সুযোগ নিয়ে ওর শালীর দিকে নজর দেবার চেষ্টা করত। কারখানায় কেষ্ট সব সময় মনমরা হয়ে থাকত। মাঝে মাঝে কাঁদত। রাত কাজে আসত না চোখে দেখতে পায় না ব'লে। এই সময় কেষ্টর সঙ্গে আমার ভাব হয়। কেষ্ট আসত কদমতলা থেকে। পায়ে হেঁটে। ভোর পাঁচটায় রওনা হয় আর কারখানায় পৌঁছুত আটটায়। কেষ্ট নিরীহ গোবেচারী ব'লে মিস্ত্রিরা দেখত নরম মাটি। কাজেই তার ওপরই জুলুম করত সবচেয়ে বেশি। প্রায়ই তাকে কাজ নেই ব'লে হাঁকিয়ে

দিত। আমি ওকে কিছুটা সাহায্য করবার চেষ্টা করতাম। যাতে কাজ পায় দেখতাম।

এই সময় কেষ্ট আমাদের যাত্রার দলে ভিড়ে গেল। ও খুব ভাল যাত্রা করত। যাত্রার ভেতর দিয়ে মনমরা ভাব কাটিয়ে উঠে কেষ্ট যেন এতদিনে নিজেকে ফিরে পেল। লোকজন তার নাম করতে লাগল। ফলে, কারখানাতেও কেষ্টর কদর বেড়ে গেল।

আমার কথা

বলাইদার কাছ থেকেই আমরা আবু হোসেনের ব্যাপারটা শুনি। হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু হওয়ার ঠিক আগে ছাড়া পেয়ে চলে যাওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে আবু হোসেন দেখা করতে এসেছিলেন। জেলের পোশাক ছেড়ে নতুন ধুতিপাঞ্জাবি প'রে।

আমরা যারা অনেকদিন এ জেলে আছি, আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক সময় বলাবলি করতাম। এ জেলে অনেক দেখলাম তো অনেক সব ভদ্দরলোক। নোট জাল ক'রে আসা শান্তিপুরের গোঁসাই, ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ক'রে আসা সুধীরবাবু, রেপ কেসের মুকুন্দ রায়—কেউ ঘানি ঘোরায় না, হাড়ির কাজ করে না, খুন্তি ঠেলে না—সব বেটা বাবু। কয়েদীবাবু। রাইটার। জেল আপিসে কলম ঠেলে। রাইটার। রাইটার নামটাতেই ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।

এর মধ্যে একমাত্র ভদ্রলোক আবু হোসেন সায়েব। এমন নম্র ব্যবহার। এমন মিষ্টি কথা। আর খুব ধর্মভীরু। সারা জেলের লোক আবু হোসেন সায়েবকে ভালবাসত।

ছাড়া পাওয়ার দিন অনেকেরই চোখেমুখে হাসি উপচে পড়ে। আবু হোসেন সায়েব কেমন যেন নির্বিকার। বরং একটু বাধো বাধো ভাব। নতুন পরিবেশে নতুন ক'রে নিজেকে খাপ খাওয়াতে হবে।

উনি খুনী আসামী, এটাই আমরা জানতাম। কেন কী বৃত্তান্ত

কিছুই জানতাম না। শুধু শুনেছি এসেছিলেন ভরা যৌবনে আর দেখছি ফিরছেন প্রায় প্রৌঢ়ত্ব পার ক'রে দিয়ে।

আমরা জিগ্যেস করলাম, 'ফিরে গিয়ে কী করবেন ভেবেছেন?'

আবু হোসেন সায়েব এক গাল হেসে বুক পকেট থেকে জেলের ছাপমারা একটা চিঠি যত্ন ক'রে বার করলেন। চিঠির ওপর দেখলাম কৃষ্ণনগরের ঠিকানা।

ওঁর প্রাণের বন্ধু কে এক বিপিন চৌধুরী লিখেছে, আবু হোসেন সায়েবের রোজগারের জন্যে একটা মনিহারি দোকান ঠিক ক'রে রাখা হয়েছে, থাকার জন্যে আলাদা ঘর—সব কিছু ব্যবস্থা পাকা। বন্ধু জেল গেটে নিতে আসবে।

শুনে আমাদের কী যে ভাল লাগল বলবার নয়।

উনি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর আবু হোসেন সায়েবের জেলে আসার গল্পটা শুনলাম।

আবু হোসেন সায়েবের প্রাণের বন্ধু ছিল ঐ বিপিন। আবু হোসেনের নিজের বলতে কেউ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। বাড়ি বাড়ি ছেলে পড়িয়ে নিজের পড়াশুনো চালাতেন। বিপিন তাঁর ছাত্র-জীবনের বন্ধু। বন্ধু মানে খুবই বন্ধু।

কলেজ ছেড়ে বিপিন যখন চাকরিতে ঢুকল তখনও আবু হোসেন ছেলে পড়িয়ে নিজের পেট চালান। ওঁর ছিল লাইব্রেরিতে খুব পড়ার ঝোঁক।

ইতিমধ্যে বিপিন পড়ে গেল প্রেমে। সেই সূত্রে আবু হোসেনের সঙ্গেও মেয়েটির খুব চেনা পরিচয় হল। লোকে অনেকেই ওদের তিন জনকে একসঙ্গে দেখেছে। আবু হোসেন মুসলমানের ছেলে তো, কাজেই হিন্দু মেয়ের সঙ্গে ওর মেলামেশাটা কেউই ভাল চোখে দেখে নি।

মেয়েটি বিপিনের স্বজাতের ছিল না। ফলে মেয়েটির বাড়ি থেকে আপত্তি হয়। ভেতরে ভেতরে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে থাকে। মেয়েটিও চাপে পড়ে তাতে রাজী হয়।

ব্যাপারটা তার পরই ঘটে। একটা নিরিবিলি জায়গায় আবু হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে বিপিন শেষ বারের মতো চেষ্টা করে মেয়েটিকে বোঝাতে। তারপর যে কী হয়, কেউ সঠিক জানে না। একটা রক্তাক্ত ছোরা নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে যেতে যেতে আবু হোসেনকে লোকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। মেয়েটিকে পাওয়া যায় মৃত অবস্থায়। কেস্ অনেকদিন চলে। বিপিন এই সময় বহু টাকা পয়সা খরচ করে আবু হোসেনকে বাঁচাবার জন্যে। আবু হোসেন বেঁচে গেল। তবে সে শুধু ফাঁসীর হাত থেকে। বিচারে শেষ পর্যন্ত তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

আদালতে আবু হোসেন তার বন্ধুর ঘাড়ে দোষ চাপায় নি। নিজে দোষ স্বীকারও করে নি। আবু হোসেনের মুখ থেকে আদালত একটি কথাও বার করতে পারে নি।

আমরা বলাইদাকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'আবু হোসেন সায়েবই তো খুনটা করেছিল ?'

বলাইদা বললেন, 'না। ঝোঁকের মাথায় খুন করেছিল বিপিন।'

একজন বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে এ ভাবে নিজেকে যমের মুখে ঠেলে দেওয়া, আজকের যুগেও এ জিনিস হয় ব'লে কখনও শুনি নি। অথচ মানুষটাকে তো আমরা দেড় বছর ধ'রে চোখের ওপর দেখেছি। আবু হোসেন সায়েবকে বিশ্বাস করা যায়। উনি যদি বলাইদাকে এসব ব'লে থাকেন, তাহলে এর সবটাই যে সত্যি—সে বিষয়ে আমাদের কারো কোনো সন্দেহ ছিল না।

হঠাৎ আবু হোসেন সায়েবের কথা কেন মনে পড়ে গেল ?

কাল স্বপ্নে দেখলাম ভবানী দত্ত লেনের সেই বাড়িটা। দোতলায় কোণের দিকে মেঝেতে মাদুরপাতা সেই ঘর।

আমাদের মিটিং হচ্ছে। সুরেশ্বর তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে খালি প্যাকেটটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর যেই সে ধরিয়েছে অমনি আমি, মনীশ আর বিজিত তিন জায়গা

থেকে ব'লে উঠলাম, 'বুকুড়্'। সুরেশ্বর মুখটা বেজার করল। তারপর মিটিং ভাঙতেই কমল আর মনীশ লাফ দিয়ে সুরেশ্বরের ফেলে-দেওয়া প্যাকেটটা তুলে নিতেই সুরেশ্বর হাঁ হাঁ ক'রে তেড়ে গেল। প্যাকেটে তখনও সিগারেট ছিল। সুরেশ্বরের কায়দাটা ওরা ধ'রে ফেলেছিল আগের দিন। কিন্তু তার মধ্যেও তখন কী বন্ধুত্বই না ছিল।

কোথায় গেল সে সব বন্ধু? বন্ধুরা সব আজ কে কোথায়?

প্রথম রাত্তিরে আমাদের অভিনয় খুব উৎরে গেল। সবাই চেনাজানা আপন লোক ব'লেই বোধহয় পাড়ায় সকলেই খুব তারিফ করল। বিশেষ ক'রে কেষ্টকে আর আমাকে বাহবা দিল। তাছাড়া নবনারীতলার বারোয়ারী থেকে আমাদের ক্লাবকে যাত্রা করার জন্যে ডাকল।

গোড়া গোড়ায়, কেন জানি না, বা-জান আমাদের এই যাত্রা করাটা সুনজরে দেখে নি। কিন্তু যখন দেখল বাইরে থেকেও ডাক আসছে, বাইরের লোকেও সুখ্যাতি করছে—তখন বা-জানের টনক নড়ল। বা-জান হয়ে গেল আমাদের নিয়মিত দর্শক। যেখানেই যাত্রা হবে সেখানেই বা-জান যাবে। শুধু যাবে তাই নয়, সেইসঙ্গে দেবে নগদ একটা দুটো টাকা আর মেডেল দেবার প্রতিশ্রুতি। মেডেলটা অবশ্য শুধু কথার কথা হয়েই থাকত, শেষ অবধি দিত না এবং যে পাবে সেও শেষ পর্যন্ত ভুলে যেত।

আমাদের ক্লাবে সখীর দলে নাচত নিমাই, সাধু আর ছানু। তিনজনই বাচ্চা ছেলে। আগে ছিল যতীনদের ক্লাবে। প্রথম নাইটে ওদের ভাড়া ক'রে আনা হয়। কিন্তু আসার পর আর ফিরে গেল না। আমাদের ক্লাবেই স্থায়ীভাবে থেকে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই নাচিয়ে হিসেবে ওদের বেশ নাম হয়ে গেল।

তিনটি ছেলেরই বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। নিমাইয়ের বাবা থানামাকুয়ার মদের দোকানে চাট বিক্রি করত। সাধু ছিল মুচীর ছেলে। মা ছিল বিধবা। এত গরিব যে, বাড়িতে দুবেলা ভাত জুটত না। সাধুর মা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেঁড়া কাপড় জুটিয়ে আর খেংরা কাঠি কিনে ঝাঁটা তৈরি ক'রে বাজারে বিক্রি করত। ছানুর বাবা কাজ করত রশিকলে। বাড়িতে গাদাগুচ্ছের ছেলেপুলে। অবস্থা খুবই খারাপ। থাকার মধ্যে ছিল ছিটেবেড়ার দু কামরার ঘর।

ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনজনকেই আমাদের কারখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

নিমাই এল আমাদের ডিপার্টে ওয়েল্ডিঙের কাজ শিখতে। সাধু গেল মেশিন শপে বা-জানের কাছে। ছানুকে লাগিয়ে দেওয়া হল প্যাটার্ন শপে ছুতোরের কাজে।

তিন জনের মধ্যে একমাত্র টি'কে গেল মুচীর ঘরের বিধবা মায়ের ছেলে সাধু। সাধু বড় হয়ে উন্নতি করল। ইউনিয়নের কাজেও পরে নিজেকে ও ঢেলে দিল। নিমাই আর ছানু, কেউই শেষ পর্যন্ত টি'কল না। দুজনেই মদভাড়ি ধরল। ফিরে গিয়ে তারা যে যার বাপের কাজে লেগে গেল।

লড়াইয়ের বয়স দু বছর হতে আমাদের সময়টা ফিরে গেল। বাড়িতে তখন রোজগেরের সংখ্যা বেড়েছে।

প্রথম কথাই হল, এবার আমাদের ঘর না তুললেই নয়। হোজরার মধ্যে গুঁতোগুঁতি ক'রে আর থাকা যায় না। বা-জান ভাবছিল মাটির ঘর বানাবার কথা।

সোরাব চাচা সব শুনে টুনে বলল, তার চেয়ে দশ ইঞ্চি গাঁথুনির ইঁটের ঘর আর টিনের ছাউনি করো। খরচের তফাত তেমন কিছু হবে না।

ঘর তৈরি শুরু হল। প্ল্যান কিছু বদ্‌লাল। দুইয়ের জায়গায় তিন কামরার ঘর আর একটা বৈঠকখানা; দশ ইঞ্চির জায়গায় হল পনেরো

ইঞ্চি গাঁথুনির ইট ও টিনের বদলে ইটের ছাদ। ইট কেনা হতে লাগল মাসে মাসে। নতুন প্ল্যানে প্রচুর টাকা ধারদেনা হয়ে গেল।

তারপর হল আমাদের দু ভাইয়ের বিয়ে। বিয়ের পাল্টানে পড়ে আমাদের দশ কাঠা জমি চড়া সুদে বন্ধক দিতে হল।

আমার কথা

মনের ভাব যে কি রকম বদলে যায় ফোর্স ফিডিংএর ব্যাপারটা দিয়ে সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারি।

এখন বালতি ঠনঠনানোর আওয়াজ হলেই মনে হয়, ঐ আপদ আসছে।

আপদ ঠিকই। কিন্তু বেঁচে থাকারও এখন একটা পরম নির্ভর তো বটে। সত্যি বলতে কি, নাকের মধ্যে এই খোঁচাখুঁচি একদিন দুদিন অন্তর পেড়ে ফেলে খাওয়ানোর এই একঘেয়েমি—সব মিলিয়ে যে নিদারুণ অরুচি, সেটা কাটাবার একমাত্র উপায় দেখলাম জোরসে বেঁচে থাকার কথা ভাবা। 'কারখানা' চালানো। জীবনের সুলভ থেকে দুষ্প্রাপ্য সমস্ত রকম সাধ আহ্লাদের কথা মনে করা। না কী বলেন?

ওদের ফোর্স ফিডিংএর ঘটা দেখে বুঝে নিয়েছি স্বাভাবিকভাবে ওরা আমাদের মরতে দিতে চায় না। যদি খাওয়াতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সেটা হবে অস্বাভাবিক ব্যাপার। বালতিতে দুধের রং দেখে বোঝা যায় জল মেশানোটা এখন মুলতুবি আছে। ডিম চুরি হচ্ছে কিনা জানি না। গন্ধে ব্র্যাণ্ডির উপস্থিতিও মালুম হচ্ছে। সব মিলিয়ে অবস্থাটা আশাপ্রদ।

শুধু আমাদের পক্ষে নয়, ওদের পক্ষেও। আমরা থাকলে—ওরা যে থাকে, শুধু তাই নয়—ওদের থাকে।

আমাদের অনশনের সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের যে কত ভাবে উপোষী

ছারপোকার দশা হয়েছে, তা বলার নয়। আমাদের এই ডেটিনিউ পাড়ার কিচেনে রোজ দুবেলা যজ্ঞিবাড়ির ভিয়েন বসে। বাজার হয় সব মণের হিসেবে। চাষীর হাত থেকে আমাদের হাতের মাঝখানে দৃশ্য আর অদৃশ্য হাতের সংখ্যা কম নয়। সবাই হাত পেতে আছে। সবাই কম বেশি পেতে চায়।

আমরা উদরস্থ করার কাজটা বন্ধ করায় রাজকোষ থেকে বেশ বড় পরিমাণ অর্থ আটকে থাকছে। তার এই অচলাবস্থায় হিসেবনিকেশের কাজে টান পড়ছে। কাগজকালি বেঁচে গিয়ে নানা দিকে নানা লোকের নানা রকম অভাব দেখা দিচ্ছে। এটা গেল জেলখাতে টাকার আমদানির দিক। এরপর সেই টাকা খরচের দিক। ঠিকেদার মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে। তার ওদিকে রয়েছে দোকানদার, পাইকার মায় চাষী, এবং যানবাহন সংক্রান্ত মজুর অবধি। এদিকে জেল কর্মচারী থেকে সশ্রম মেয়াদের কয়েদী। এছাড়া বাইরের স্পেশালিস্ট, জেল হাসপাতালের ডাক্তার, সেপাই, মেট, পাহারা, ফালতু এবং ওষুধের উৎপাদক থেকে সরবরাহকারক ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং এই এত লোক চাইছে আমাদের হাঙ্গার-স্ট্রাইক যেন শেষ হয়। ওরা ভাবছে, কেন আমরা নিজের নাক কেটে ওদের যাত্রা ভঙ্গ করছি?

সুতরাং সরকার পক্ষের ভেতর থেকে অনশন মেটাবার জন্যে একটা প্রবল চাপ রয়েছে, এটা ধরে নেওয়া যায়। এদের সঙ্গে সরকারের মাতব্বর মুরুব্বিদের নানা সূত্রে ব্যক্তিগত এবং শ্রেণীগত সম্পর্ক আছে। কাজেই এই সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে উপনীত হওয়া যায় যে, এ অনশনের শেষ আছে।

এইসব ভেবে এখন আমি সময়ের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছি। কিন্তু 'সমর্পণ' কথাটা আমার দাদু-আম্মার। ওর মধ্যে অদৃষ্টবাদ, ভগবৎবিশ্বাস ইত্যাদি অযৌক্তিক জিনিসের গন্ধ আছে। আমি বলব 'নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি'।

সময় বলতে এখানে কাল মহাকাল ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নয়। সময় বলতে মেয়াদ। না-হওয়া থেকে হয়ে-ওঠার পর্যায়।

একটা বিষয়ে আমাকে সব সময়ে সাবধান থাকতে হয়। আমি বড় হয়েছি ধর্মবিশ্বাস আর ধর্মাচরণের আবহাওয়ায়। অনেক অন্ধতার সাত পাকে আমি বাঁধা। যখন আমি 'তুলে দেওয়া' বা ছেড়ে দেওয়া' না ব'লে 'সমর্পণ করা' বলি, তখন শোনায় যেন ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করার মতো।

যখন চূড়ান্তভাবে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েছি, তখনকার একটা ঘটনা মনে আছে। একদিন বাসে ব'সে আছি। হঠাৎ দেখি সামনের সিটে এসে বসলেন একজন জাঁদরেল ছাত্রনেতা। আমি তাঁর অপরিচিত একজন ভক্ত, ছাত্রসভায় তাঁর বক্তৃতার গুণমুগ্ধ শ্রোতা। চোখে ইশারা ক'রে আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লাম। তার মানে, একটা কথা আছে এবং ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতে হবে। সেটা শোনবার জন্যে ঘাড় নিচু ক'রে তিনি তাঁর কানটাকে এনে উপযুক্ত দূরত্বে রাখলেন। আমি ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিগ্যেস্ করলাম, 'মার্ক্সবাদের সঙ্গে ধর্মটাকে কি কিছুতেই মেলানো যায় না?' ছাত্রনেতাটি আমাকে একজন ড্যামরাস্কেলফুল ভেবে আমার দিকে ফিরে এমনভাবে তাকালেন যে, আমার বুক শুকিয়ে গেল। পিছিয়ে সোজা হয়ে ব'সে, সবাইকে শুনিয়ে, যেটা আমি চাই নি, তিনি আমার মুখে ঠাস ক'রে চড় মারার মতো ক'রে বললেন, 'না।' আমার সে সময়কার 'হিরো', মার্ক্সবাদী এই ছাত্রনেতাটি পরে কংগ্রেসে যোগ দেন, আইএনটি-ইউসির নেতা হন, পণ্ডিচেরীর ভক্ত হন এবং মারা যান।

তাঁর যেমন বদল হয়, আমারও তেমনি বদল হয়েছে। এখন আমি সেদিনকার তাঁর সঙ্গে একমত। আমি তাঁর কাছে বলতে গেলে কৃতজ্ঞ। আমার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ। ভাবতে বেশ মজা লাগে, আমারই সময়ের একজন সমভাবাপন্ন মানুষ আকস্মিক এক সাক্ষাতে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দিয়ে গেলেন একটি মাত্র একস্বর

শব্দ—'না'। আমার ধ্যানধারণা বদ্‌লে দেবার পক্ষে সেই একটা কথাই যথেষ্ট হয়েছিল।

এখন আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না। সুতরাং ভজনপূজনেও বিশ্বাস নেই।

কিন্তু এ বিষয়ে যিনি আমার মনের জোর বাড়িয়েছিলেন, তাঁর কথা শুনলে আমার বন্ধুরা হাসবে। হঠাৎ কাল থেকে তাঁর মুখটা ভীষণ মনে পড়ছে।

চোখে ভয়ঙ্কর মোটা কাঁচের নীলচে চশমা। চোখের খুব কাছে না ধরলে কিছু পড়তে পারেন না। গেরুয়া রঙের লুঙ্গিটা সব সময় ঠিক সাব্যস্ত করতে পারেন না। গা খালি রাখতেই বেশি পছন্দ করেন। যেমন ছটফটে তেমনি খিটখিটে। দাদুর সঙ্গে গেলে বলতেন, 'ওকে রেখে দিয়ে শিগ্‌গিরই চলে যান—যে যে জায়গায় মাথা ঠুকবার আছে, ঠুকে আসুন।' প্রথম দিনই দাদু আমাকে ব'লে দিয়েছিল, উনি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পছন্দ করেন না। তারপর দাদু যেই সরে যেত, অমনি ওঁর অন্য ভাব। হাসিখুশি। আমুদে। আমার খুব ভাল লাগত। আলমারি থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসত কমলালেবু আর সন্দেশ। সমস্তই ওঁর ভক্তদের দেওয়া। কিন্তু আমি দেখেছি, ওঁর ঐ কড়া ভাবের জন্যে ওঁর কাছে খুব কম লোকই ঘেঁষত।

তারপর কমিউনিস্ট হওয়ার পর ওঁর কাছে বহুকাল যাই নি। আমার ভয় হত। আমাকে যদি ঐ নিয়ে যা তা বলেন কিংবা আমাকে যদি ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে হয়, আমার ভাল লাগবে না। আমার দুর্বলতার কথা দাদু জানত। ধর্ম সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবটাকে বাদ দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলে দাদুরও কমিউনিজমে কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু তার উত্তরে দাদুকে আমারও এক কথা 'না' শুনতে হয়।

দাদু আমাকে একদিন শরীর খারাপ ইত্যাদির বাহানা তুলে নীল কাঁচের চশমাপরা মহারাজের কাছে নিয়ে গেল। হয়ত দাদুর মনোগত ইচ্ছেটা ছিল আমাকে একটু শিক্ষা দেওয়া অথবা নিদেন পক্ষে একটু

বিপদে ফেলার। আমাকে নিয়ে গিয়ে দাদু প্রথম কথাই বলল, 'জানেন তো অরু এখন কমিউনিস্ট হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখের ভাব বদ্‌লে গিয়ে হাসি ফুটতে দেখে নিজের চোখকেই সেদিন আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তারপরই ওঁর মুখ থেকে যে কথাটা বেরিয়ে এল তাতে আমার মনের সমস্ত মেঘ কেটে গেল। বললেন, 'খুব ভাল কথা। অরু তাহলে ভণ্ড তপস্বী হয় নি।' দাদু একটু মিইয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাকে খুশি হতে দেখে দাদুও খুশি হল।

দাদু আম্মার দীক্ষা নেওয়ার কথা আমার মনে আছে। দাদু আম্মাকে বলেছিল, এখানে দীক্ষা নিলে মাছমাংস ছাড়ার ব্যাপার নেই। ওসব জপতপ, মালা ঘোরানো---কিচ্ছু নেই। দিনে একবার মনে মনে ভগবানের নাম করা, ব্যস্‌। অর্থাৎ, কত সুবিধে।

আমি মনে করি, দাদু আর আম্মার দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসটা অবান্তর হতে পারত। দাদুর মধ্যে আম্মার মধ্যে লোভ ছিল না, স্বার্থপরতা ছিল না, হিংসাদ্বেষ ছিল না—সকলে মিলে হাত ধরাধরি ক'রে বাঁচার পক্ষে এই গুণগুলোই তো যথেষ্ট। ধর্ম বলতে যদি ধ'রে রাখার ব্যাপার হয় তাহলে আর কী চাই?

এক আছে পরজন্ম কিংবা পরলোক। অর্থাৎ লোভ আর স্বার্থকে এ জন্মে ঠেকিয়ে রেখে জন্মান্তরের জন্যে তুলে রাখা। আমি আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করি না। আম্মা করত। দাদু করে।

তাহলে কি দাদুর ধর্ম জিনিসটা এ জন্মের একটা সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট?

বাদশার কথা

রবিবার

ইস্কুলে পড়লাম, কারখানায় ঢুকলাম, বিয়ে করলাম—তার মানে, বয়স তো কম হল না। না কী বলেন? কিন্তু, কমরেড, তখন পর্যন্ত রাজনীতির ধারে কাছে নেই। বড় জোর ভাবতাম মজুরদের কিসে সুবিধে আর কিসে অসুবিধে।

আরেকটা জিনিস বেশি ক'রে ভাবতাম যে, আমরা মুসলমান। কাগজে মুসলমানের উন্নতির কোনো খবর দেখলে মনে ভাল লাগত। মুসলমানদের যেসব স্বাধীন দেশ—তুর্কি, মিশর, ইরান, আফগানিস্থান, এসব খুব আপন মনে হত। যেখানে মুসলমান শুনলে কেউ নাক সিঁটকোবে না, বরং মুসলমান হওয়াটাই যেখানে গর্বের বিষয়।

বাংলায় তখন লীগের মিনিস্ট্রি। রাজা ইংরেজ হলেও, তার উজীর হল মুসলমান। এটাও কম কথা নয়। কোথাও খেলায় মুসলমানরা জিতলে, কোনো মুসলমান ছাত্র বিলেতে গেছে শুনলে খুব ভাল লাগত। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার আগের দিন পাড়ার লোকে নমাজ পড়ত, রোজা রাখত।

ছোট থেকে শুনে এসেছি যে, হিন্দুরা মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের উঠতে হবে। এই ভাবটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। বা-জানও চাইত মুসলমানরা উঠুক, কিন্তু হিন্দুদের ধ'রে। সেটা আবার পাড়ার লোকে পছন্দ করত না।

আস্তে আস্তে জানতে পারলাম জিন্না সায়েব আমাদের নেতা, মানে মুসলমানদের নেতা। জিন্না সায়েব চোদ্দ দফা দাবি রেখেছেন। সে দাবি না মানলে তুলকালাম কাণ্ড ক'রে ছাড়বেন। এইসব শুনে মনে খুব জোর পেতাম।

যখন কারখানায় কাজ করছি তখনও হিন্দু মজুর-মিস্ত্রিদের সঙ্গে লীগের হয়ে তর্ক করতাম। হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত দোষ অবিচার আর ইসলাম ধর্মের কী গুণ, এইসব জোর গলায় বলতাম। আক্রমণের সুরে বললেও আসলে আমি আত্মরক্ষা করতে চাইতাম। একদিকে যেমন তর্ক করছি, অন্যদিকে একসঙ্গে কাজ করার ভেতর দিয়ে ভাবভালবাসাও গড়ে উঠছে। একদিকে মুসলমানদের হয়ে কারখানায় তর্ক করছি, অন্যদিকে পাড়ায় করছি লীগের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তর্ক।

এইভাবে তর্ক করতে করতে দেখলাম দুদিকেই অনেক কিছু বলবার

আছে। আস্তে আস্তে আমার মধ্যে বিবেচনাবোধ এল। নিজের গণ্ডীটুকু ছাড়িয়ে দেখতে শিখলাম।

শিবপুরে সে সময়ে লড়াইয়ের কাজের জন্যে মিস্ত্রি কারিগরের ট্রেনিং হত। পূর্ববাংলার ম্যাট্রিকপাস একটি ছেলে সেখানে ঢুকেছিল। তার নাম আলী। আমাদের ওদিকে ওর এক আত্মীয় বাড়িতে এসে উঠেছিল। পাস ক'রে যখন ফিল্ডে যাওয়ার সওয়াল এল তখন না গিয়ে গেস্টকীনে মিলিং মেশিনে কাজ নিল আর পাড়ায় ছেলে পড়াতে লাগল।

গেস্টকীনে প্রথম ইউনিয়ন গড়েছিল আর-এস-পি। লড়াই লাগার পর সে ইউনিয়নের মরণদশা হয়। আলীর সঙ্গে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক। আলী কাঁধ লাগিয়ে গেস্টকীনের ইউনিয়ন আবার ঠেলে তুলল। তারপর ওরা চেষ্টা করল আশপাশের আর সব কারখানা-গুলোতেও ইউনিয়ন ক'রে দলের প্রভাব বাড়াতে। আলীর সঙ্গে ছিল ওর শিবপুরের আরেকজন ট্রেনী বন্ধু। সালে।

আলী আমাকে পাড়ার নানা সূত্রে জানত। ও চেষ্টা করল আমাকে ওদের দলে পেতে। আমার সঙ্গে দহরম-মহরম করার জন্যে আলী আমাদের ক্লাবে আসতে আরম্ভ ক'রে দিল। এটা সেটা বলত, আমি হুঁ-হাঁ ক'রে যেতাম। ওর কথাগুলো এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত।

আলী আমাকে একদিন একটা বই পড়তে দিল। তার নাম 'সাম্যবাদের ভূমিকা'। পড়ব ব'লে নিয়ে রেখে দিলাম। পড়া আর হয়ে উঠল না।

কিন্তু আলীর একটা গুণ ছিল। যখন লীগের কথা, জিন্নার কথা বলত—আমার কারখানার হিন্দু বন্ধুদের মতো বিচ্ছিরিভাবে গালাগাল দিয়ে বলত না। তার ফলে, শুনতে ভাল লাগত। কিন্তু ও যে আমাকে টানতে পারে নি, তার কারণ ঐ যাত্রা।

আলী আমাকে দু' তিনবার ওদের ইউনিয়ন আপিসেও নিয়ে গেছে।

সেখানে সালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। বেঁটেখাটো, চোখে চশমা, রাশভারী গলা। ওর কথাও আমার শুনতে ভাল লাগত।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রাস্তাঘাটে দেখা হলে সমীহ ক'রে সেলাম করতাম তার বেশি নয়।

আমার কথা

বাদ্‌শা আজ একটা খবর দিল। সরকার পক্ষ নাকি আমাদের জেল কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছে। কিন্তু ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এবারের লড়াই শুধু একটা জেলের লড়াই নয়। কাজেই আলোচনাটা হতে হবে সব জেল মিলিয়ে। সবাই একমত হলে তবেই হাঙ্গার-স্ট্রাইক মিটবে। বাদ্‌শা বলল, ওরা আর এ হাঙ্গার-স্ট্রাইক টানতে পারছে না—ওদের অনেকেরই পকেটে টান পড়ছে যে। হঠাৎ আমার মনে হল, নিজের মনে এই রকমটাই আমি ভাবছিলাম। তার মানে, রাজনীতিতে একটু একটু ক'রে আমার মাথা খুলছে। সে সব কিছু না ব'লে বাদ্‌শার কথার পিঠে আমি বলেছিলাম, 'পকেটে না পেটে?' বাদ্‌শা খুব হাসল।

কিন্তু বাদ্‌শা চলে যাবার পর আমার মনে হল, এটা কিন্তু আমাদের হুঁশিয়ার হওয়ারও সময়। হাঙ্গার-স্ট্রাইকে ছেদ পড়ার আগে ওরা চেষ্টা করবে যতটা পারে আমাদের শক্তি খর্ব ক'রে দিতে। তার মানে, খুঁচিয়ে আশা জাগিয়ে তারপর আবার সেই আশায় ছাই দিয়ে ওরা চেষ্টা করবে আমাদের মনোবল ভাঙতে—তাহলে দরাদরিতে ওদের সুবিধে হবে।

এভাবে ভাবতে পেরে আবার আমার মনে মনে বেশ গর্ব হল। তার মানে, রাজনীতিতে এবার আমি সাবালক হচ্ছি। সেটা জানাবার জন্যে নিচে বংশীর ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি ওর ঘরে জামাল সায়েব। ভাবলাম নিশ্চয় এমন কিছু আলোচনা হচ্ছে, যা আমার শোনা উচিত নয়।

ঘরে না ঢুকে আমি চলে আসছিলাম। বংশী ডাকল।

'কী ব্যাপার? চলে যাচ্ছিলে কেন? ব'সো। আমরা এমনি গল্প করছিলাম।'

ভেতরে আসতে বলায় মনে মনে খুশি হলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষুন্নও হলাম এরকম একটা জরুরী পরিস্থিতিতে জেল কমিটির দুজন অগ্রগণ্য নেতা ব'সে ব'সে গল্প করছে ব'লে। বংশী একা থাকলে সে কথা ওর মুখের ওপরই বলতাম। কিন্তু জামাল সাহেবের সামনে আমার বলতে সাহস হয় না।

হঠাৎ কোনো কথা নেই বার্তা নেই, জামাল সায়েব জিগ্যেস করলেন, 'আপনার দাদু তো, মানে ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি করতেন। না?' জামাল সায়েব সব খবর রাখেন দেখছি? 'আপনার ছোট মামা, মানে, বিলেতেই থেকে গেলেন নাকি?'

বুঝলাম এঁদের কাছে এখন হুঁশিয়ারির কথাটা আমার বলা মানে বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো। পার্টির এত বড় একটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যেখানে, সেখানে দুজন নেতা ব'সে কিনা গালগল্প করছেন? এই জন্যেই তো আজও আমরা এদেশে ক্ষমতা দখল করতে পারলাম না। ইত্যাদি ইত্যাদি একসঙ্গে অনেক কথা মনের মধ্যে ঠেলে এল।

এতদিন পর মনের মধ্যে একটা অসম্ভব জোর পাচ্ছি। এখন যদি আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে বলা হয়, আমার প্রথম কথাই হবে— 'কমরেড, যদি মাথা নিচু ক'রে বাঁচতে হয়, তার চেয়ে আসুন আমরা মাথা উঁচু ক'রে বীরের মৃত্যু বরণ করি।'

ঘরে ফিরে একটু নুন আর ঢক্ ঢক্ ক'রে একসঙ্গে দু গেলাস জল খেলাম।

গৌরহরি আমার সেলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল। তারপর একগাল হেসে বলল, 'ভোঁ বেজে গেছে, কমরেড।'

আমি বললাম, 'আসছি। এখুনি আসছি।'

তারপর চট ক'রে আরেকবার পকেট বইটা খুলে সকালে পড়া ১৩২ পৃষ্ঠার শেষ দিকের প্রশ্নোত্তরের অংশটা পড়ে নিলাম :

'কোনো প্রাণী কি বছরের পর বছর না খেয়ে থাকতে পারে?

পারে। মাকড়সার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক রকমের খুব ক্ষুদে প্রাণী আছে, তারা বছরের পর বছর না খেয়ে থাকতে পারে। লোকে এদের অনেক সময় বলে 'জলভল্লুক'। এদের আসল নাম টার্ডিগ্রাডা।

এদের স্বভাব স্যাঁৎসেঁতে জলো আবহাওয়ায় থাকা। কিন্তু কোনো কারণে যদি আবহাওয়া বদলে শুকনো খটখটে হয়, তাহলে এরাও একেবারে শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে এদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর শরীর পাকিয়ে গিয়ে শুঁটকো বীচির মতো দশা হয়। এই অবস্থায় তারা বছরের পর বছর থাকবে। বাইরে থেকে দেখে সবাই ভাববে মরে গেছে। কিন্তু একবার জল পাক, অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠবে। গায়ের মধ্যে কোথাও আর কোঁচকানো ভাব থাকবে না। পাগুলো টান টান হবে। তারপর আস্তে আস্তে ওরা চলতে আরম্ভ করবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা হয়ে যাবে আবার যে-কে সেই। কাজকর্ম, হাঁটাহাঁটি—সব ঠিক সেই আগের মতো।'

এটা আমি বলব 'কারখানা' ছুটি হওয়ার ঠিক আগে। বলব, 'কমরেড, অনেক তো খাওয়ার গল্প শুনলেন। এবার শুনুন একটা না খাওয়ার গল্প।' এমনিভাবে এবার তলা থেকে উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে—নেতাদের মুখ চেয়ে ব'সে থাকলে চলবে না।

বাঙলার কথা | সোমবার

আমি যাই বলি না কেন, যাই করি না কেন—লেখাপড়া করতে না পারার দুঃখটা মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সেই দুঃখটা খোঁচাত।

কিন্তু এও বলব, কাজেরও একটা নেশা আছে। কাজ ক'রে

রোজগার হচ্ছে, পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি, শুধু সেটা নয়। এক তো, আমি ব'সে নেই, একটা কিছুতে লেগে আছি। তাছাড়া এটা মনে হওয়া যে, এ সংসারে আমাকে দরকার আছে। কেউ যখন বলত, আমাকে ছাড়া অমুক কাজটা চলবে না—মনে মনে খুব গর্ব হত। তা তো হবেই। না কী বলেন?

একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে, আপনাকে বলি।

এই জেলখানায় এসে আমরা যে ভাই-ভাই, কমরেড-কমরেড বলি —এটা সত্যিই খুব ভাল লাগে। তাছাড়া দেখুন, আপনারা তো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, অনেক কিছু পাস করেছেন, বাড়ির অবস্থা ভাল—জেলে না এলে আপনাদের এত কাছে পাওয়া কি সম্ভব হত? এটা ভেবে ভাল লাগে যে, আপনারাও চাষী মজুরদের সঙ্গে আছেন। আমরা একসঙ্গে এক আদর্শের জন্যে লড়ছি।

কিন্তু সত্যিই কি, ইচ্ছে থাকলেও, আলাদা আলাদাভাবে জীবন কাটিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় এসে প'ড়ে সে রকম ভাই-ভাই ভাব আনা যায়? এই হাঙ্গার-স্ট্রাইক, কিংবা শত্রুর সঙ্গে যেখানে সামনা সামনি লড়াই হচ্ছে—তখনকার কথা আলাদা। তখন আমরা বাঁচব ব'লে কিংবা মারব ব'লে একজন আরেকজনকে কোনো না কোনোভাবে ধ'রে আছি। এ ওর সঙ্গে এমনভাবে থাকছি যাতে প্রত্যেকের জোরটা সকলের হয়। একজন একটু ভুল করলে, তার ধাক্কা সবাইকে সামলাতে হবে। একজন ঠিক করলে তাতে সকলেরই লাভ হবে।

তবে ঐ যে বললাম, সেটা একটা অল্প সময়ের ব্যাপার। আরেকটা কথা, কমরেড, কিছু যদি মনে না করেন—বলব?

একসঙ্গে লড়ছি বটে, কিন্তু সবাই সমানভাবে লড়তে পারবে—তা তো ঠিক নয়। কত লোকের কত রকমের পিছুটান। কারো কম কারো বেশি। যেমন ধরুন, আপনি যে এতদিন টিঁকতে পারবেন আমি ভাবি নি। আমি মাঝে মাঝে দেখেছি আপনি কি রকম যেন মুষড়ে পড়েছেন। আমি আপনাকে খরচের খাতায় ধ'রে রেখেছিলাম। কিন্তু

তার মানে এ নয় যে, আপনার ওপর আমার কোনো অশ্রদ্ধা আছে। সেটা যেন মোটেই ভাববেন না।

এ কী! আমার কথাগুলো আপনি লিখছেন? না, না।

আমি তাহলে আরম্ভ করছি। না কী বলেন?

কাল কোন্ পর্যন্ত যেন বলেছিলাম? তখনও আমি যাত্রা নিয়ে মেতে আছি। আলী, সালে—এরা সব আমাকে টানবার চেষ্টা করছে আর আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলছি।

তখনও যুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ রকম ঝড় বয়ে গেল—না আমি মেদিনীপুরের সাইক্লোনের কথা বলছি না—আমি বলছি পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। আমরা কিন্তু সে সব খুব যে দেখেছি তা নয়। তার চেয়েও বেশি ক'রে ছাপ ফেলেছিল লড়াইয়ের ব্যাপারটা। তার কারণ তো বুঝতেই পারছেন—জাহাজের সঙ্গে, বন্দরের সঙ্গে, লড়াইয়ের সাজসরঞ্জামের সঙ্গে আমাদের যোগ ছিল বেশি। আমরা বলি বটে গ্রামে থাকি, আসলে তো গ্রাম নয়। সবাই করে চাকরি আর ব্যবসা। চাষবাস তো নেই।

চাষীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। কাজেই দুর্ভিক্ষের চোট যেখানে বেশিরকম পড়েছিল, সেটা ছিল আমাদের চোখের আড়ালে।

বরং পাড়ার জাহাজীরা এসে আমাদের বলত কোথায় কি রকম লড়াই হচ্ছে তার গল্প। সে সব গল্প শুনতে শুনতে আমাদের গায়ে কাঁটা দিত।

আপনার নিশ্চয় মনে আছে, খিদিরপুরে বোমা পড়ার কথা? আমরা তখন কারখানায়। ওঃ, বোমা ফাটার সে কী আওয়াজ! আমরা তো ভাবলাম এবার গেলাম।

পরদিন দেখতে গেলাম খিদিরপুরে। কাগজে তো কিছুই দেয় নি। লোক মরেছিল অগুন্তি। পরে খোঁজ নিতে নিতে জানলাম তার মধ্যে আমাদের চেনাপরিচিত লোকও দু চারজন ছিল।

লড়াই তো চলছে। কারখানায় কাজও হচ্ছে খুব জোর। হঠাৎ

লড়াই শেষ। রাস্তায় রাস্তায় আলোবাতির ঘোমটাগুলো খুলে ফেলা হতে লাগল। কারখানায় ওড়ানো হল মিত্রবাহিনীর চার ঝাণ্ডা।

এই সময় আমি একটু অসুখে পড়ে গেলাম। তার ফলে, ক'দিন বাড়িতে আটকা পড়ে থাকতে হল। একদিক থেকে ভালই লাগছিল। একটানা কাজের পর বেশ একটু ছুটির আরাম। সে তো আর রোগ-ব্যামো না হলে পাওয়া যায় না।

অসুখ বলতে একটু বেশিরকম সর্দিজ্বর। সব সময় শয্যাশায়ী থাকার মতো কিছু নয়। কাজেই একটু-আধটু ওঠা-হাঁটা, গল্প-গুজব করা—সমস্তই করতে পারছি।

আমাদের বাড়িতে ছিল আগুন নেবানোর আপিস। পাড়ার ছোঁড়াগুলো সেখানে এসে ভিড় করে। জমিয়ে আড্ডা হয়।

এতদিন পর দেখে একটু অবাক লাগে, সেই যাদের ন্যাংটো পোঁদে ঘুরতে দেখেছি, তাদের গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেছে। সিগারেট ফুঁকছে, পাড়ার লোকের তারাই নির্ভর। হঠাৎ মনে হল, আমি এখন বড়দের দলে পড়ে গিয়েছি। আমার বয়স হয়েছে।

তাছাড়া পাড়ায় আজকাল কতক্ষণই বা থাকি। যে মৈজুদ্দি জাহুর দলিজে গিয়ে না বসতে পারলে আমার ভাত হজম হত না, সেই মৈজুদ্দি জাহুর সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না।

আমাদের বাড়িটাও কি রকম বদলে গেছে। ছিল মাটির ঘর। গোলপাতা গিয়ে হল টিনের ছাউনি। তারপর পাকাবাড়ি। যখন জোর বৃষ্টি হত টিনের ছাদে ঝমঝম ক'রে শব্দ হত। আর যখন শিল পড়ত? আমি আর বড় বুবু দাওয়া থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে শিল কুড়োতাম। মাও দেখতাম সেই সময় ছোট হয়ে যেত। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিল কুড়ুত।

তারপর আমি আর বড় বুবু ছুটতাম বাগানে। হাতে লম্ফ নিয়ে বাগানে গিয়ে গাছতলায় খুঁজতাম শিলে-পড়া আম।

আমরা দাঁত মাজতাম ছাই দিয়ে। এখন ছোটদের জন্যে হয়েছে

মাজন-গুঁড়ো। আমরা বড়রা শিখেছি বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে। ছেলে-ছোকরার দল এখন আর বিড়ি খায় না। ভদ্রলোকদের দেখাদেখি সিগারেট খায়। পাড়ার বাইরে যাবার সময় লুঙ্গি ছেড়ে প্যাণ্ট শার্ট পরে। জড়সড় জবুথবু ভাব কারো মধ্যে নেই। চলাবলায় বেশ একটা দুরন্ত ভাব এসেছে।

মাঝে মাঝে, জানেন, অসুখ হওয়া ভাল। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। কিভাবে কোথায় এলাম, কিভাবে কোথায় যাব—এই সব মনের মধ্যে একটা তোলপাড় হয়।

এই ধরুন, হাঙ্গার-স্ট্রাইক। এটাও অনেকটা অসুখেরই মতো। না কী বলেন? অসুখে যেমন শুয়ে থাকা ছাড়া করবার কিছু থাকে না। এও অনেকটা তাই।

সেই জন্যেই আপনি যখন বললেন যে আমার জীবনের গল্প শুনবেন, আমার তখন একদিকে লজ্জা হচ্ছিল, অন্যদিকে লোভ হচ্ছিল। কেন লজ্জা হচ্ছিল বুঝতেই পারেন। আমি একজন লোহা-কাটা মজুর, আমার আর কী এমন কথা থাকতে পারে যে লোক ডেকে বলা যায়। তাও যদি আমি জাহাজী হতাম। জাহাজীদের বলবার মতো অনেক গল্প থাকে। কিন্তু তা নয়। আমার লোভ হল, বলতে গিয়ে পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে পাওয়া যাবে। আসলে আমি সে সব কথা আপনাকে বলি নি। আপনাকে সামনে আয়নার মতো বসিয়ে নিজেকে নিজে বলেছি।

থাক গে যাক। এইবার সেই পুরনো কথায় আসি।

অসুখ হয়ে বাড়িতে তো ব'সে আছি। হঠাৎ আমার ডিপার্টের বয় দত্ত এসে খবর দিল কারখানায় স্টে-ইন স্ট্রাইক হয়েছে। সায়েবরা ঘেরাও হয়ে আছে। দাবি জানানো হয়েছে যে, লড়াই যখন জিতেছ তখন আমাদের লড়াই জেতার বোনাস দাও। সায়েবদের টিফিনগুলো গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওদের জল পর্যন্ত খেতে দেওয়া হয় নি। আমি শুধু শুনে গেলাম। ও নিয়ে কোনোরকম মাথা ঘামালাম না।

পরদিন শুনলাম কারখানা আবার চালু হয়েছে।

আমার শরীর ভাল ছিল না ব'লে সেদিনও কাজে যাই নি। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম আলী, সালে আর সেইসঙ্গে আরও কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে হাজির। ওরা বলল, আপনাদের ওখানে অত জুলুমটুলুম চলছে, কিছু করা দরকার। আপনারা একটা ইউনিয়ন করুন।

ওরা চ'লে যেতে মৈজুদ্দি জাদুর কাছে গেলাম। দেখলাম মৈজুদ্দি জাদুর পায়ের সেই ব্যথাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মৈজুদ্দি জাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কারখানার সব বৃত্তান্ত বললাম।

সব শুনে মৈজুদ্দি জাদু বলল, 'বাবা বুলু, হজরত মহম্মদের জীবনের একটা গল্প বলি। মিসকিনদের মধ্যে গুলিবাঁট করার জন্যে টাকা তোলা হয়েছে। সেই টাকা আনার জন্যে মহম্মদ চাইলেন মুয়াজকে ইয়ামনে পাঠাতে। টাকা আনার পর বেঁটে দেবার আগে মহম্মদ বললেন, 'ও মুয়াজ, তুমি কোন্ ব্যবস্থামত কাজ করবে?' মুয়াজ বলল, 'কোরানের ব্যবস্থামত।' 'কিন্তু যদি কোরানের মধ্যে কোনো তরীক না পাও?' 'তাহলে পয়গম্বরের সুন্না মেনে চলব'। 'কিন্তু তার মধ্যেও যদি না পাও?' তার উত্তরে মুয়াজ বলল, 'তাহলে নিজের বিচার-বুদ্ধিমত চলব।' এরপর মহম্মদ খুশি হয়ে হাত তুলে বললেন, 'আল্লার কী গুণ যে, তাঁর পয়গম্বরের পাঠানো দূতকে তার নিজের বিবেচনামত তিনি চলতে দেন'।'

পরদিন কারখানায় গিয়ে ব'লে দিলাম আমাদের ইউনিয়ন হবে।

আমার কথা

ছেলেবেলায় দাদুর মুখে শোনা ত্রিশঙ্কুর গল্প মনে পড়ল।

জিতেন্দ্রিয় এবং সত্যবাদী রাজা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে যাবার সাধ হয়েছে। তার জন্যে একটা যাগযজ্ঞ করা দরকার। বশিষ্ঠ মুনি তাঁদের কুলপুরোহিত। ত্রিশঙ্কু গিয়ে তাঁকে ধরলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে এক কথায়

অসম্ভব ব'লে হাঁকিয়ে দিলেন। দক্ষিণদিকে বশিষ্ঠের শতপুত্র ব'সে তপস্যা করছিলেন। ত্রিশঙ্কু গিয়ে ধরলেন তাঁর সেই গুরুপুত্রদের। তাঁরা যখন শুনলেন ত্রিশঙ্কু ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে এসেছেন, তখন তাঁকে তাঁরা প্রথমে ভাল কথায় বোঝাবার চেষ্টা করলেন। যখন তাতে কোনো কাজ হল না, তখন তাঁরা 'তুই চণ্ডাল হ' ব'লে শাপ দিলেন।

ত্রিশঙ্কুর বিকট চেহারা হল। হাকুচ নীল গায়ের রং, জামাকাপড়ের রংও নীল। মাথায় শুয়োরের কুঁচির মতো ছোট ছোট রুক্ষ চুল। গলায় হাড়ের মালা, সারা অঙ্গে চিতার ছাই। হাতে বালা, কানে কুণ্ডল—সমস্তই লোহার। ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হয়ে যেতে দেখে পাত্রমিত্র পুরবাসী যে যেখানে ছিল সবাই তাঁকে ছেড়ে গেল। ত্রিশঙ্কু তখন গেলেন বিশ্বামিত্রের কাছে।

গিয়ে বললেন, 'মুনিবর, যাগযজ্ঞ আমি কম করি নি। জীবনে মিথ্যে বলি নি, কখনও বলবও না। কিন্তু আমার গুরু আর গুরুপুত্রেরা আমার ওপর নারাজ। এখন দেখছি দৈবই সব, পুরুষকারের কোনো স্থান নেই। একমাত্র আপনিই পারেন পুরুষকার দিয়ে দৈবকে ঠেকাতে।'

ত্রিশঙ্কুর মতো ভাল লোকের চেহারার এই রকম হাল হয়েছে দেখে বিশ্বামিত্র মনে খুব দুঃখ পেলেন। তাঁর দয়া হল। বললেন, 'ঠিক আছে আমি তোমার যজ্ঞ ক'রে দেব। তুমি এই চেহারা নিয়েই সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবে।'

যজ্ঞের ব্যবস্থা হতে লাগল। চারদিকে মুনি ঋষিদের কাছে খবর পাঠানো হল সবাই যাতে আসে। কিন্তু মহোদয় মুনি আর বশিষ্ঠ পুত্রেরা ব'লে পাঠাল যে, চণ্ডালের যজ্ঞে এলে যে পাপ হবে তাতে তারা স্বর্গে যেতে পারবে না। বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে শাপ দিলেন, বশিষ্ঠের বেটারা যমের বাড়ি যাবে। ডোম হয়ে জন্মাবে। মুরগির মাংস খাবে আর ইল্লত হয়েথেকে শবদেহের কাপড় কুড়িয়ে বেড়াবে। আর মহোদয় মুনি ব্যাধ হয়ে জানোয়ার মেরে বেড়াবে।

এদিকে যজ্ঞ হচ্ছে, কিন্তু অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও দেবতারা যজ্ঞ-ভাগ নিতে আসছেন না। তখন বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে কোষা তুলে বললেন, 'তাহলে দেখ, এই আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাচ্ছি।' বলতে বলতেই ত্রিশঙ্কু চড়চড় ক'রে স্বর্গে উঠে গেলেন। হাঁ হাঁ ক'রে ইন্দ্র ছুটে এসে বললেন, 'নামো, নামো। তুমি স্বর্গে থাকার যোগ্য নও।' ইন্দ্রের কথায় বিশ্বামিত্রকে ডেকে 'বাঁচান, বাঁচান' বলতে বলতে ত্রিশঙ্কু হেঁটমুণ্ডি হয়ে নিচে নামতে লাগলেন। ত্রিশঙ্কুর করুণ অবস্থা দেখে বিশ্বামিত্রের খুব রাগ হল। হাঁক দিয়ে বললেন, 'থাকো, থেকে যাও'—ব'লে ত্রিশঙ্কুকে শূন্যে ঠেকিয়ে রেখে নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে একদিকে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করলেন, অন্যদিকে নতুন নতুন দেবতা বানাবার উপক্রম করলেন।

শেষকালে মুশকিল দেখে দেবতারা একটা রফা ক'রে নতুন দেবলোক সৃষ্টি থেকে রাগী বিশ্বামিত্রকে নিবৃত্ত করলেন।

দাদুর কাছ থেকে এই গল্প শুনে আমার মনে হত যে, বেশি লোভ করা ভাল নয়।

বাদশা আমাকে খরচের খাতায় রেখে দিয়েছিল। শুনে মন খারাপ হল। কিন্তু কী করা যাবে? দুনিয়ায় সব কিছু মানুষের হাতে নয়। সবচেয়ে বড় কথা, জীবনের ওপর যদিও অনেকখানি দখল থাকে, নিজের জন্মের ব্যাপারটা একেবারেই মানুষের হাতের বাইরে।

কিন্তু কেন, আমি তার জন্যে লজ্জা পাব? আমার বাবা রেলের গার্ড আর দাদু যদি আয়কর আপিসের কেরানি না হয়ে একজন জমিদার আর একজন মিলমালিক হত, তাহলে কি আমার শুদ্ধির একমাত্র পথ হত আত্মহত্যা?

আমি মনে করি না। এঙ্গেল্‌স্‌ ছিলেন রীতিমতো বড়লোকের ছেলে। লেনিনের জন্ম মধ্যবিত্তের ঘরে।

মন জিনিসটা অনেক 'না' কে 'হ্যাঁ' করতে পারে, অনেক 'হ্যাঁ'কে 'না' করতে পারে। তাছাড়া অর্থনৈতিক যে টান, নানা দিক থেকে

তারও নানা রকমের কাটান আছে। গোটা শ্রেণীর ভেতর দিয়ে না হলেও দলছুট ব্যক্তির ভেতর দিয়ে তা ফুটে উঠতে পারে।

আরও একটা কথা। বাদ্‌শা এমনভাবে বলল যেন আমাকে ওর দেখা হয়ে গেছে। আমি বলব এখনও দেখতে বাকি আছে। হাঙ্গার-স্ট্রাইক শেষ হোক। তারপরে দেখাদেখির কথা উঠবে।

নাকি একটা মিটমাট হয়ে যাচ্ছে ব'লে ওর কাছে কোনো খবর আছে?

অনেকদিন পর আজ আবার কিন্তু ক্ষিধে পাচ্ছে। আজ সকালে ফোর্সফিডিং ক'রে যখন চলে গেল তখন মনে হচ্ছিল আরেকটু হলে ভাল হত। বেশি নয়, আর এক কাপ।

বাদ্‌শার ওপর থেকে থেকে আমার রাগ হচ্ছে। 'খরচের খাতায় ধরেছিলাম' বলার মধ্যে একটা হামবড়াই ভাব আছে। মজুরের ঘরে জন্মেছে ব'লে ডাঁট দেখাচ্ছে। বিপ্লব কারো বাপের সম্পত্তি নয়।

কিন্তু এটা কি আমার শুধু শুধু রাগ করা হচ্ছে না? আমাকে ও অশ্রদ্ধা করে না। আমাদের মুশকিলটা ও বোঝে। আমি যে এতদিন চালাতে পেরেছি ও তাতে খুশি। এটা এই ভেবেই বলেছে যে, ওর আশা হচ্ছে আমি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারব।

বাদ্‌শা যদি ওর মতো ক'রে তাই ভেবে থাকে তো ভাবুক।

এখন আমি অন্য কথা ভাবছি। সকলের জীবন এক ছাঁচে ঢালা হবে, তার কোনো মানে নেই। লড়াই সবাইকে করতে হবে তার কোনো মানে নেই। লড়াই ছাড়াও আমার জীবনের অন্য কোনো সার্থকতা থাকতে পারে। কেন আমি বিশ্ব সংসারকে তা থেকে বঞ্চিত করব? কমরেডদের কাছে নিজের মুখ রক্ষার জন্যে? লোকের কাছে বীর কিংবা শহীদ নাম কেনবার জন্যে?

মরব ব'লে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আজ না হোক কাল আকস্মিক-ভাবে মরে যেতেও তো পারি। তার মানে, জীবন কী দেখবার আগেই জীবনটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। পরজন্মে বিশ্বাস করলে তবু একটা

আশা নিয়ে মরা যেত। এমন কিছু রেখে যাব না, যাকে দেখে আমার কথা লোকে মনে করতে পারে। একটা ছেলে নয়, মেয়ে নয়—একটা বানানো উপন্যাস পর্যন্ত নয়।

দাদু, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার বাবাকে তোমরা ভালবাস না। আম্মা, তুমি যাও। আমি মরে যাব। আমি কিছুতেই খাব না, কিচ্ছু খাব না। আমি মরে যেতে চাই।

মঙ্গলবার

আজ সকালে বাদশা সেলের সামনে এসে মুখ বাড়িয়ে একটু হেসে ব'লে গেল, কমরেড, একটু ঘাবলা আছে। সকালে হবে না।'

কাল রাত্তিরেই আমার রাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রাগ হওয়া আর তারপর আবোল-তাবোল ভাবা, এটা আমার ভাল লক্ষণ নয়।

অনেকদিন পর দক্ষিণ দেশের খবরে মনটা আজ খুব চাঙ্গা লাগছে।

আড়াই হাজার গ্রাম জমিদার জায়গীরদারদের কবলমুক্ত। আড়াই হাজার গ্রাম মানে সে তো এক বিরাট ভূখণ্ড। চোখ বুঁজে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি গাছের মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় পত্‌ পত্‌ ক'রে উড়ছে লাল নিশান।

সংখ্যাটা দিয়ে আমি ঠিক থই পাচ্ছি না। কমরেড চৌধুরী আমাদের শেখাতেন—আয়তন পরিমাণ, দূরত্ব, ওজন এসবই হল মাপ। মাপ জিনিসটা চোখের কাছে ধ'রে না দিলে, তার একটা ছবি ফোটাতে না পারলে পাঠকের মনে দাগ কাটে না। যেমন, কেউ যদি বলে পনেরো ফুট গভীর জল—তাহলে সাধারণ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে, মনে দাগ কাটবে না। কিন্তু তুমি যদি বলো, তিন মানুষ গভীর—তাহলে গভীরতাটা একটা আকার পেয়ে পাঠকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসবে। আমাদের কাছে বললে ভাল হত যে, আমাদের গোটা বর্ধমান জেলায় যত প্রায় ততগুলো গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছে দক্ষিণের এই মুক্ত এলাকা।

এটা আরও এইজন্যে দরকার যে, তাতে আমাদের ভাবনাগুলো পায়ের নিচে জমি পেয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেননা হাজার বা লক্ষ—এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট ব্যাপার নয়।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বর্ধমানের তুলনা দিলে অনেক কমরেডের আপত্তি হবে। তাঁরা মনে করবেন, কমিয়ে বলা হচ্ছে। সব সময় বাড়িয়ে ভাবতে না পারলে অনেকে দমে যান।

ময়দানের মিটিঙের লোকসংখ্যা নিয়ে আমাদের কাগজের আপিসে একেকবার দস্তুর মতো হট্টগোল বেধে যেত। এক লক্ষ বলতে না পারলে অনেকেই মনে শান্তি পেতেন না। অথচ খুঁটিয়ে আন্দাজ নিলে পনেরো কিংবা তিরিশের ওপর ওঠা শক্ত হত। শেষ পর্যন্ত হয়ত রফা হত পঞ্চাশে।

এটা যে বদ্‌অভ্যেস সেটা মানা দরকার। সংখ্যার কমবেশি দিয়ে সব সময় গুরুত্বের যাচাই করা যায় না।

যেমন আমি ঐ আড়াই হাজারের ব্যাপারটা ঠিক এই মুহূর্তে অন্যভাবে ভাববার চেষ্টা করছি। একবার আমি কাগজের রিপোর্ট করতে ত্রিপুরার পাহাড় এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম। তখন ছিল নভেম্বরের ঠাণ্ডা। সকালে রওনা হয়ে দুপুরে মাঝপথে কোনো গ্রামে খেয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত হেঁটেছি। এইভাবে সাত দিনে হেঁটেছিলাম এক শো মাইল রাস্তা। ক'টা গ্রাম পেরোতে পেরেছিলাম? খুব বেশি ষাট কি সত্তর। তার মানে, আড়াই হাজার হতে গেলে হতে হবে তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ গুণ।

তাছাড়া এখানে আয়তন বা সংখ্যার হিসেবটাও বড় নয়। তার চেয়েও বড় হল ভূমি সম্পর্কে ওলটপালট ঘটানো বিপ্লব। অনেকের ঐকতানে মূলগায়েন আমাদের পার্টি।

ন' নম্বরের ছাদে একটা নীল রঙের টিয়াপাখি না? খাঁচায় বন্দী মানুষদের দেখে নির্ভয়ে খানিকক্ষণ ব'সে তারপর উড়ে চলে গেল।

সকালে ডান চোখ নাচছিল। আর এখন এই টিয়াপাখি। আচ্ছা,

টিয়াপাখিও কি সুলক্ষণ? আম্মা বলত, যদি ডানদিক দিয়ে মড়া যায় তাহলে ভাল!

আমি যখন ইস্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি তখন পরীক্ষা দিতে যাবার আগে একবার আম্মার মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় উনি এমন একটা কথা বলেছিলেন যে, শুনে আমার কান নাক লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ফিরে এসে আম্মাকে বলেছিলাম—তোমার মা ভাল নয়। কেন নয়, আম্মা সেটা একবারের বেশি জানতে চায় নি। আমিও আম্মাকে বলতে পারি নি। আম্মার মা বলেছিল রাস্তায় কোনো বেবুশ্যে মেয়ে দেখলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি—তাহলে পরীক্ষা ভাল হবে। বেশ্যা কী, তখনও স্পষ্টভাবে জানি না। তবু তাকে খুব খারাপ কিছু কল্পনা ক'রে, তার পায়ে হাত দেবার কথা বলায়, গা ঘিন্‌ঘিন্ করেছিল।

প্রথম বেশ্যাপাড়া দেখার কথা এখনও আমার মনে আছে। বেশ্যাপাড়ায় নয়, বেশ্যাপাড়ার ভেতর দিয়ে শর্টকাট ক'রে তেওয়ারী একবার আমাকে নিয়ে যায় ডকমজুরদের এক বস্তিতে। প্রথমে তো জানতাম না, এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখি ঠোঁটে গালে রং মেখে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল। কেউ যদি হাত ধ'রে টান দেয়? তারপরই মনে হল, চেনা কেউ যদি দেখে ফেলে? আবার কৌতূহলও খুব। ঘাড় সিধে ক'রে আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছি। দূরে যাওয়ার সঙ্গে মেশানো একটা কাছে যাওয়ার টান।

শর্টকাট করার ছুতোয় ও-রাস্তায় আরও কয়েকবার হেঁটেছি। তারপর আস্তে আস্তে কৌতূহলের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে।

জগতে রোগব্যাধি জরা আর মৃত্যু দেখে 'সারথি, রথ ঘোরাও' ব'লে পিছিয়ে যাওয়া সেটা নয়। আসলে আমি বেঁচে গিয়েছি সংযমের জোরে নয়, কপালগুণে তেমন দুর্জয় কোনো লোভের সামনে না প'ড়ে।

পদ্মখণ্ডবনের বরাঙ্গনাদের পাল্লায় পড়লে আমি যে মৃত্যু জয় করতে তপস্যায় বসতাম, কখনই তা নয়। বরং রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সেই খোঁটা

—'মৃত্যু হবেই, এটা জেনেও যে এ পৃথিবীতে সুখ চায় তার হুঁশবোধ নিশ্চয় লোহার মতো ; সে এই মহাভয়েও না কেঁদে হেসেখেলে বেড়ায়' —আমি তা শিরোধার্য করতে রাজী।

কিন্তু বালাই ষাট। মরবার কথা কেন ভাবব?

উমা কি মরবার কথা ভাবে? শ্মশানের ছাই থেকে জীবনের অবিনাশী বীজ কুড়িয়ে নেওয়া পূর্ব ইউরোপে ব'সে? আমার বিশ্বাস হয় না।

আজ দুপুরে বাদ্‌শা এল না। কথার কি শেষ নেই?

বাদশার কথা বুধবার

বলতে পারেন, কমরেড, আমার স্বভাবের দোষ। যখন যেটা নিয়ে পড়ি, তার একেবারে চূড়ান্ত ক'রে ছাড়ি।

যাত্রার পোকা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়ে এবার ঢুকল ইউনিয়নের পোকা। ক্লাবে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এতদিনে আলীর দেওয়া সেই বইটার খোঁজ পড়ল—'সাম্যবাদের 'ভূমিকা'। ধুলো ঝেড়ে বার করলাম বইটা। একবার আরম্ভ ক'রে আর ছাড়তে পারলাম না। তারপর ঠিক নাটকনভেলের টান নিয়ে একটার পর একটা চটি বই শেষ করতে লাগলাম।

মাঝে মাঝে একটু ফাঁক পেলেই আমি চলে যেতাম মৈজুদ্দি জাদুর হোজরায়। আগে মৈজুদ্দি জাদু বলত, আমি শুনতাম। এবার থেকে ব্যাপারটা গেল উল্টে ; আমি বলতাম মৈজুদ্দি জাদু শুনত। শেষকালে সময় হত না ব'লে আমি মৈজুদ্দি জাদুকে বইকাগজ যোগাতে শুরু করলাম।

শুধু আমাদের কারখানা ব'লে নয়, সব কারখানাতেই তখন মজুরদের মাথার ওপর ঝুলছে ছাঁটাইয়ের খাঁড়া। কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা বেশ পাকিয়ে উঠল।

বুঝতে পারছিলাম মালিকপক্ষ আঁটঘাট বাঁধছে। চায়ের দোকানে তাড়িখানায় কে কী বলছে সেসব খবর একত্র ক'রে বোঝা যাচ্ছিল, মালিকপক্ষ এটা দেখাবার চেষ্টা করছে যে, লড়াই যখন শেষ এবং বাজার যখন মন্দা, সেখানে কাজ না কমে পারে না। কাজ যদি কমে কাজের লোকও না কমিয়ে উপায় নেই। যেসব গুণ্ডা-বদমায়েস এতদিন এর ওর ঘাড় ভেঙে খাচ্ছিল, দেখা গেল তারা একে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চায়ের দোকানে টোস্ট মামলেট খাওয়াচ্ছে। শুঁড়িখানায় মাল কিনে খাওয়াচ্ছে।

কারখানার মধ্যেও বেশ একটা থমথমে ভাব। কে যাবে কে থাকবে এই নিয়ে ঘোঁট, এই নিয়ে গুজগুজ ফিস্‌ফাস্।

মোটের ওপর বিপদ এড়াবার কোনো উপায় নেই যখন, একা কে কিভাবে বাঁচবে সেই চিন্তা। নিজেকে কোম্পানির জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবতে গিয়ে অনেকেই খুব মুশকিলে পড়ে। কেননা সত্যিই তো লোকসান ক'রে তো আর কোম্পানি চলতে পারে না।

বা-জানের কাছে শুনেছি, আগেকার দিনেও মজুররা লড়ত। যখন খুব অসহ্য হত, পেছন থেকে সাহেবদের মাথায় চটের বস্তা গলিয়ে দিয়ে পিটত। লড়াইটা হত মারপিটের লাইনে। যে সামনে আছে তাকে মারো। আসল কলকাঠি যার হাতে তাতে তার গায়ে আঁচড়ও লাগত না।

কিন্তু কলকাঠি যারই হোক, নাড়ানাড়ি করছি তো আমরা। না কী বলেন? আমরা নাড়াচ্ছি ব'লেই না মালিকের লাভ হচ্ছে। আমরা যদি হাত সরিয়ে নিই, তাহলে সব বন্ধ। মালিক তো ঠুঁটো জগন্নাথ। সুতরাং কলকাঠি সব বলতে গেলে আমাদের হাতে। কলকাঠি কার? মালিক বলছে, আমার। আমরা বলছি, যে চালায় তার। কলকাঠির মালিক আসলে আমরা। আমাদের লড়াইটা শুধু ছাটাই ঠেকানো, মজুরি বাড়ানো, খাটুনি কমানো—এ নিয়ে নয়; আমাদের আসল মামলা মালিকানা নিয়ে।

আমি দেখেছি কমরেড, একেবারে গোড়া ধ'রে টান দিতে পারলে কাজ হয়। লড়াইতে জোর বাঁধে। তা না হলে বাজার, চাহিদা, দরদাম, লাভ—এ সবের ঘাবলায় পড়ে গিয়ে লোকে ঘাবড়ে যায়।

বিকেলে গেট মিটিং হল। আলী আমাকে একটা টুলের ওপর তুলে দিয়ে বলতে বলল। টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পায়ে জোর পাচ্ছি না। জিভ শুকিয়ে গেছে। বক্তৃতা জীবনে তখনও দিই নি। অথচ সামনে পাঁচ সাতশো লোক দাঁড়িয়ে গেছে। 'ভাইসব' পর্যন্ত ব'লে কথা আটকে গেছে। হঠাৎ আমার মনে হল বড় বুবুর কথা। বড় বুবু যেন আমাকে চিমটি কেটে বলছে, 'চুপ ক'রে আছিস কেন, বল ?' পাড়ায় ফেরিওয়ালা এলে বড় বুবু আমাকে দিয়ে মা কে বলাত। আমার কথা আটকে গেলে বড় বুবু পেছন থেকে চিমটি কাটত।

প্রথম দিন এমনভাবে বললাম যেন মার কাছে চাইছি। অথচ আমি কিন্তু লজেঞ্চুস, কাঁইদানা, বুড়ির চুল এসব চাই নি। চেয়েছিলাম সব মজুরের একতা। আস্তে আস্তে দেখলাম ভিড়টা ঘন হয়ে এল। আমার সামনে চেনা মুখগুলোর ভাব বদ্‌লে যেতে লাগল। বুঝলাম মুখে রাগ দেখিয়ে মা এবার মাটিতে ঠকাস্‌ ক'রে পয়সা ফেলে দেবে।

ইউনিয়ন আপিসে যেতে আলী, সালে সবাই বলল আমি নাকি ভাল বলতে পারি। বড় বুবু বলত আমি নাকি মার কাছে ঠিক মতন চাইতে পারি।

সেদিন ফিরে গিয়ে বড় বুবুর কথা আমার খুব মনে হল। ঠিক করলাম পরের দিনই যাব।

বড় বুবুকে দেখলাম গিন্নিবান্নি হয়েছে। আমাকে আদর ক'রে বালুশাহী আর ফিরনি খাওয়াল। তারপর দরজা অবধি এগিয়ে দেবার সময় আঁচলের খুঁটটা খুলতে খুলতে বলল, শোন্‌ বুলু, এটা তোদের পার্টিতে দিস। ভাঁজ করা একটা দশ টাকার নোট। আমার চোখটা কেন যেন ছলছল ক'রে উঠল। বড় বুবুকে দেখতে হয়েছে ঠিক মার

মতো। আমি বললাম, 'আমি তো চাই নি।' বড় বুবু কী বলল জানেন কমরেড? বলল, 'কথা না ব'লেও, তুই খুব ভাল চাইতে পারিস।'

তারপর ঠিক হল একটা হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হবে। সালে বলল, 'বাদ্‌শা সায়েব, আপনি লিখুন।' আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বলে কী? আমি কখনও লিখতে পারি? ইস্কুলের পড়াই শেষ করতে পারি নি।

খুব রাগও হল। এদিকে যাত্রার ক্লাবে একদিনও যেতে পারছি না। জলিলের আড্ডা তো অনেক দিনই শিকেয় উঠেছে। তাছাড়া কাজে ঢোকার পর তো আর কলমই ধরি নি। তার চেয়ে ভূপতি মাস্টারকে গিয়ে ধরলে হয়। কিংবা কেষ্টর বাবাকে।

হাড়কলের নাইট ডিউটিতে আগুন পোয়ানোর কথা মনে পড়ল। ছেদিলালই সব দিন বলত। একদিন আমার একপাশে সোনারেন আর অন্য পাশে ঠগ্‌নী আমাকে কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে বলেছিল, 'তুমি তো পড়ালিখা জানা লোক। বলো না একটা গল্প—'

আমি যে লেখাপড়া জানি, এটা ছিল ওদের কাছে আমার গর্ব। মান বাঁচানোর জন্যে আমাকে একটা গল্প বলতে হল। সেই যে—

এক ওস্তাগরের এক ভাই ছিল। সে খুব গরিব। এত গরিব যে খাওয়া জোটে না। একদিন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখে সামনে একটা মস্ত মোকান। ফটকে দরোয়ান। তাকে জিগ্যেস করল, 'কোন্ সাহেব? দিল্ কেমন?' দরোয়ান বলল, 'নবাব খান জাহাঁ; খুব দিলদার আদ্‌মি।' নবাব সায়েব নাকি কাউকে ফেরায় না। যে যা চায় তাই পায়। ভেতরে গিয়ে দেখল কুর্সিতে নবাব সায়েব ব'সে। সেলাম দিতেই খাতির যত্ন ক'রে বসতে বললেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কী মনে ক'রে?' 'হুজুর, ভুখা আছি। কিছু যদি—' ও শেষ করার আগেই নবাব সায়েব জিভে চুক চুক শব্দ ক'রে বলেন, 'আহা রে, খাওয়া হয় নি, আহা! আমি এখুনি তার বন্দোবস্ত করছি।' নবাব সায়েব তক্ষুনি 'বয়বাবুর্চিখানসামা কৌন হ্যায়' ব'লে হাঁক দিলেন। কারো

কোনো সাড়া নেই। নবাব সায়েব তখন ঘাড় ফিরিয়ে 'খানা পাকাও' ব'লে আবার লোকটার সঙ্গে কথায় মন দিলেন। 'আর কিছু দিতে পারব না। আজ থেকে আমার সঙ্গে তুমি খাবে থাকবে, ব্যস্। রাজী?' ওস্তাগরের ভাই মহা খুশি। নবাব সায়েবের কী দরাজ দিল্? এদিকে সময় যায়। লোকটার তো ভোঁচকানির দশা। তখন হঠাৎ নবাব সায়েব ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'খানা লাগাও'। তারপর দুহাত ঘষতে ঘষতে উঠে হাত ধুয়ে আসার ইশারা করলেন। তারপর ঘরের এক কোণে গিয়ে হাতে সাবান মেখে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মোছার ভঙ্গি করলেন। লোকটা একটু অবাক হয়ে গেল। পানি সাবান তোয়ালে কিছুই তো নেই। নবাব সায়েব তারপর টেবিলের একটা কুর্সিতে নিজে ব'সে অন্য কুর্সিতে লোকটাকে বসালেন। টেবিলে রেকাব গেলাস সুরাই কিছুই নেই। কিন্তু বসেই নবাব সায়েব হাত চালিয়ে শুরু ক'রে দিলেন, 'সরমের কী আছে? শুরু ক'রে দাও। বেশি কিছু করতে পারে নি। শিরাবরঙ্গা পরোঠা। কালিয়া কোরমা। কাবাব তাফতান। দোপেঁয়াজা কোপ্তা আর জর্দা গাওজবান্। বাদামি রওগনজোশ আর বাখরখানি। দমপোক্তা আচার সিরমাল বোরহানি। কোফতা পোলাও ফিরনি। হালোয়া মোরব্বা মেঠাই। ব'সে আছ কেন, খাও?' এতক্ষণে ওস্তাগরের ভাই বুঝল এই নবাবটি লোক পাকড়ে আনে তামাসা করার জন্যে। তবু সে রাগ চেপে বলল, 'সত্যি তো, বড় বঢ়িয়া পোলাও।' নবাব বলল, 'হবে না? খানসামাকে মাইনে দিই দু হাজার রুপেয়া।' তারপর 'সরাব লাগাও' ব'লে নবাব দিলেন সরাব আনার ফরমাশ। ওস্তাগরের ভাই ঢেঁকুর তুলে এমন ভাব করল যেন তার পেটে আর জায়গা নেই। এবার সায়েব তবু ছাড়বেন না। এত ভাল সরাব—না, কিছুতেই কেলা চলবে না। নবাব মুখে চক চক শব্দ ক'রে হাতের এমন ভঙ্গি করেন যেন সত্যিই গেলাসে ঢালছেন। ওস্তাগরের ভাই মনে মনে এবার বলল, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।' তারপর এমন ভাব

করল যেন খাচ্ছে। আর খেয়ে টলছে। তারপর আকাশে হাতটা তুলে নবাব সায়েবের ঘাড়ে মারল প্রচণ্ড এক রদ্দা। নবাব সায়েব তো কাত। তখন ওস্তাগরের ভাই বলল, 'হুজুর, মাপ করবেন। ভরপেটে এমন নেশা হয়েছে যে মাথার ঠিক ছিল না।' নবাব সায়েব বললেন, 'এতদিনে খাঁটি রসিক পেলাম।' তারপর সত্যিকার খানাপিনা শুরু হল। সে একেবারে এলাহি ব্যাপার। বিশ বছর ধ'রে ওস্তাগরের ভাই এইভাবে নবাব সায়েবের সঙ্গে খানাপিনা ক'রে ফুর্তিতে দিন কাটাল।

ওরা তো আমার গল্প শুনে সব হেসে খুন। এতদিন হল, অথচ আজও আমি সেই আদিবাসী মানুষগুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। ওদের কাছে আমি ছিলাম 'পড়ালিখা জানা আদ্‌মি।'

অথচ আমি তো জানি আমার বিদ্যের দৌড় কত।

তবু আমি রাত জেগে হ্যাণ্ডবিল লিখলাম। সেই হ্যাণ্ডবিল ছাপা হল বড় বুবুর পয়সায়। লেগেছিল শুধু কাগজের খরচ। হ্যাণ্ডবিলের একটা কপি বড় বুবুর ট্রাঙ্কে এখনও তোলা আছে। বড় বুবু সে লেখা কত বার যে হাকিম ভাইকে পড়ে শুনিয়েছিল তা বলার নয়। হাকিম তাই তো আর পড়তে জানত না।

হ্যাণ্ডবিলের আবস্তটা এখনও একটু মনে আছে। বলব কমরেড?

'আমাদের কারখানার লোহাকাটা তামাম ভাই,

'লড়াইয়ের ক'বছর আমরা মুখে রক্ত তুলে খেটেছি। আমাদের রক্তে মুনাফা লুটে কোম্পানি লাল হয়েছে। কোথায় লড়াই জিতে আমরা আজ তাদের লাভে ভাগ পাব তা নয়—লাথি মেরে আমাদের তারা ভাগাতে চাইছে। ওদের হল লোক কমিয়ে কাজ বাড়াবার মতলব। কোম্পানির এই বদমায়েশি আমরা মেনে নেব না। ছাঁটাই যদি করতেই হয় মুনাফা ছাঁটাই করো, একজন মজুরের গায়েও হাত দেওয়া চলবে না। কোম্পানিকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি—আমাদের একজনকেও যদি জবাব দাও, তোমাদের আমরা জবাব দেব সারা কারখানা অচল ক'রে।…'

লেখার পর যখন ছাপা হয়ে এল, দেখে খুব ভাল লাগছিল। আপনাদের লেখা যখন ছাপা হয়, আপনাদেরও নিশ্চয় খুব ভাল লাগে ?

মৈজুদ্দি জান্নুকেও পড়ালাম। প'ড়ে বলল, তুই তো বেশ লিখতে পারিস রে! আসলে তো, কমরেড, আমি লিখি নি। আগে মনে মনে ব'লে নিচ্ছিলাম। তারপর সেই বলা কথাগুলো কাগজে বসাচ্ছিলাম। মুখের বলা আর কাগজের লেখা তো এক জিনিস নয়।

আমি ভেবেছিলাম, এই যে আমি ইউনিয়নের কাজ নিয়ে আপিস-কাছারিতে যাচ্ছি, চেয়ারে ব'সে বাবুদের সঙ্গে কথা বলছি, পাঁচজন লোক আমার কাছে আসছে যুক্তিপরামর্শ নিচ্ছে—এতে বা জান নিশ্চয় খুব খুশি হচ্ছে। একদিন বা-জানের কথা শুনে আমার সেই ভুল ভাঙল।

আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বা-জান একদিন মা-কে বলল, 'তোমার ছেলের পাখা গজাচ্ছে আগুনে পুড়বার জন্যে। রায়পাড়ায় গিয়েছিলাম, গোবিন্দবাবু বলছিলেন থানার বড়বাবু নাকি ওঁর কাছে দুঃখ্যু করেছেন—ফকির সাহেব এত ভাল লোক কিন্তু ওর ছেলেটা এমন হল কেন? কারখানার মিস্ত্রিদেরও কেউ কেউ বলছিল—সাহেবদের পেছনে লাগতে যাচ্ছে, টেরটি পাবে বাছাধন।'

মা মুখ শুক্‌নো ক'রে এসে আমাকে বলল, 'তাহলে বুলু, তোর ওসব ছেড়ে দেওয়াই ভাল।' আমার বউ সাহস পেত না আমাকে কিছু বলার। কিন্তু সেও নিশ্চয় মনে মনে ভয় পেত।

আবার আমি বাড়িতে একা হয়ে গেলাম।

আমার কথা

আজ সকালের খবর, সাত নম্বর থেকে প্রণবকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। প্রণব বলতো এ জেলের সেরা দাবাড়ু। আমি কোন্ ছার, মার্শাল ভরোশিলভ পর্যন্ত ওর কাছে দাঁড়াতে পারেন না।

যারা ঘটি নয়, তারাও প্রণবকে বলে বাঙাল। সেটা শুধু ওর বরিশালিয়া ভাষার জন্যে নয়, সব ব্যাপারে ওর গোঁয়াতুর্মির জন্যে। হাঙ্গার-স্ট্রাইকে ওকে বাদ দেওয়া হবে, এটা গোড়া থেকেই ঠিক ছিল। কেননা এক সময়ে ও ছিল গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগী। প্রণব ভয় দেখাল হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতে না দিলে আমাদের কিচেন ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে গিয়ে ও হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবে। পৃথগন্ন হবে বললে জেল কমিটি শক্ত হতে পারত। কিন্তু পৃথক্‌ নিরন্ন হওয়া। তাতে ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হবে। সুতরাং জেল কমিটিকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল।

আজ সকালে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠায় কমরেডরা জোর ক'রে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। তাও সম্ভব হত না ও যদি অজ্ঞান হয়ে না যেত। গোঁয়ার যে।

প্রণব ছিল রেলের গার্ড।

আমার বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। তার মানে, রেল ধর্মঘটে যোগ দেওয়া বাবার পক্ষে অসম্ভব হত না। বাবাও কি জেলে আসতেন?

হ্যাঁ, এক জেলে বাবা আর ছেলে, তাও তো আছে। রামরতনবাবু আর তাঁর ছেলে হিরণ। দাদু কিছুতেই আসত না। এলে হত তিন-পুরুষ। একেবারে খবরের কাগজের খবর।

আমার মুশকিল, শরীরে কোনো রোগবালাই নেই। কাজেই আমার পক্ষে মাথা বাঁচিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক ছাড়া সম্ভব নয়। হাঙ্গার-স্ট্রাইক হলে প্রথম লিস্টেই থাকবে আমার নাম। নেতারা কেন এমন কোনো কারণ খুঁজে পান না যাতে আমাকে রেহাই দেওয়া যায়? দাড়, বলব নাকি আমার সেই মেজো মামার কথা? জেলে ব'সে শেষ পর্যন্ত যিনি স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন?

কী অবস্থায় দিয়েছিলেন সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু দিয়েছিলেন তো?

আমি যখন প্রথম পার্টিতে আসি, কমরেড চৌধুরী কথায় কথায়

বলেছিলেন—আচ্ছা, সেই যে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন তিনি তো তোমার মামা। না? আমি একটুও না ঘাবড়ে উত্তর দিয়েছিলাম —আমার আপন মেজোমামা।

কমরেড চৌধুরী চেয়েছিলেন এটা জানাতে যে, এ সত্ত্বেও আমি অচ্ছুৎ নই—পার্টি যথেষ্ট উদার। কিন্তু তার মধ্যেও একটা হুঁশিয়ারি ছিল। আমার দৌড় সম্পর্কে পার্টি সজাগ।

কিন্তু আমার একমাত্র নালিশ এই যে, আমার মেজোমামাকে ঠিকভাবে দেখা হয় নি। মেজোমামা যখন সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস হারিয়েছে, যখন তার পুরনো দলের সহকর্মীরা সবাই স্থির ক'রে ফেলেছে যে কংগ্রেসে যোগ দেবে, মেজোমামার সঙ্গে অবৈধ ভালবাসার কথা জানতে পেরে বালবিধবা মেজোমামীমা যখন বাপের বাড়ি থেকে বিতাড়িত, ছেলে ধরা পড়ায় দাদুর সরকারী চাকরি যখন যায় যায়— তখন মেজোমামা জেলের মধ্যে স্বীকারোক্তি করে। কিভাবে তাদের একটা ছোট দল একটা বেআইনী কাগজ বার করত সে কথা ব'লে দেয়। সেই স্বীকারোক্তির দরুন মেজোমামার কয়েকজন সহকর্মী ধরা পড়ে। মেজোমামা ছাড়া পায়। মতবাদ পরিবর্তনের পটভূমিকায় দলের লোকদের সাজাও খুব বেশি হল না। আমি বলি না, মেজোমামা ঠিক করেছিল। কিন্তু সেই অন্যায়ের উৎসের প্রবল তাড়নাগুলো, তার পরিণামের অকিঞ্চিৎকর ফলগুলো এবং তার চেয়েও বড় কথা, তার জন্যে মেজোমামার নিদারুণ মনস্তাপ—এই সব কিছু মিলিয়ে মেজোমামাকে ক্ষমা করা যায়।

মেজোমামা ধরা পড়ে শ্মশানে—আমার এক মাসী ছেলে হতে গিয়ে হাসপাতালে মারা যায়, তাকে পোড়ানো শেষ হওয়ার পর। আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম, কিন্তু থাকি নি। মেজোমামা একটা ছোট চিরকুট আমার হাতে দিয়ে বলে, এটা তুই স্বলতাকে এখুনি পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবি। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় হাত দিয়ে থমথমে গলায় বলেছিল, 'দ্যাখ্, অরু, একটু সাবধানে যাবি। পুলিশ সব জেনে

ফেলেছে। মনে হচ্ছে, আমাকে এখানেই ধরবে। তুই সব সময়ে দাত্বর কাছে কাছে থাকিস।'

মেজোমামা পরে ছাড়া পেয়ে এসে বাড়িতে অল্প কিছুদিন ছিল। তারপর বিয়ে ক'রে মামীমাকে নিয়ে চাটগাঁয় চলে যায়। সেখানে মামীমা গ্রামের এক ইস্কুলে পড়ায় আর মেজোমামা একটা স্টেশনারি দোকান চালায়। আম্মা মারা যেতে একবার এসেছিল। এখন তো আরও আসবে না। বলবে ভিসাপাসপোর্টের ভয়ানক ঝামেলা।

প্রণবের এই অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা হয়েছে মন্দের ভাল। পরে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে যে, অজ্ঞান অবস্থায় ওর হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙানো হয়েছে। নইলে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। একে বুদ্ধি কম, তার ওপর বাঙাল।

আমরা আজকাল তিন তলায় ব'সেই তেল মেখে স্নান করি। আমার আজকাল শীতের আড়ামোড়া ভেঙে স্নান সারতে প্রায়ই দেরি হয়ে যাচ্ছে। চুল আঁচড়ানো শেষ হতে না হতে এসে যাচ্ছে ফোর্স-ফিডিংয়ের দল। আজ মনে পড়ল, আম্মা রেগে গিয়ে বলত—গায়ে একবার জল ঢাললে অরু আর ক্ষিধেয় দাঁড়াতে পারে না।

না। কাল থেকে সকালে উঠেই তেল মাখতে ব'সে যাব। তারপর আগেভাগে স্নান। যাতে কেউ স্নান আর ফোর্সফিডিং এ জিনিসটাকে স্নান ক'রেই খেতে বসা ব'লে ভুল না করে।

যে যাই বলি না কেন, মেঘ জল দেবে সেই আশায় এখন সেলে সেলে আমরা ব'সে আছি। খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি কবে 'প্রবাদে জাতিভেদ' হেডিং দিয়ে কোনো বইকাগজ থেকে কিছু একটা টুকে রেখেছিলাম। পড়তে মজা লাগছে কিন্তু কেন টুকেছিলাম মনে নেই—

দেবতা মুখ চাইলে বৌ পাবে সোনার কানপাশা। একটা পক্ষও যদি জল না হয়, তাহলে দেবতা সব্বাইকে সাবাড় করবে। সেয়ানা বেনে তখন পচা ধান বেচে তুহাতে পয়সা লুটবে, মরে [illegible] জাতচাষী। প্রথমে মরবে অভাগা জোলা। তারপর কলু, যার [illegible]

কেনার খদ্দের নেই। বলদগুলো মরেছে, তাই গাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিনা অনুষ্ঠানে বৌ যায় স্বামীর ঘর করতে। কিন্তু সময় ভাল যাক আর খারাপ যাক, হিন্দুর প্রাণে সুখ নেই—তাকে শুষতে আছে গলায় সুতো ঝোলানো বামুন—যার বাইরেটা পুরুতের মতো, ভেতরটা কশাইয়ের মতো।

এইও, পৈতে না থাক—আমি বামুন। এসব কী যা তা বলা হচ্ছে?

বাজানকে আমি বুঝি। বা-জান ভাবে, সারাজীবন কষ্ট ক'রে সংসারটাকে যেটুকু গুছিয়ে তোলা গেছে, বুলু আবার সেটাকে নয়ছয় ক'রে দেবে। বা-জানের আয়ত্তের মধ্যে তার ঐ শুধু মেশিন ঘরের কয়েকটা যন্ত্র। ঐ যন্ত্রগুলো কোম্পানির। বা-জানের হাত থেকে ওগুলো সরিয়ে নিলে বা-জানের পায়ের নিচে যে জমিটা থাকে সেটা তার একেবারে অচেনা। সেটা তার কাছে শুধু সাইকেলের চাকার নিচে যাতায়াতের রাস্তা।

রায় পাড়ার গোবিন্দবাবু। ভয় তো সে দেখাবেই। তারও যে পদে পদে ভয়। তার ভাই কোম্পানির ঠিকেদার, ছেলেটা জুয়াড়ী, নিজের ব্ল্যাকের ব্যবসা। কাজেই তার সারাক্ষণ আতঙ্ক।

থানার বড়বাবু বেচারা। কোম্পানির দরোয়ানেরই চাকরি। মাইনেটা পাচ্ছেন সরকারের কাছ থেকে। বাড়িতে খাওয়ার লোক একগাদা। নিজের করুণ অবস্থাটা ঢাকবার জন্যেই তাঁকে চোখ রাঙিয়ে, দাপট দেখিয়ে বেড়াতে হয়। তাহেরের বেটার ওপর তাঁর রাগ এই জন্যেই যে, যে-কাজগুলো তাঁর করতে ভাল লাগে না তাহেরের বেটা তাঁকে দিয়ে জোর ক'রে সেই কাজগুলোই করিয়ে নিতে চাইছে। যেমন, গোয়েন্দা লাগানো, ধরপাকড় করা, পুলিশ দিয়ে ঠেঙানো,

কেস্ সাজানো। যত সব ছোটলোকের কাজ। লেখাপড়া শিখেই বা কী হল?

আর বলাই মিস্ত্রির দল? চিন্‌টেদের কথা না তোলাই ভাল। ওদের ওষুধ জলপড়া নয়—ঝাড়ফুঁক।

কোম্পানি ঢ্যাটামি করায় আমরাও মিছিল ক'রে কারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। শুরু হয়ে গেল স্ট্রাইক। সাবধান হওয়ার জন্যে আমি বাড়িতে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম।

বা-জান পড়ে গেল প্যাঁচে। আমাকে গিলতেও পারে না, ওগরাতেও পারে না। থানা থেকে লোক গিয়েছিল আমার খোঁজখবর নিতে। বা-জানকে আপনি আজ্ঞে ক'রে কথা বলেছে। সেটাতে বা-জান খুশি হয়েছিল। ফলে আমার ওপর একটু নরম ভাব হয়েছে। বা-জান একেবারেই চায় নি স্ট্রাইক হোক। বা-জানের মত ছিল কোম্পানিকে যদি ভাল ক'রে বোঝানো যায় তাহলেই গোলমাল মিটে যাবে। ইউনিয়ন মানেই তো কিছু মাথা গরম করা চ্যাংড়া ছোঁড়া। সাহেবদের সামনে হাত জোড় করবে না, বাবুদের সঙ্গে সমানে সমান হয়ে কুর্সীতে বসতে চাইবে—এসব কি হয়? হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান?

বা-জান আমাকে ভয় দেখিয়েছিল যে, বা-জান কারখানায় যাবেই। কেননা এ সময় স্ট্রাইক করা ভুল।

বা-জান যাবে না আমি জানতাম পরে শুনেছি বা-জানের সব ঘটনা।

স্ট্রাইকের দিন দেখা গেল, সকালবেলায় খেয়ে দেয়ে টিফিনের কৌটো পানের ডিবে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বা-জান রওনা হয়ে গেল। মার সেটা ভাল লাগে নি। আরও একটা জিনিস মার ভাল লাগে নি। বা-জান বেরিয়ে যাওয়ার পরই হঠাৎ আমার এক খালুর কুটুম্বিতে করতে আসার ব্যাপারটা। 'তা বুবু, তোমরা সব কে কেমন আছ? বুলু কোথায়? নেই? কেন, কাল রাত্তিরে ছিল না? কী গো বউ?' তারপর বই দেখছি ব'লে একা একা আমার ঘরে ঢুকে পড়ে

আমার দেরাজ হাঁটকানো। খাপুর গায়ে প'ড়ে এই আদিখ্যেতা দেখানোর স্বভাবটা মার কোনোদিনই পছন্দ হয় না।

রাত্তিরে আমি ছিলাম বাগ্দী পাড়ার পরাণ চাচার বাড়িতে। শুয়ে শুয়ে পুরনো দিনের গল্প বলছিল পরাণ চাচা। পুরনো আমলের গল্প বলা, এটা বুড়ো বয়সের ব্যামো। বা-জানকেও তাই দেখেছি। আর আপনার পাল্লায় প'ড়ে, কমরেড, আমিও এখন সেই দলে পড়ে গিয়েছি।

পরাণ চাচা বলছিল, 'এখন তোরা যেখানে গেস্টকীন দেখছিস, সেখানে আগে ছিল পুরো জঙ্গল। মাঝখানে মাঝখানে দু একখানা বাড়ি। এ অঞ্চলে ছিল মোটে ছ' আট ঘর লোক। এ সবই ছিল জমিদার এনায়েতুল্লা কাজীর মহাল। তোদের পাড়ায় যারা ছিল, তারা করত জমিদারি দেখাশুনোর কাজ। পাইক পেয়াদা গোমস্তা এই সব। কিছু লোকের ছিল মুদিখানার দোকান। এদিকে ছোট বড় সবই ছিল মেটে রাস্তা। এখন যেখানে রংকল, তার পাশে ছিল পিচ তৈরির কারখানা। একটু ফাঁকে এলেই দেখা যেত চারদিকে ধানজমি। সেখানে হত হাতে-কোদালে চাষ। বড় রাস্তা ছিল জমিদারের। কাজীদের জমিদারি পরে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশ কেনে বক্সীরা। রেলের কারখানায় ঢুকি দশ বারো বছর বয়সে। তখন বয়দের ছিল দু আনা রোজ। তিন চারশো ঘর মুসলমান ঘরের মধ্যে একজন ছিল হিন্দু। সবাইকে সে দাবড়ে বেড়াত। তার মস্ত বাড়ি, অনেক পয়সা। একবার রাস্তায় গাড়ি আটকে গাঁয়ের সবাই তাকে চেপে ধরল। তখন ঘাট মানল। পাঁচ শো টাকা গাঁটগচ্চা দিয়ে তাকে গাঁয়ের সবাইকে খাওয়াতে হল। আগে টানার মোর্শনের আপিস ছিল গঙ্গার ধারে। ছোট ছোট ঘর ভেঙে যখন নতুন ঘর হল, তখনও ওপরে ছিল হোগলার ছাউনি। হাজার হাজার হাতবাতি নিয়ে রাত্তিরে কাজ হত। তোরা তো স্ট্রাইক করছিস। প্রথম কবে এ কারখানায় স্ট্রাইক হয় জানিস? দু কুড়ি বছর আগে। হপ্তা বাড়াবার দাবিতে।

বেতাইতলায় মিটিং হত একসঙ্গে তিন চার শো ধর্মঘটী মজুরের। লড়াই একমাস ধ'রে চলল। কোম্পানি আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাল। তার ফলে, আমরা হেরে গেলাম।'

তারপরও পরাণ চাচা ব'লে চলেছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুনি নি। পরাণ চাচাকে বয়স জিগ্যেস করলে বলতে পারে না। বলে, 'তা তিন চার কুড়ি হবে। না কী বলিস?'

স্ট্রাইক শুরুর ক'দিন আগে থেকেই দেখতাম কেষ্ট কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। দেখেও দেখছে না। ওর তো চোখ খারাপ, কাজেই অত গায়ে মাখি নি।

কিন্তু শেষের দিন দেখলাম কেষ্ট পেচ্ছাপখানার কাছে বলাই আর রব্বানির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে কিসব গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছে। ইদানীং কেষ্ট আমাদের ইউনিয়ন অফিসে ঘন ঘন আসছে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম আমাদের ধর্মঘটের বিজয়-উৎসবে এবার আমরা যাত্রা করব। কিন্তু কেষ্টকে ঐ দলটার সঙ্গে অতটা মাখামাখি করতে দেখে আমার খুব রাগ হল। ওদের বিরুদ্ধে কেষ্ট আমাকে কম কথা বলেছে?

বুঝলাম কেষ্টর মেরুদণ্ড ব'লে কিছু নেই। কেষ্টকে বাঁচানো গেল না ব'লে মনে মনে আমার কষ্টও হল।

ইউনিয়ন অফিসে তক্ষুনি খবর পাঠিয়ে দিলাম। কেষ্টকে যেন বিশ্বাস করা না হয়।

আরেকটা কথা, কমরেড। এই প্রথম আমি বুঝতে পারছিলাম যন্ত্র বলতে একমাত্র আমার ঐ ওয়েল্ডিং মেশিনটাই নয়। পার্টি চালানো, ইউনিয়ন চালানো—এসবও যন্ত্রের চেয়ে কিছু কম নয়। যন্ত্র জিনিসটা দিয়ে ভালোও হয় আবার মন্দও হয়। নির্ভর করে কী কাজে লাগছে তার ওপর। এ কাজেও যথেষ্ট কারিকুরির দরকার হয়।

বা-জানের মুশকিল, বা-জানের হাতে একটাই যন্ত্র। সেটা থেকে যাচ্ছে মেশিন ঘরে। আমার হাত খালি নয়। মুঠো ক'রে ধরেছি

অন্য একটা যন্ত্র, যা মানুষকে নড়ায়। এ কাজেরও খুব একটা নেশা আছে। আমি খুব মেতে গেলাম।

কারখানার গেটে বলাইরা একটা গোলমাল পাকাবার তালে আছে, এ খবর আমরা আগের দিনই পেয়েছিলাম। রব্বানি আর বলাই যখন রাত্তিরে কেষ্টদের বাড়ি থেকে ফিরছিল তখন রাস্তায় ধ'রে ও-শালাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু ঐ গন্সু হারামীটার কথা আমাদের কারো খেয়ালে ছিল না। ফলে, ওর ওপর আমরা কেউ নজর রাখি নি।

চায়ের দোকানের সামনে দাদারা একটা দল ক'রে ব'সে ছিল। কেউ যাতে কারখানায় না যায় সেটা দেখার জন্যে। একটা বাচ্চা ছেলে পাহারা দিচ্ছিল, সে চোখের সামনে দুটো হাত এনে দূরের দিকে নজরটাকে ছোট ক'রে এনে রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ফকির সায়েবের পা-গাড়ি।'

দাদা বেরিয়ে এসেছিল। চায়ের দোকানে এসে বা-জান সাইকেল থেকে নেমে খুব তাড়াতাড়ি আছে এমনি ভাব ক'রে হাঁক দিল, 'ঝপ্ ক'রে এক্ কাপ চা দে, ভজু। খুব গরম হয় যেন।' চা খুব গরম না হলে বা-জানের চলত না।

দাদা হেসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, বা-জান? টিফিনের কৌটো কী হবে?'

বা-জান মুখ গম্ভীর ক'রে বলল, 'কেন, তোদের ইউনিয়ন কি কোম্পানির পয়সা খায় যে, আমাকে নাস্তা দেবে?'

দাদা বলেছিল, 'ইউনিয়ন আমাদের পয়সা খায়। ইউনিয়ন ইচ্ছে করলেই তোমাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু কোন্ দুঃখে তোমাকে খাওয়াতে যাবে?'

'এই যে সারাদিন ইউনিয়ন অফিসে থাকব, আমাকে টিফিন করতে হবে না?'

দাদা তো শুনে অবাক। তার মানে, কারখানার সাজে বা-জান

যাচ্ছে ইউনিয়ন অফিসের ঝাঁপ খুলে বসতে। দাদা ভেবেছিল বা-জান বোধহয় ওর আড্ডার জায়গাগুলোতে টহল দিতে বেরিয়েছে। রবিবারেও বা-জানকে দিনের বেলায় কেউ বাড়িতে পাবে না। ছুটির দিনেও সকালে খেয়েদেয়ে টিফিনের বাক্স হাতে ক'রে, পকেটে বিড়ির ডিবে পানের ডিবে নিয়ে কারখানার ড্রেসে সাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়া —বা-জানের এটা বরাবরের অভ্যেস। দুপুরে ঘুমুনো দূরের কথা, একমাত্র অসুখে না পড়লে বা-জানকে দিনে দুপুরে কখনই আমরা বাড়িতে দেখি নি।

তারপর দাদাকে বা-জান বলেছিল, 'আমি ভেবে দেখলাম, বাদ্‌শা ডুব মেরেছে, তোরা সব রাস্তায় থাকবি, আলী-সালে ওদের একটু স'রে থাকতে হবে, কাজেই ইউনিয়ন অফিসে ব'সে থাকা আমার পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধের। তাছাড়া থানার বড়বাবুর সঙ্গে আমার খাতির আছে। কোনো গোলমাল হলে, পুলিশকে ঠেকাবার কাজটাও আমি করতে পারব।' বড়বাবুর সঙ্গে খাতির আছে বা-জানের, এটা বলতে তখনও বা-জান ভুলে যায় নি।

বা-জানের সেই ব্যাপারটা ঠিক এর পরই ঘটে।

আমার কথা

মানুষের স্বপ্নগুলো কী অদ্ভুত হয়। দুপুরে একটু তন্দ্রা এসেছিল। তারই মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলাম। ট্রেনে উঠেছি। স্টেশনে আসা, প্লাটফর্ম পার হওয়া—এসব কিছু নয়। সিনেমার ছবিতে যে রকম হয়। আগা মাথা কিছু নয়, একেবারে শুরুতেই একটা ট্রেনের কামরা। কিন্তু ট্রেনের কামরার চেয়ে বড়। সাইজে অনেকটা ওয়েটিং রুমের মতো। কিন্তু ওয়েটিং রুম নয়। কামরাটা চলছে। অথচ কোনো জানলা চোখে পড়ে নি। তার যে জানলা থাকা দরকার, জানলার বাইরের দৃশ্যগুলো উল্টোদিকে ছুটে যাওয়া উচিত—এইভাবে চলার

ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ফেলার কোনো প্রশ্নই নিজের কাছে ছিল না। ওটা যে ট্রেনেরই কামরা আমার কাছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। আরও একটা কথা আমি কবুল করি। জানলার কথাটা যখন লিখছি ঠিক সেই সময় নিজের মনকে আমি এই ব'লে জেরা করছিলাম যে, যে লোকগুলো ব'সে ছিল তাদের নড়ে নড়ে উঠতে দেখা গেছে কিনা। আমার মন অম্লানবদনে মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। কিন্তু ধর্মাবতার, এটা ঠিক নয়। আসলে ট্রেনে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণভাবে আমার। আমি সরকারী খরচে যাচ্ছিলাম না যে, টিকিট দেখিয়ে তার প্রমাণ দর্শালে তবে আমি পয়সা পাব। আমি যে ট্রেনে ক'রেই যাচ্ছিলাম, সেটা আমার কাছে প্রমাণের কোনো অপেক্ষা রাখে নি। কামরাটা ছিল প্রথম শ্রেণীর। কেন ফার্স্ট ক্লাস বললাম না, তার কারণ আছে। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে আমি ফার্স্ট ক্লাস দেখেছি। আজও আমি ফার্স্ট ক্লাসের ভেতরে কখনও যাই নি। নিচে গদি ছিল কিনা আমার খেয়াল নেই। কিন্তু পিঠের দিকে কাঠ ছিল। সওয়ারির মাথা ছাড়িয়ে প্রায় এক হাত উঁচু। সেই কাঠের জাত এবং রং আদালতের কাঠগড়ার মতো। গাড়িতে চেন টানার কোনো ব্যবস্থা ছিল কি? আমি দেখি নি। উঠতেই সামনে যে অংশটা পড়ল, তাতে বসবার কোনো জায়গা ছিল না। যাঁরা ব'সে ছিলেন, সবাই খুব ভদ্রলোক। মহিলারা ছিলেন সুবেশ। তাঁরা ব'সে ছিলেন বড় ডাক্তারের চেম্বারে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে লোক ব'সে থাকার ভঙ্গিতে। সবাই যেন ডাকের অপেক্ষা করছেন। পাশাপাশি ব'সে, সকলেই সকলের সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ। যে যার নিজের মধ্যে রয়েছেন। একজন চেকার এসে আমার টিকিট দেখতে চাইলেন। তারপর আমার টিকিটটা নিয়ে একটা টুকরো কাগজে কি সব নম্বর-টম্বর লিখে আমাকে বাঁদিকে এগিয়ে যেতে বললেন। এই ওঠা, তাকিয়ে দেখা, চেকার আসা, চিরকুট লেখা এটা কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লাগল। অবিশ্বাস্য হলেও আমি বলতে বাধ্য যে তার হিসেবটা মিনিটের নয়,

ঘণ্টার। কামরার পেছনের অংশটা পরিষ্কার আলাদা। একটা ধাপ উঠতে হল। দূরত্ব এমন কিছুই নয়, কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লাগল। আমি যখন ধাপ পেরিয়ে উঠলাম, একদল তখন নেমে যাবে ব'লে উঠে আসছে। তার মধ্যে কয়েকজন মহিলা ছিলেন। কারো হাতে কিংবা কামরা জুড়ে কোথাও কোনো লাগেজ কিংবা ওয়াটার বট্‌ল দেখি নি। নামবার সময় মনে হল ভাবখানা ট্রাম থেকে লেডিজ নামবার। অথচ ট্রাম নয়। জমকালো সম্ভ্রান্ত ট্রেনের কামরা। লম্বা, মোটার দিকে, আলতো লিপস্টিক মাখা মোটা ঠোঁটওয়ালা এক ভদ্রমহিলা হ্যাণ্ডব্যাগ কোলে নিয়ে যাবার সময় আমার গায়ে গা ঠেকে গেল। আমি উঠে একটু এগিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম। চিরকুটে কত নম্বর লেখা ছিল, নম্বর মিলিয়ে বসেছিলাম কিনা স্বপ্নে সেসব স্পষ্ট নয়। তবে চেকার আসায় তখন সেই চিরকুটটার খোঁজ পড়ল। খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারলাম আমার গায়ে কালো রঙের একটা গরম কোট। নিচের দুটো পকেট ছাড়াও দুটো ছোট চোরা পকেট আছে। আমি টিকিট খুঁজছিলাম না। সেই ছেঁড়া কাগজের চিরকুটটা খুঁজছিলাম। কিছুতেই পাচ্ছি না। কিছুতেই পাচ্ছি না। অথচ একটা চোরা পকেটে গুঁজে রেখেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। চেকার সায়েব অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে তারপর একটু হেসে চলে গেলেন। তখন আমার খুব অপমান লাগল। এতক্ষণ আমার কাছে চিরকুটটা আছে এবং সেটা মনে ক'রে যে আত্মবিশ্বাসের ভাব ছিল, ওঁর হেসে চলে যাওয়ায় আমার আত্মবিশ্বাসে ঘা লাগল। তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা পকেট তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলাম। কিছুতেই পাচ্ছি না। তখন টিকিটের কথা মনে হল। টিকিটও নেই। কিন্তু প্রথম চেকার যে আমার হাত থেকে টিকিট নিয়েছিলেন সেটা স্পষ্ট মনে আছে, ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কিনা মনে নেই। সেটা কোনো স্টেশন কিনা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু কামরার বাইরে, ভাল সিনেমা হলে গেলে ইণ্টারভ্যালের সময় লাউঞ্জে বেরোলে যে রকম লাগে সেই রকম,

কিন্তু একদম ভিড় নেই, আর সমস্ত কামরায় যেমন, তেমনি বাইরেও মিটমিট করা নয়, মোছা-মোছা আলো, বড়লোকদের বাড়িতে বেশি পাওয়ারের আলোয় ঢাকা দিয়ে যেমন চুপচাপ দেখায় সেই রকম। দূর থেকে সেই চেকারকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু টিকিটের কথাটা বলবার আগে পকেটের সমস্ত কাগজ বার ক'রে ভয়ে কাঁটা হয়ে শেষবারের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একবার দেখে নিচ্ছি। দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কিসব আজেবাজে কাগজ এতদিন ধ'রে পকেটের মধ্যে জমিয়ে রেখে দিয়েছি। ক'বছর আগে দেখা সিনেমার টিকিট, একটা বইয়ের নাম, একটা কোটেশন, কার না কার বাড়ির ঠিকানা, হঠাং কোথাও কিছু নেই একটা ফোন নম্বর, চিনেবাদামের কাগজের ঠোঙা ...। এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

সকালে বাদশাকে বসিয়ে নোট নেবার সময় বেলা বারোটা নাগাদ জেল গেটে গাড়ির হর্ন শুনেছিলাম। তার আধ ঘন্টা পর একজন ফালতু একজনের নাম লেখা ছেঁড়া কাগজের একটা টুকরো নিয়ে বাদশার হাতে দিল। বাদশা বলল, 'ক্রেমলিন থেকে ডাক পড়েছে।' জামাল সাহেবের সেলকে আমরা বলতাম 'ক্রেমলিন'। মনে মনে বললাম —হ্যাঁ, এখন একটু ঘন ঘন ডাক পড়া ভাল। আর পারা যাচ্ছে না। একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

ভাগ্যিস, সবাই একসঙ্গে লড়ছি। তার ফলে, পরস্পরকে ধ'রে ভয়টাকে অনেকগুলো ভগ্নাংশে ভেঙে নিতে পারছি।

অমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার পর্বটা কম দীর্ঘ ছিল না। আগুনের একটা প্রকাণ্ড ভাঁটা আকাশ দিয়ে হেঁটে যায়। বনের গাছগুলো হঠাং দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। পাহাড়ে পাহাড়ে দুর্মর প্রতিধ্বনিতে কী ভয়ঙ্কর হয় বাজ-পড়ার শব্দ। দিক্ পৃথিবী ভাঙ-উচাটন ক'রে আসে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। মানুষ একা হলে সেসব ভয়ে পাগল হয়ে যেত। গাছ বলো পাথর বলো, তারা নির্বিকার। তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে না; তাদের ভয়ডর নেই। একা হয়ে মানুষের উপায় নেই গাছপাথরের সঙ্গে

ভাগ ক'রে ভয় ভেঙে নেওয়ার। নিজেরা দল বেঁধে ছিল ব'লেই মানুষ পেরেছিল সেই ভয়টাকে নিজেদের মধ্যে ভেঙে নিতে। তার মানে, শুধু নিশ্চেষ্টভাবে নিজেকে ভয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নির্ভয় হওয়া নয়। গাছ যা করে, পাথর যা করে। ভয়ঙ্করের আঘাত এড়িয়ে মানুষ নিজেকে রক্ষা করে।

প্রকৃতিকে দিয়েই মানুষ প্রকৃতিকে কাটান দেয়। রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গাছের ডালের সঙ্গে ডাল বেঁধে মাথার ওপর ছেয়ে নেয়। বুনো জানোয়ারের চামড়া গায়ে দিয়ে ঠাণ্ডা আটকায়। গুহাকন্দর না পেলে পাহাড়ের আশেপাশে আড়াল নেয়। দাবাগ্নি থেকে ধরিয়ে নেয় আগুন। সেই আগুন অনির্বাণ রাখে। পাথরের ধার দিয়ে অস্ত্র বানায়, জানোয়ার মারে।

মানুষ এমনি ক'রে বুঝে নিয়ে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতি যেমন মারে, তেমনি রাখে। যে রুদ্র সেই শিব। একদিকে ভয়, অন্যদিকে দাক্ষিণ্য।

প্রকৃতিকে বুঝেশুনে নিয়ে কাজে লাগানো। এর কোনোটাই একার বিদ্যেতে কুলোয় না। সকলে মিলে বোঝাপড়া করতে হয়; প্রকৃতির কাছ থেকে যা চাই, তা সবার সহযোগে পেতে হয়।

আমি ওসব আত্মা-টাত্মা বুঝি না। শরীরটা থাকলেই আমি খুশি। এই পৃথিবীর রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ— আমি এই শরীর দিয়ে বুঝি। আমার অনুভূতিগুলো আমার দেহরক্ষী। তারা দেখিয়ে দেয় এটা মন্দ ওটা ভাল। বলে, বাঘ ডাকছে—পালাও। বলে, কাছে যাও কী মিষ্টি গন্ধ; বলে, দূর থেকেই তো মালুম করতে পারছ ওখানে কোনো পচা জিনিস। বলে, গা জুড়িয়ে নাও এই ঠাণ্ডা হাওয়ায়। বলে, একটু মুখে দিতেই তেতো লাগল তো— ওটা বিষ, ফেলে দাও। এটা কিন্তু আরও নাও, বেশি ক'রে নাও—তবে জিভে মিষ্টি লাগবে।

জীবন রক্ষা, বংশ রক্ষা—যখন যে কাজেই লাগুক, এই শরীরের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই। আত্মা-টাত্মা চুলোয় যাক।

সকালে স্নান সেরে যখন কাপড় বদ্‌লাচ্ছি, জেলগেটে আবার সেই গাড়ির হর্ন। তখনই বুঝেছিলাম, দোতলায় বাদ্‌শার ডাক পড়বে এবং আমাদের সকালে বসা আজ আর হবে না।

দেখলাম ঠিক তাই। বাদ্‌শা যাবার সময় একটু ব'সে গেল। ওর মনে কিছু ছিল।

বাদ্‌শা বলল, 'আচ্ছা, আপনাকে দেখছি বংশীবাবুকে দেখছি—আপনারা এতদিন ধ'রে এত এত লিখছেন, আপনাদের হাত ব্যথা হয় না? আমার তো একটা চিঠি লিখতে গেলেই হাত ভেরে আসে। না, এখন ব'লে নয়—পেট পুরে খেলেও সেই এক অবস্থা। সমস্তই অভ্যেস না কী বলেন? আমি কাল শুয়ে শুয়ে কী ভাবছিলাম, জানেন? আমার যন্ত্র ওয়েল্ডিং মেশিন আর আপনাদের যন্ত্র এই কলম। দেখুন তো কমরেড, আপনাদের কত সুবিধে। আপনাদের যন্ত্রটা সব সময় কাছে কাছেই থাকে। হাতে কলম নিয়ে আপনি ঘুমিয়েও পড়তে পারেন। আপনাদের যন্ত্র দিয়ে আগুন ছিট্‌কে পড়ে না, চোখ কানা হওয়ার ভয় নেই—'

সঙ্গে সঙ্গে কলমের নিবটা চোখে ফুটিয়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'চোখ কানা হয় কিনা দেখবেন নাকি?'

ভয় পাওয়ার ভান ক'রে বাদ্‌শা এক ছুটে পালিয়ে গেল।

বাদ্‌শার মধ্যে একটা অদ্ভুত ছেলেমানুষি আছে। নেতা হিসেবে কেউ ওকে পাত্তা দিতে চায় না, কিন্তু প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের কমরেডই ওকে ভালবাসে। সবাই ওর পেছনে লাগে। যাতে ওকে নিয়ে সবাই ঠাট্টামস্করা করে, আমার মনে হয়, ও ইচ্ছে ক'রে তার সুযোগ দেয়।

আসলে ও যে কি রকম ওস্তাদ, সেটা ওর রোজকার বলা থেকে বুঝতে পারি। ওকে নিয়ে আমার উপন্যাস লেখার উৎসাহটা ক্রমশ

কমে আসছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি এ সব জিনিস শুনে লেখা যায় না। বাদ্‌শা নিজে কিংবা বাদশা যে জীবন থেকে উঠেছে সেই জীবনের কেউ, যদি কলম ধরত একমাত্র তাহলেই খাঁটি জিনিস লেখা হতে পারত।

আমাকে আরও দুজন বলেছিল তাদের কাছে শুনে নিয়ে নভেল লিখতে। দুজনের একজনও বেঁচে নেই।

আম্মা একজন। আম্মা ঠিক তার নিজের কথা লিখতে বলে নি। বলেছিল একজন কালো মেয়েকে নিয়ে লিখতে।

কালো মেয়ে? আমার পক্ষে তারাই সম্ভব নয়। গায়ের রঙের জন্যে ছোট থেকেই আমার কদর। ঠিক নাকি সায়েবদের মতো আমার গায়ের রং। ইদানীং অবশ্য রোদে রোদে ঘুরে খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল, তাহলেও লোকে বলত—কী ফর্সা রং। আমার মনে হয়, জেলে এসে আবার আমি খুব ধবধবে হয়েছি। গায়ের রংটা পেয়েছি বোধহয় বাবার কাছ থেকে। ছোটমামা ছিল কালো। দাদুর ধরনের। দাদুর চশমা আছে, মামাদের সকলেরই চশমা আছে, আম্মার ছিল পড়ার চশমা। আমার চোখ খারাপ নয় ব'লে আমার দুঃখ হত। লোকে দেখেই ধ'রে ফেলত আমি ও-বাড়ির ছেলে নই। আমার বরাবর মনে হত, ছোটমামার চোখও আসলে ভাল। ছোটমামা চশমা নিয়েছে আমাকে ও-বাড়ির ছেলে নয় ব'লে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাছাড়া ছেলে হয়ে মেয়েদের মন বোঝা কি সম্ভব? আমি শুধু এইটুকু জানি যে কালোরা ফর্সাদের হিংসে করে।

আরেকজন করুণাদি।

করুণাদি ছিল আমাদের পাড়ার মেয়ে। দাদু তখন থাকত চড়কডাঙার একটা বাড়িতে। আমি তখন ইস্কুল ম্যাগাজিনে লিখি। পদ্য লিখতাম। ইংরিজি বাংলা দুটোতেই। করুণাদি অর্গ্যান বাজিয়ে সুন্দর গান গাইতে পারত। মেজোমামার বন্ধু হিসেবে করুণাদির সঙ্গে আমার আলাপ। করুণাদির বাবা ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। প্রচুর

পয়সা কিন্তু মা বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। মা আবার বিয়ে করেছিলেন। করুণাদি থাকত বাবার কাছে। বাবা ছিলেন ফুর্তিবাজ লোক। বিয়ের বাঁধাবাঁধির ভেতর আর যান নি। করুণাদির সঙ্গে মেজোমামার বন্ধুত্ব এগোয় নি, মধ্যে রাজনীতি এসে যাওয়ায়। করুণাদি আরেকজনকে ভালবাসল, কিন্তু কিছুদিন করুণাদিকে খেলিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ব্যারিস্টার হতে বিলেতে কেটে পড়ল। বোকা করুণাদি মনের দুঃখে নার্স হয়ে লড়াইতে চলে গেল। পরে একদিন আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। লড়াই তখন শেষ। ফুটপাথের পাশে একটা ছোট মরিস মাইনর এসে থেমে গেল। নার্সিংয়ের পোশাকে স্টিয়ারিঙে হাত দেওয়া করুণাদিকে কি রকম বিধবা বিধবা লাগছিল। আমাকে এলগিন রোড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে দিতে বলল, 'আমাকে নিয়ে একটা লেখ্ না। একদিন বাড়িতে আয় সব বলব।' নামবার সময় জিগ্যেস করল—'হ্যাঁরে, পলাশ বিয়ে করেছে?' পলাশ আমার মেজোমামা। তারপর যাব যাব ক'রে আর যাওয়া হয় নি। একমাস পরে শুনলাম একগাঁদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে করুণাদি মারা গেছে।

শেষকালে ফাঁদে পড়ে গেলাম জেলে এসে। সেইজন্যেই হাঙ্গার-স্ট্রাইকটা হল ব'লে। এও সেই ধোপার গাধা হয়ে পরের বোঝা বওয়া। উপন্যাস নয়, রিপোর্টাজ। বানানো নয়, কুড়ুনো।

তবু মরবার আগে উপন্যাস লিখে যাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করব। বাদশার এই সব মালমশলাগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। জেল থেকে বেরিয়ে এবার কাগজ ছেড়ে দিয়ে বাদশাদের ইউনিয়নে কাজ নেব। বস্তিতে থাকব। তাহলে পারব না?

কিন্তু তার আগে এই হাঙ্গার-স্ট্রাইকেই যদি মরে যাই?

ধ্যুৎ, মরব কেন? বালাই ষাট!

সাধুকে—মানে, যে আমাদের সখীর দলে ছিল, মুচীর ছেলে সেই সাধু—ব'লে দিয়েছিলাম সকালে এসে আমাকে নিয়ে যেতে। আমাদের ইউনিয়ন অফিসের কাছেই বস্তির মধ্যে একটা বাড়িতে দিনের বেলায় অ্যাকশন কমিটির বসবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সাধু সেই বাড়িটা চেনে।

সাধু সাইকেল এনেছিল। ওকে পেছনে বসালাম। সাইকেলে উঠতে যাব, এমন সময় দেখলাম সাইকেলে আসছে খালু। হাতে একটা দাঁতনকাঠি। আমাকে দাঁড়াতে বলল। খালু একগাল হেসে বলল, 'আমি তোর খোঁজে তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বুবু কিছু বলতে পারল না। আমি তখন ভাবলাম এখন যা অবস্থা, তুই নিশ্চয় বাড়িতে থাকছিস না। তারপর আসতে আসতে দেখি তুই পরাণের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিস। তা তোর ঘুমটুম এখানে ভাল হচ্ছে তো? রাত্তিরে দরকার হলে আমাদের ওখানেও থাকতে পারিস। আরেকটা কথা, দুটো টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি তোকে দেবার জন্যে। এই নে। তোদের স্ট্রাইক ফণ্ডের জন্যে।'

খালুকে এমনিতে পছন্দ করতাম না। কিন্তু সেদিন যে কী ভাল লাগল বলার নয়। খালু আমাকে নিজে থেকে বলছে রাত্তিরে দরকার হলে থাকতে। খালুর পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়, খালু জানে। তার ওপর স্ট্রাইক ফণ্ডে খালু দুটো টাকা দিল। আমার যে কী আনন্দ হল বলবার নয়।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বুঝতে পারলাম আমি আর এখন শুধু ফকির সায়েবের ছেলে বুলু নই। আমি বাদশা তো সত্যিই বাদশা। এপাশ থেকে ও, ওপাশ থেকে সে—ডেকে ডেকে দাঁড় করাচ্ছে। স্ট্রাইকের খবর জিগ্যেস করছে। যেখানেই থামছি সেখানেই ভিড় জমে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে আমার কানে আসছে ছেলে-ছোকরারা

গলা নামিয়ে বলছে, উনি কে জানিস তো? বাদ্‌শা। এই স্ট্রাইকের লীডার।

আমার কেবল মনে দুখ্যু হচ্ছে বা-জানের কথা ভেবে। আমাদের লড়াইতে বা-জান কেন সায় দিতে পারছে না? নিজের ঘরের ছোট্ট খাঁচাটাকে বা-জানই তো প্রথম ভেঙে শুধু বাড়ি নয় পাড়ার বাইরে পা বাড়িয়েছিল। বা-জান আরেকটু এগোলেই তো পারত। অথচ কষ্ট তো বা-জান কম করে নি জীবনে। সে তুলনায় বরং আমাদের কষ্টটা কম হয়েছে। দাদা অবশ্য অভাব দেখেছে আমার চেয়ে বেশি। হয়ত অভাব জিনিসটা বেশি হলে ঠেলা দেওয়ার বদলে দমিয়ে দেয়। মৈজুদ্দি জাহুর মতো বা-জান যদি একটু লেখাপড়া জানত, তাহলে হয়ত ঠিক এরকম হত না।

জজুর চায়ের দোকানে এসে নামলাম। দাদা বলল, বলাই আর রব্বানিকে কাল রাত্তিরে এমন ঝাড়ফুঁক দেওয়া হয়েছে যে, ওদের আর বিছানা ছেড়ে ওঠবার অবস্থা নেই। ওরা নাকি নাকে-কানে খৎ দিয়ে বলেছে যে, ইউনিয়নের খেলাপে আর কক্ষনো যাবে না। গঙ্গা নস্করের ওস্‌কানিতেও নয়।

শুনে ভাল লাগল। আবার খারাপও লাগল। বলাই রব্বানি— মিস্ত্রি হলেও ওদেরও তো সেই কারখানায় গতর খাটিয়ে খাওয়া। এক জায়গায় একই সঙ্গে আমরা কাজ করি। কারখানায় কাজ করতে করতে ওদের যদি একটা আঙুল উড়ে যায়, আমরা ছুটে গিয়ে রক্ত থামাব। ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যাব। কোম্পানি ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা লড়ব ওরা যাতে নিয়মমতো খেসারত পায়। কেননা ওদের ব্যথা ওদের সুখ আর আমাদের ব্যথা আমাদের সুখ আলাদা নয়। ওদের যে আমরাই ব্যথা দিলাম, তাতে আমরা ব্যথা পাচ্ছি—কিন্তু এ ব্যথায় আখেরে ওদের ভাল হতে পারে।

গরম চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময় একটা কথা কানে যেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় মুখটা পুড়ে গেল। কে একজন দাদাকে বলল,

কারখানার কাছে ভিখুর যে মিষ্টির দোকান তার সামনে ইউনিয়নের ব্যাজ-পরা কয়েকজনকে দেখলাম তারা তো ভাল লোক নয়—গঙ্গা নস্করের পোষা গুণ্ডা।

চায়ের কাপ ঠেলে রেখে দাদাকে বললাম, 'আমি যাচ্ছি। তোমরা এখানে থেকো।' ব'লে আর একটুও দেরি না ক'রে সাধুকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে পাঁই পাঁই ক'রে ছুটলাম। ভিখুর দোকানের সামনে বেশ ভিড়, দূর থেকেই দেখতে পেলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে দুজন ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। কী ব্যাপার?

'তোমার বাবা কাজে যাচ্ছিল, তাই তোমাদের ভলান্টেয়াররা মাথায় লোহার রড দিয়ে মেরেছে।'

বা জানকে? বা-জান কাজে যাচ্ছিল?

'হ্যাঁ, কারখানার ড্রেস-পরা ছিল, টিফিনের কৌটো ছিল। কিন্তু একি বাদ্‌শা? তোমাদের লোকেরা তাই ব'লে লোহার রড দিয়ে নিজেরা মজুর হয়ে মজুর খুন করবে?'

বিপদের সময় আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে, কমরেড। জিগ্যেস করলাম, 'বা-জান কোথায়?' একটা লরির পেছনে তুলে বা-জানকে অজ্ঞান অবস্থায় ভিখু তক্ষুনি সরকারী হাসপাতালে নিয়ে গেছে। 'আর ভলান্টিয়াররা?'

একজন বলল, 'আমরা ছুটে আসায় তারা পেলিয়েছে।'

যে জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তার পাশেই বা-জানের সাইকেলটা কাত হয়ে পড়েছিল। একটু দূরে টিফিনের কৌটোটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় পড়ে। কয়েকটা রুটি ছেঁড়াছেঁড়ি করছিল একদল কাক।

বা-জানের সাইকেলটা তুলে নিয়ে সাধুকে বললাম, 'খুব জোরে চালাব। সোজা হাসপাতালে। তুই তোর সাইকেলটা নিয়ে আস্তে আস্তে আয়।'

আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা ছিল। যেতে যেতে এক জায়গায় একজন বুড়োমতো লোক বলল শুনলাম, 'বাবড়িঅলার পা-গাড়ি।' একজন

ছোকরা আপত্তি ক'রে বলল, 'না না। ওটা তো ফকির সায়েবের পা-গাড়ি।' গাড়িতে বেল ছিল না, ব্রেক ছিল না। মাথা ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু যাচ্ছিলাম ঝড়ের বেগে।

তারপর—

আমার কথা শনিবার

বাদশার সঙ্গে ব'সে ওর কথা লিখতে লিখতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, এমন সময় দোতলায় একটা হৈ হৈ শোনা গেল, তার মধ্যে বংশীরও গলা। গোলমালটা কানে যেতেই খাট থেকে বাদশা মাটিতে দিল এক লাফ। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যস, হাঙ্গার-স্ট্রাইক শেষ' বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল তিনতলার সবাইকে খবর দিতে।

গোটা ব্যাপারটাতে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। বাদশার বাবার শেষ পর্যন্ত কী হল এটা জানবার জন্যে তখন আমি প্রচণ্ড কৌতূহল চেপে লিখে যাচ্ছি। বাদশা 'তারপর' ব'লে একটু থামবার সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল।

খানিক পরে সবাই ধাতস্থ হল।

জেল কমিটি ঠিক ক'রে রেখেছিল প্রথমেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হবে শহীদ স্মরণ সভা। তারপর হবে অনশন ভঙ্গ।

দোতলার স্মরণ সভায় যারা বলল আর যারা শুনল, প্রত্যেকের চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল পড়ছিল। ভাল ক'রে কেউ বলতে পারল না; ভাল ক'রে কেউ শুনতেও পারল না।

সভার পর দোতলায় আর তিনতলায় আলাদাভাবে রিপোর্টিং করার ব্যবস্থা হল। দোতলায় বংশী, তিনতলায় বাদশা। যতটুকু বোঝা গেল, দূরে কোথাও বন্দীদের পাঠানো হবে না—এ রকম কোনো কথা দিতে সরকার পক্ষ রাজী হয় নি। শুধু খুচরো কিছু দাবি মেনে নিয়েছে। অনশন ধর্মঘট মেটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সব জেলের বন্দীদের অবস্থা বুঝে এবং সকলে একমত হয়ে।

নিজেকে আমার অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। দুপুর পর্যন্ত মাথা ছিল খুব পরিষ্কার। সভায় ব'সে যা যা শুনছিলাম কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না। ঝি ঝি-লাগা পা বার বার টান টান ক'রে ছড়িয়ে দিয়েও কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না। আমরা ব'সে থাকতে থাকতেই লেবুর শরবত এসে গেল। খেয়ে একটু ভাল লাগল। প্রথম চুমুকটা দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত একটু থেমেছিলাম—হাঙ্গার-স্ট্রাইক সত্যি শেষ তো? তারপর চোঁ চোঁ ক'রে শেষ করেছিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে এসেছিল গরম হরলিক্স্। বলা হল, প্রথমদিন এর বেশি নয়। পরের দিন গলাভাত দুপুরে হবে, না সন্ধ্যেয় হবে—এটা ডাক্তারদের ডিগ্নোস ক'রে তারপর পাকাপাকি স্থির হবে।

কাল লক-আপ হয়েছিল অনেক দেরিতে। কিন্তু আমরা কেউ একতলায় নামি নি। নামা ওঠা করার কারো কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি বিছানায় লম্বা হয়েছিলাম লক-আপের ঢের আগে। মনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। একবার তেষ্টা পেল। কিন্তু উঠলাম না।

অনেক দেরিতে ঘুম এল। অথচ অন্যান্য বার গরম হরলিক্স্টা খাওয়ার পরই দুচোখের পাতা বুঁজে আসতে চাইত। কাল ঠিক ঘুম হল না। একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে কেমন যেন অসাড়ে পড়ে রইলাম। তারপর একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। আমি যেন পার্টিকে একটা চিঠি লিখছি। তার আরম্ভটা হল—

'প্রিয় কমরেড, আজ আমার জন্মদিন।...'

চিঠিতে আমি চাইছি পার্টির সদস্যপদ। আমি জানাচ্ছি যে, অগ্নি-পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আট বছর ধ'রে সদস্য থাকলেও আমি চাইছি সেটা খারিজ ক'রে দিয়ে আমাকে নতুন ক'রে সদস্যপদ দেওয়া হোক। সেইসঙ্গে আমি জানাচ্ছি যে, পার্টির সুদিনে না হোক দুর্দিনে আমি কোনোদিন ভয় পেয়ে পার্টিকে, পার্টির কমরেডদের ছেড়ে যাব না।

স্বপ্নের শেষটাতে ছিল আমি যেন ন' নম্বরে সুবিমলবাবুর ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। সুবিমলবাবু টেবিলে রাখা তাঁর ছেলের ছবিটাকে ধ'রে আপন মনে কথা বলছেন।

আজ সকালে কুয়াশায় সমস্ত কিছু ঢেকে গিয়েছিল। চা আর হজমী বিস্কুট খেয়ে দেড় মাস পরে আমরা এই প্রথম ওয়ার্ডের বাইরের রাস্তায় গেলাম। একেবারে কাছে না এলে কুয়াশায় কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। ছ'নম্বরের একজন কমরেডকে দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন একটা কঙ্কালের মুখে চশমাসুদ্ধ দুটো চোখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'একি চেহারা হয়েছে?' সেই কমরেড আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকে আমাকে বললেন, 'কমরেড, আপনি—আপনি অরবিন্দবাবু না?'

আশ্চর্য একটানা দেড় মাস ধ'রে রোজকার দেখা নিজেদের ওয়ার্ডের কোনো কমরেডকে আমাদের কারো কিন্তু একটুও অন্যরকম দেখছি ব'লে মনে হয় নি। সুবিমলবাবুর সঙ্গে দেখা হল। এবারও সেই পরস্পরকে দেখে স্তম্ভিত হওয়ার ব্যাপার। আমি একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সুবিমলবাবুকে আমার স্বপ্নের কথাটা বললাম। সুবিমলবাবু সলজ্জ হেসে ছেলের ফটো ধ'রে কথা বলার ঘটনাটা স্বীকার ক'রে বললেন 'আশ্চর্য তো!'

কিন্তু তার চেয়েও বড় আশ্চর্য আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

একটু বেলায় খবরের কাগজ এল। কাগজটা কেড়ে নিয়ে আমি শুধু আজকের বাংলা তারিখটা দেখে নিলাম।

আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না। অতীন্দ্রিয়তায়ও আমার বিশ্বাস নেই।

তাহলে এসব কেমন ক'রে হয়? হয় কিনা জানি না, কিন্তু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ বাইরের প্রকৃতিকে যতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায়, মানুষ তার জানার

সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্যতার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধ'রে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব।

আমাদের শরীরে আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয় নি। কোন খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা।

আমি বোধহয় নেহাত আকস্মিকভাবে তেমনি কোনো খিল খুলে জানতে পেরেছিলাম—কাল, হ্যাঁ কাল—অনশন ভাঙবার দিনটাতেই আমার জন্মদিন ছিল।

আম্মা, তুমি বেঁচে থাকতে জন্মদিনে আমাকে—সবাইকে দেওয়া সম্ভব হত না ব'লে, শুধু আমাকে—পায়েস ক'রে দিতে।

এবারের জন্মদিনে, দাদু, তুমি শুনে খুশি হবে—আমি হরলিক্স্ খেয়েছি।